জোড়াদীঘির চৌধুরী-পরিবার

(উপন্যাস)

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ।

কাত্যায়নী বুক ষ্টল
২/৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

প্রকাশক—
শ্রীগিরীন্দ্র চন্দ্র সোম।
২০৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য—পাঁচ টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীপরমানন্দ সিংহ রায়।
শ্রীকালী প্রেস
৬৭, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[illegible] সংস্করণ
[illegible]াঢ় ১৩৬০

সকল মানুষেরই পূর্ব্বপুরুষ মনু।

তবে আবার মানুষের মধ্যে ছোট-বড, প্রাচীন-অর্ব্বাচীনের প্রশ্ন ওঠে কেন? প্রশ্ন যখন উঠিযাছে, ভাবিবার কিছু আছে নিঃসন্দেহ। মানুষে মানুষে মূলতঃ ছোট-বড আগে-পাছে নাই, কিন্তু বস্তুতঃ নানা প্রকার ভেদ সর্ব্বত্র দেখিতেছি। সে ভেদ ব্যক্তির, না বংশের?

ব্যক্তির প্রবাহ ঝরণার মত, মানচিত্রে তাহার কোনো উল্লেখ নাই। এই ঝরণা যখন গভীর হয়, উদার হয, সে হয় নদী, মানচিত্রে তাহার দাগ পড়ে। নিঃসঙ্গ ব্যক্তি যখন বংশের বিশালতা পায়, ইতিহাসে সে দাগ টানিতে সুরু করে। সব ঝরণা নদীরূপ পায় না, সব ব্যক্তি বংশ পাকাইয়া ওঠে না। সব নদী সমুদ্রে পৌছায় না, ইতিহাসের চরম উদ্দেশ্যকে ধরিতে পারে এমন বংশ কয়টা আছে!

ঝরণা প্রকৃতির অনেক বাধা লঙ্ঘন করিযা তবেই নদী। বংশ-প্রতিষ্ঠাতেও বহু বিপত্তি। তাহার লড়াই স্বয়ং মহাকালের সঙ্গে। ধরিত্রীর পত্রে মহাকাল একমাত্র লেখক, সেখানে আর কেহ যে দাগা বুলাইবে, ইহা তাহার অসহ্য। কিন্তু-বংশ-প্রতিষ্ঠার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ধরিত্রীর পৃষ্ঠায় চিহ্ন রাখিয়া যাওযা। বহু বংশের বিচিত্র এই চিহ্নকেই আমরা বলি ইতিহাস। ইতিহাস বনাম মহাকাল, ইহাই বিশ্বের বিরাট বিধান।

জোড়াদীঘির চৌধুরী-পরিবার

ব্যক্তির সঙ্গে মহাকালের কোনো দ্বন্দ্ব নাই, বো
সে এতই বড় যে মানুষের দিকে দৃকপাত করে না।
ছোট যে, মহাকালকে গ্রাহ্য করে না। যত তার জিজ্ঞাসা
সত্য কথা বলিতে কি, মহাকালের খাতায় মানুষের জমা-খরচ
মানুষ হাজারে হাজারে জন্মিতেছে, হাজারে হাজারে মরিতেছে। কিন্তু, একটি বংশ প্রতিষ্ঠা হয় কতশত বৎসরে, তার পতন হইলে আর ওঠে না! মানুষ আশ্রয়ের জন্য একখানা চালা তোলে, ঝড়ে সকালে ফেলিয়া দেয়, বিকালে আবার তাহা ওঠে। অট্টালিকা পড়িলে কবে তাহা উঠিয়াছে! ব্যক্তির বসতি বানে ভাসে, জলে ডোবে, ঝড়ে ভাঙে, আগুনে পোড়ে। কিন্তু তাহার ধ্বংস কত ক্ষণের জন্য। যে ধ্বংস ক্ষণিক, তাহা বোধ করি ধ্বংসই নয়। ধ্বংসের লীলা দেখিতে হইলে প্রাচীন কোনো বংশের আবাস-স্থলে যাইতে হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় প্রাণীর কঙ্কালের মত অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ পড়িয়া আছে, তবু তার বিশালতায় মনে সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। ভবিষ্যতের কাছে এই সম্ভ্রমের দাবী প্রাচীন বংশের! বর্ত্তমানের মানদণ্ডে মাপিয়া ইহাকে বুঝিতে পারিবে না, ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক পদার্থ। মনোযোগ দিয়া ইহাকে দেখ, সম্ভ্রমে মাথা আপনি নত হইয়া আসিবে,—ইহার অতিকায়িক বিপুলতায়, শক্তির স্থূলভ প্রাচুর্য্যে, অনাবশ্যক উদারতাব আতিশয্যে। মানব-মনের মানসচিত্রের ইহা বিশাল হিমালয়, হিমালয়ের মত ইহা মৃত এবং শীতল; অতীতের সমগ্র পাদপীঠ জুড়িয়া ইহার প্রতিষ্ঠা, ভবিষ্যতের আকাশে ইহার মাথা ঠেকিয়াছে; এবং জীবনের সমস্ত কামনার ইহা চরম আশ্রয়।

১

পূর্ব্বকথা

একটি বংশের পতন ও উত্থানের কাহিনীর মত চিত্তাকর্ষক অল্প জিনিষই আছে। পূর্ণ প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে গৌরব থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে আকর্ষণ তেমন বেশি নাই। কারণ সুখ ও সম্পদ্ মানব-জীবনে স্বাতন্ত্র্যের হানি করে। সকল বংশের সম্পদের কাহিনীই অল্পবিস্তর এক রকম। দুঃখে ও চেষ্টাতেই মানুষের জীবনের স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য।

জোড়াদীঘির চৌধুরীদের পূর্ব্বপুরুষের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বল্লালসেনের সময়। তারপর কয়েক শত বৎসর ইতিহাস নীরব; পুনরায় সম্রাট্ আকবরের সময় হইতে ইহাদের ইতিহাস পাওয়া যায়। আমরা একখানি পুস্তক হইতে চৌধুরীদের পরিচয় তুলিয়া দিলাম।

"নীলকণ্ঠ ওঝা মোগল সম্রাট্ আকবরের সভাপণ্ডিত এবং হিন্দু দায়ভাগের বিচারক ছিলেন। ব্যাকরণ, স্মৃতি, বেদ, ষড়দর্শন, জ্যোতিষ ও তন্ত্রে ওঝা একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রে এত অধিকার যে, ইনি একজন তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। হরিবাটী গ্রাম দান করিয়া আকবর ওঝাকে পারইডিঙ্গিতে স্থাপন করেন। তারপর অতিথিসেবার্থে হুলিখালি গ্রাম, জিয়াসিন্ধ, মাদা, সিন্দুর-কুসুম্বী, কালিগাঁও, তেগাছি প্রভৃতি পরগণা এবং অনেক ব্রহ্মোত্তর ভূমি ওঝাকে আকবর দেন। এই বৃহৎ ভূসম্পত্তি লাভের পর নীলকণ্ঠ পারইডিঙ্গিতে ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ও দেবালয় নির্ম্মাণ এবং সংস্কৃত বিদ্যালয় ও অতিথিশালা স্থাপন করেন। জলাশয় খনন করিয়াও জলকষ্ট নিবারণ করেন। ইহার পর তিনি পরলোক গমন করেন। আগরা হইতে যে নীল প্রস্তর আকবর ওঝাকে দেন, তাহা আজিও হরিবাটী দেবালয়ের সম্মুখে স্থাপিত আছে।

"রামহরি ও গঙ্গাহরি নীলকণ্ঠ হইতে অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। যে সময় ইঁহারা পারইডিঙ্গিতে বাস করেন, সে সময় বড়ল নদীর নিকট চাঁপলিয়ায় একটি ফৌজদারি আদালত ছিল। দিল্লীর সম্রাটের অনুগ্রহে গঙ্গাহরি সেই ফৌজদারি আদালতের প্রধান কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত হন। বড়ল নদীর তীরে জোড়াদীঘি; চাঁপলিয়া জোড়াদীঘির অতি নিকট। চাঁপলিয়া থাকা সময় গঙ্গাহরি জোড়াদীঘির মজুমদার-বংশীয় একটি কন্যাকে বিবাহ করেন। গঙ্গাহরির শ্বশুরের পুত্র-সন্তান ছিল না। সুতরাং শ্বশুরের যাবতীয় সম্পত্তি তিনি প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা-পত্নী সন্তানগণসহ পারইডিঙ্গির বাটীতে যান। রামহরি কনিষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গাহরির সন্তানগণকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বেদখল করেন; সুতরাং গঙ্গাহরির বিধবা-পত্নী সন্তানগণসহ জোড়াদীঘিতে ফিরিয়া আসিয়া পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া রহিলেন, এ দিকে পারইডিঙ্গিতে রামহরি পৈত্রিক সম্পত্তির যোল আনার অধিকারী হইয়া বসিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই রামহরি এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিলেন। এমন সময়ে নাটোর রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। যে সময়ে রঘুনন্দন মুর্শিদাবাদে আধিপত্য বিস্তার করেন সেই সময়ে রঘুনন্দন রামহরির যাবতীয় সম্পত্তির প্রতি লোভ করেন। ইহা কথিত আছে যে, রামহরির নিকট হইতে রঘুনন্দন যাবতীয় সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া পারইডিঙ্গি, হুলিখালি ও হরিবাটি এই তিন গ্রাম ছাড়িয়া দেন।

"এদিকে গঙ্গাহরির বিধবা-পত্নী সন্তানগণসহ জোড়াদীঘি গ্রামে বাস করিতেছিলেন। গঙ্গাহরির অধস্তন সন্তানগণ লইয়াই জোড়াদিঘীর চৌধুরীবংশ। গঙ্গাহরির পুত্র রূপনারায়ণ। রূপনারায়ণের পুত্র উদয়নারায়ণ, তাহার পুত্র দর্পনারায়ণ। রূপনারায়ণ পর্য্যন্ত চৌধুরীবংশের অবস্থা ভাল ছিল না। উদয়নারায়ণ হইতেই জমিদারি বৃদ্ধির সূত্রপাত হয়। একদা বড়ল দিয়া নাটোরের রাণী ভবানী বহুতর নৌকা ও লোকজনসহ জোড়াদীঘির নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। ঝড় বৃষ্টি নিবন্ধন নৌকা আদি জোড়াদীঘির ঘাটে

লাগাইয়া রাণী বিশ্রাম করিতেছিলেন। সে দিবস দ্বাদশীর পারণ। রূপনারায়ণও ঘাটে উপস্থিত। রাণী ব্রাহ্মণ দেখিয়া দ্বাদশীর পারণ ফলমূলাদির প্রয়াস করিলেন। রূপনারায়ণ যত্ন করিয়া রাণীকে নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন এবং দ্বাদশীর পারণ, তৎপর হবিষ্যান্নাদি সহ আহার অতি ভক্তির সহিত সম্পন্ন করাইলেন। রাণী রূপনারায়ণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কিছু জমিদারী দিতে চাহিলেন। রূপনারায়ণের আকাঙ্ক্ষা সামান্য ছিল। জোড়াদীঘির উত্তরে যে বিল আছে, সেই বিল এবং বাড়ীর নিকবর্ত্তী যে কয়েক ঘর শূদ্রের বসতি আছে, তাহা তাঁহার অধিকারে ছিল না। তিনি তাহাই যাচ্ঞা করিলেন। রাণীও সন্তুষ্ট হইয়া তাহা দিয়া যান। সেই হইতে সেই স্থানের নাম এখনও চক-ভবানী বলিয়া চলিয়া আসিতেছে।"

ইহার পর হইতে চৌধুরীদের দ্রুত উন্নতি আরম্ভ হয়। যে সময় নাটোরের রাজ-সাধক রামকৃষ্ণের অনবধানতা ও কর্ম্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতায় অর্দ্ধ-বঙ্গব্যাপী বৃহৎ নাটোর রাজ্য ছিন্ন সতীদেহের মত খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতে-ছিল, যে সময় বাংলার অধিকাংশ বর্ত্তমান জমিদারের পূর্ব্বপুরুষ নাটোর -রাজের কাছারী হইতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে সহজে প্রবেশ কবিবার খিড়কি-দ্বার আবিষ্কার করিতেছিলেন, সেই সময়ে উদায়নারায়ণও পাবনার অন্তর্গত নাটোরের একটা বৃহৎ জমিদারী নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করিয়া চৌধুরীবংশের লক্ষ্মীর পাকা-বনিয়াদ স্থাপন করিলেন।

৩

ইহাই ইতিহাস। বিশ্বাস করিতে হয় কর, কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে বলিনা না। ইতিহাসের সেতু সত্য এবং মিথ্যা, অনুমান এবং প্রমাণ, কল্পনা এবং বাস্তব এই দুই স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান। বুঝিতে পারিলেও মিথ্যাকে বাদ দিবার উপায় নাই। যে স্ত্রীর সঙ্গে বনে না, তাকে লইয়াও যেমন ঘর করিতে হয়, যাকে জানিতেছ মিথ্যা, তাকেও সহ্য করিতে হইবে। আজ যে

তুচ্ছ সামগ্রীকে উপেক্ষা করিতেছে, আগামী কল্য সে শোধ লইবে। আজ যাহার স্থান গো-শালাতেও নহে, কাল সে জ্ঞানের সিংহাসনে বসিবে। ইহাই ইতিহাসের উপাদান। গতকল্যকার তাম্রমুদ্রা আজিকার স্বর্ণমুদ্রার অপেক্ষা মূল্যবান্। ইতিহাসের জল-দেবতা লৌহ কুঠার দিয়া ঐতিহাসিককে সন্তুষ্ট করেন।

আরংজেব বাদশাহ কর্ম্মচারীদের বিশ্বাস করিতেন না, কিন্তু তাদের দিয়া কাজ চালাইয়া লইতেন। ইতিহাসের তথ্যকে বিশ্বাস করিও না, যতক্ষণ কাজ চলে যথেষ্ট। যাকে শিলালিপি মনে করিয়া বিরাট গ্রন্থ লিখিলে, হয় তো তার দ্বিতীয় সংস্করণে দেখা যাইবে, সেটা শিলালিপি নয়, মশলা বাঁটিবার পাথর। যে তারিখটাকে প্রাচীনতম মনে হইতেছে, তন্মধ্যে কয়টা অঙ্ক কীটের কারচুপিতে কে জানে! ইতিহাসের পট্টবস্ত্র সত্য-মিথ্যা, কল্পনা-বাস্তব, অনুমান-প্রমাণের টানা-পোড়েনে রচিত। বেশি টানাটানি করিও না, যতক্ষণ চলে, ব্যবহার করিয়া যাও।

বাংলার জমিদারদের উদ্ভবের ইতিহাস লইয়া গবেষণা না করাই শ্রেয়। আধুনিক জমিদারদের অধিকাংশের গোড়াপত্তন মুসলমান রাজত্বের শেষে ও কোম্পানীর রাজত্বের প্রারম্ভের অরাজকতার গোধূলিলগ্নে। সে সময় এদের পূর্ব্বপুরুষেরা কেহ চুরি করিয়াছে, কেহ ডাকাতি করিয়াছে, কেহ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, কেহ কৃতঘ্নতা করিয়াছে, সকলেই নিরীহ প্রতিবেশীকে জোর করিয়া ঠেলিয়া কোনঠাসা করিয়া তার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া বসিয়াছে। সাংসারিক উন্নতির মইখানার নীচের কয়েকটা ধাপ জঘন্য পঙ্কিল, একদিন সকলকেই সেখানে বিচরণ করিতে হইয়াছে। তারপর উঁচুতে উঠিয়া হাত-পা ধুইয়া সকলে সম্ভ্রান্ত হইয়াছেন। তখন সকলে মিলিয়া একযোগে সেই কলঙ্কময় প্রাচীন দলিলখানাকে সাংসারিক রাজসূয় যজ্ঞে আহুতি দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ ইহাতেও নিঃসন্দেহ না হইয়া মুদ্রা-বিনিময়ে নূতন করিয়া ইতিহাস রচনা

করাইয়া লইয়াছেন। হে করুণাময়ী বিস্মৃতি, তুমি তোমার অজ্ঞতার তিরস্করণী নিক্ষেপ করিয়া আজিকার রাজা-মহারাজাদিগকে সেই কলঙ্কের স্মৃতি হইতে রক্ষা করিয়াছ।

আমি এ পট উত্তোলন করিব না, সে ইচ্ছা নাই, এবং সে শক্তিও বোধ করি নাই। কেবল ইহার একপ্রান্ত ঈষৎ উত্তোলন করিয়া একবার ক্ষণকালের জন্য সেই যুগের দুই একটা আভাস দিতে চেষ্টা করিব। আমার কাহিনীর নায়ক-পরিবারের ইতিহাস বাংলার সমস্ত জমিদারের ইতিহাসের স্বরূপ।

৪

জোড়াদীঘির চৌধুরীদের পূর্ব্বপুরুষ ডাকাতি করিত। এ বৃত্তি বন্ধ হইবার এক করুণ ইতিহাস আছে। রাজসাহী ও পাবনা জেলার মধ্যে অতি বিস্তৃত এক বিল আছে, লোকে বলে চলণবিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বর্ষাকালে এই বিল সমুদ্রের ভীষণতা প্রাপ্ত হইত, এখন বিল শুকাইয়া গিয়াছে, তবু তা অতিক্রম করিতে একদিনের বেশি সময় লাগে। এই বিস্তৃত জলাকার ভূখণ্ড দিয়া দুইটি নদী গিয়াছে, আত্রাই ও বড়ল। বিল অতিক্রম করিয়া দুই নদী এক হইয়া যমুনায় গিয়া পড়িয়াছে।

বিল প্রকৃতির অরাজকতা। মাটি ও জল পুরাণের গজ-কচ্ছপের মত এখানে পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া পড়িয়া আছে। বর্ষাকালে জলের সীমা মাটি গ্রাস করিয়া ফেলে, গ্রীষ্মকালে মাটির রেখা জলকে শোষণ করিতে থাকে, বার মাস ইহাদের অনিয়ত চাঞ্চল্য। এই জলময় ভূখণ্ড হইতে বিশ্ব-কর্ম্মা পৃথিবী গড়িয়াছে, তারপর ইহাকে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে। ইহা পৃথিবীর উপাদান, কিন্তু পৃথিবীর নিয়ম এখানে নাই। তাই বলিতেছিলাম, প্রকৃতির অরাজকতা বিল। না খাটে এখানে ডাঙার নিয়ম, না খাটে জলের, ইহা প্রকৃতির প্রত্যন্ত প্রদেশ। এখানে বিনা মেঘে ঝড় ওঠে, বিনা ঝড়ে নৌকা ডোবে। দিনের বেলা অন্ধকার হইতে বাধা নাই, আবার রাত্রিকালে

অন্ধকার রাত্রে চারখানা নৌকার আরোহীরা ঘুমাইয়া পড়িল।

গভীর রাত্রে কিছু দূরে কয়েকখানা ছিপনৌকা দেখা গেল। আরোহী অনেক, কথাবার্ত্তা অস্পষ্ট। মাঝে মাঝে দু'চারটা কথা বুঝা যাইতেছিল।

—অতটা সাহস ভাল নয়, একেবারে গাঁয়ের ঘাটে গিয়ে।

আর একজন বলিল, কিন্তু ভাল মাল ছিল রে।

পূর্ব্বের কণ্ঠ বলিল, তবে এক কাজ কর সাঁতরে গিয়ে বজরাখানার কাছি কেটে দে, সোঁতে ভেসে আসুক।

কি বলেন কর্ত্তা ?

কর্ত্তা ভিতর হইতে গম্ভীরস্বরে বলিলেন—তাই কর।

তখন একজন লোক অন্ধকারে সাঁতার দিয়া চলিল, ক্ষিপ্রহাতে বজরার কাছি কাটিয়া দিল, বজরা ঘাট হইতে ভাসিয়া ছিপনৌকা-গুলির মধ্যে আসিয়া পড়িল।

বজরার আরোহী তখনও নিদ্রিত। একজন ডাকাত কুড়ুলের আঘাতে বজরার তলায় ছিদ্র করিতে লাগিল। সেই শব্দে মাঝিদের মধ্যে একজন জাগিয়া উঠিয়া ডাকিল—রহিম। অধিক কথা সে বলিতে পারিল না। পিছন হইতে উদ্যত তলোয়ারের ঘায়ে তার ছিন্নমুণ্ড ঝপ করিয়া জলে পড়িল। খণ্ডিত দেহটা ধপ করিয়া বজরার পাটাতনের উপর পড়িয়া গেল। অপর একজনের তলোয়ারের ঘায়ে ঘুমন্ত রহিম আর জাগিবার সুযোগ পাইল না।

বজরার ভিতরে আরোহীরা তখনো নিদ্রিত। তখন কর্ত্তা একজন অনুচরকে বলিল—তুই হাতিয়ার নিয়ে আমার সঙ্গে আয়। তাহার নিজের হাতে তলোয়ার। দুইজন নীরবে বজরায় উঠিল, দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। অন্ধকারে অনুমান হইল, আরোহী মাত্র দুই জন, একটি রমণী, একটি পুরুষ। বজরার অবস্থা দেখিয়া মনে হইল আরোহীরা ধনী। কর্ত্তার মন খুসি হইয়া উঠিল। সে আর অধিক

বিলম্ব অনুচিত মনে করিয়া ক্ষিপ্র অসির আঘাতে সুপ্ত পুরুষের কণ্ঠ ছিন্ন করিয়া ফেলিল। মেয়েটিকে কি করা যায় ভাবিতেছে ইতি মধ্যে রমণী বোধ করি রক্তেরই সিক্তস্পর্শে নিমিষের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া হাতের কাছে রক্ষিত দীপটি জ্বালিয়া ফেলিল। সেই দীপালোকে দেখিতে পাইল পাশেই ছিন্নকণ্ঠ স্বামী, আর সম্মুখে রক্তাক্ত তলোয়ার হাতে তার পিতা। সেই রক্তপ্রতিফলিত দীপালোকে পিতাপুত্রী নিমিষের জন্য নিষ্পলক নেত্রে দুইজনকে দেখিল। নিমেষান্তে কন্যা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না। চৌধুরী টলিতে টলিতে বাহিরে আসিল, তার অসাড় দেহ শিলাখণ্ডের মত সশব্দে নদীর জলে পড়িয়া গেল।

নদীর যে স্থানে কাণ্ডটা ঘটিয়াছিল, আজও তাহা মেয়ে-জামায়ের দহ নামে পরিচিত। আর যে ঘাট হইতে বজরার কাছি কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সে ঘাটকে লোকে কাছিকাটা বলে।

আজ আর সেখানে ডাকাতের ভয় নাই। বিল শুকাইয়া গিয়াছে, দু'তীরে বড় বড় গ্রাম বসিয়াছে, হাট লাগিয়াছে, রাতের বেলা নিঃসঙ্গ নৌকা নির্ভয়ে চলিয়া যায়। অন্য কোন ভয় নাই, কেবল মেয়ে-জামায়ের দহের কাছে বহু পূর্ব্বেকার এই করুণ ঘটনা স্মরণ করিয়া লোকে শিহরিয়া ওঠে।

৬

এই নিদারুণ ঘটনার পর হইতে চৌধুরীরা ডাকাতি ব্যবসা ছাড়িয়া দিল। তখন হইতে তাদের মন জমিদারীর উপরে পড়িল। প্রথমে তারা জোড়াদীঘির বাড়ী-ঘরের উন্নতি আরম্ভ করিল। চৌধুরীর বংশের ইতিহাসে এই যুগটাকে ইঁট-পাথরের যুগ বলা চলে।

জোড়াদীঘির সদর রাস্তা হইতে পথিকের চোখে আম-বাগানের উপর দিয়া চৌধুরীদের চারতলা অট্টালিকা চোখে পড়ে। কৌতূহলী পথিক অগ্রসর হইলে দেখিতে পায় প্রায় দশ বিঘা জমির উপরে চৌধুরীদের

চকমিলান প্রকাণ্ড প্রাসাদ। বলা বাহুল্য, এত বিরাট বাড়ী একদিনে তৈয়ারী হয় নাই। এ বাড়ীর ইতিহাস প্রকারান্তরে চৌধুরীদেরই ইতিহাস। শামুকের খোলটা যেমন তার পক্ষে অবান্তর নয়, আবরণ; মানুষের পক্ষেও তেমনি তার বাড়ী-ঘর,—তাহার বর্ত্তমানের সঙ্গী ও অতীতের সাক্ষী।

মানুষ যে পরকালে বিশ্বাস করে, অট্টালিকাই তার প্রমাণ। শুধু বিশ্বাস নয়, সে পরকালকে ভয় করে। কালের মত প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে সে পিরামিডের মত শক্তিমান্ মল্লকে দাঁড় করাইয়াছে। হস্তিনাপথের বিশাল প্রান্তর ব্যপিয়া সাত সাতটা দিল্লীর ধ্বংসস্তূপ মহাকালের রাজপথের পার্শ্বে ধূলিমলিন অশ্বশিলাখণ্ডের মত পড়িয়া আছে। মানুষ ঐটুকুই পারে। জীবনকে চিরস্থায়ী করিবে এমন শক্তি তার নাই, কোন রকমে জীবনের স্মৃতিটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে সে চেষ্টা করে।

জোড়াদীঘির বিশাল প্রাসাদপুরী চৌধুরীদের ইতিহাসের স্বরূপ। ইহা চৌধুরীদের উন্নতির সঙ্গে গড়িয়া উঠিয়াছে, আবার ইহার ধ্বংসস্তূপের সোপান বহিয়াই চৌধুরী পুরলক্ষ্মী বহুকাল পরে এই বাড়ী ত্যাগ করিয়াছেন। ইহার প্রাচীনতম অংশ ধ্বংস প্রায়; কারণ তাহা ছিল মাটি ও কাঁচা ইটের ব্যাপার। চৌধুরীরা তখন সামান্য জোতদার মাত্র। বাড়ীর এই অংশটা এখন লতাপাতা, আবর্জ্জনা ও বিস্মৃতির তলে বিলুপ্ত। দুঃখের দিনের ইতিহাস মানুষ মাঝে মাঝে মনে করে, হয় তো আনন্দও পায়, কিন্তু নগণ্যতার ইতিহাস সকলেই ঢাকিয়া রাখিতে চায়।

এই প্রাসাদপুরীর নবীনতম অংশটার ইতিহাসে কোন নূতনত্ব নাই, কারণ সে দেশে কোম্পানীর কাগজের মসৃণ পথ বাহিয়া যাওয়া চলে। এই দুই কালের মধ্যে যে অংশটা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বৈচিত্র্য আছে। সে প্রাসাদে চৌধুরীদের বহুকাল কাটিয়াছে, এখন তার কাহিনী কৌতূহলীর কাজে লাগিবে।

তখন চৌধুরীদের রক্তে কিছু একটা গড়িয়া তুলিবার অনির্দ্দিষ্ট আকুতি

ছিল, গড়িবার মত উপকরণ ছিল না। তারা একটা বড় বংশ গড়িয়া তুলিল, আর গড়িয়া তুলিল সেই বংশের দৃঢ় প্রতিষ্ঠার জন্য এই প্রাসাদের ভিত্তি।

রাজশাহী সহরের কিছু পূর্ব্বে চারঘাটের নিকটে পদ্মা নদীতে বড়ল নদের মুখ। বড়ল পদ্মা হইতে বাহির হইয়া জোড়াদীঘির তল দিয়া রাজশাহী ও পাবনা জেলার অধিকাংশ অতিক্রম করিয়া গোয়ালন্দের কিছু উজানে যমুনা নদীতে পড়িয়াছে, যখনকার কথা বলিতেছি, তখন যমুনা নদী বর্ত্তমান স্থানে ছিল না, খুব সম্ভব বড়ল আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া একেবারে পদ্মায় পড়িত। এখন বড়ল সামান্য একটা শুষ্ক নদী, বর্ষার সময়ে জল থাকে, অন্য সময়ে শুষ্ক বা স্বল্প-জল। রেনেল সাহেবের অঙ্কিত মানচিত্রে দেখা যাইবে, উহা গভীর নীল বর্ণে চিত্রিত। এখন উহাতে যাহা কিছু নীলিমা তাহা কচুরীপানার প্রাচুর্য্যে। চৌধুরীদের উন্নতির সময়ে পদ্মার পরে এত বড় নদী আর এ অঞ্চলে ছিল না। ব্যবসায়-বাণিজ্য ছাড়া এ নদীপথের একটা রাজনৈতিক দায়িত্বও ছিল। মুর্শিদাবাদ হইতে ঢাকার মধ্যে এই নদীর পথটাই হ্রস্বতম। নবাবী ফৌজ বড়লের তীর দিয়া যাতায়াত করিত; নবাবী পল্টনের বড় বড় বজরা এই পথেই মুর্শিদাবাদ হইতে ঢাকা যাইত।

এই পথে বড় বড় চূণের নৌকা, ইঁট-পাথরের নৌকা যাইত। জোড়াদীঘির ঘাটে যারা রাত্রি যাপন করিত, পরদিন তাদের কেহ আর দেখিতে পাইত না, ইঁট, কাঠ, পাথর চৌধুরীদের দালানের কাজে লাগিত। শেষে জোড়াদীঘির দুর্নাম রটিয়া গেল। রাত্রে সে ঘাটে আর কারও নৌকা ভিড়িত না। চৌধুরীরাও রাত্রের যবনিকা সরাইয়া দিনের আলোতে দুঃসাহসী রূপে দেখা দিল। তারা চূণসুরকীর দাম করিত, জিনিষ বাড়ীতে আনিয়া মালিককে খেদাইয়া দিত। শেষে এমন হইল, জোড়াদীঘিতে কেহ জিনিষ বেচিবার জন্যও নৌকা লাগাইত না। অগত্যা চৌধুরীরা নৌকা লইয়া আক্রমণ করিত। জিনিষপত্র মাঝিমাল্লা শুদ্ধ

নৌকা ডাঙ্গায় টানিয়া তুলিত। একবার কয়েকখানা নৌকা ধরা পড়িল, মাঝিমাল্লাও অনেক ছিল। জিনিষপত্র কাড়িয়া লওয়াতে তাদের দুঃখিত দেখিয়া চৌধুরীরা তাদের রাজমিস্ত্রীর কাজ করিতে লাগাইয়া দিল। চৌধুরীবাড়ীর সে দালানটাকে লোকে আজও "বেগারের দালান" বলে। বড় বড় ভূমিকম্পে চৌধুরীবাড়ীর সকল দালান ফাটিয়াছে, কিন্তু বিস্ময়ের এই যে, বেগারের দালানে একটিও ফাটল ধরে নাই।

অবশেষে চৌধুরীদের অত্যাচারে বড়ল নদীতে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হইল। তারপরে মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব কমিয়া গেল, ক্রমে রাজধানী কলিকাতায় সরিয়া গেল; এবং বড়ল নদীও শুকাইয়া আসিতে লাগিল।

কিন্তু ইতিহাস ও ভূগোলের এই কয়েকটা বড় বড় পট-পরিবর্ত্তনের মধ্যে চৌধুরীদের অট্টালিকা একতলা হইতে চারতলায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল; তাদের ইতিহাসের ইঁট-পাথরের যুগ শেষ হইয়া স্বর্ণ-রৌপ্যের পর্ব্ব আরম্ভ হইল।

৭

এখন যেখানে নাটোর সহর, তিন শত বৎসর পূর্ব্বে সেখানে প্রকাণ্ড বিল ছিল। সপ্তদশ শতকের শেষে নাটোর বংশের আদিপুরুষ রঘুনন্দন এখানে তাঁহার বিস্তৃত রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁর জমিদারীকে রাজ্য বলাতে দোষ নাই, কারণ তৎকালে বাংলাদেশের প্রায় অর্দ্ধভাগ নাটোরের রাজাদের অধীনে ছিল। এখানে রাজধানী স্থাপনের কারণ কি জানি না। তবে বোধ করি, উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গেই নাটোরের জমিদারী অধিক ছিল, কাজেই উত্তরবঙ্গের কোন একটা স্থানে রাজত্বের ভারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আবশ্যক ছিল। বিশেষ এই বিলের মধ্যে বাহির হইতে আক্রমণের আশঙ্কা কম। বিলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত একটা উচ্চভূখণ্ডে প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল, তাকে বেষ্টন করিয়া তিনটি গভীর পরিখা কাটা হইল। এই পরিখাত্রয় অতিক্রম করিবার একটি মাত্র পথ তার দুই দিকে কামান

সজ্জিত। পরিখার চারিদিকে রাজবাড়ী ঘিরিয়া সহর গড়িয়া উঠিল; কর্ম্মচারী, সৈন্য, দোকানদার ও ব্যবসায়ী লোক। নাটোরের সৈন্যশক্তি তখন নবাবের আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। ভূষণার দুর্দ্দান্ত সীতারামকে পরাজিত করিয়াছিল, নাটোরের দেওয়ান দয়ারাম রায়। পরবর্ত্তী কালে বর্গীর উৎপাতে সমস্ত বঙ্গদেশ যখন উদ্ব্যস্ত, নাটোর রাজ্য তখন নিরাপদ, স্বয়ং আলিবর্দ্দী পরিজনবর্গকে নিরাপদে রাখিবার জন্য নাটোর রাজ্যের এক স্থানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

আজ সে নাটোর নাই। কিন্তু, নাটোরের দোষ কি! বোধ করি, সে বাংলা দেশও নাই। নাটোরের রাজারা এখন সামান্য জমিদার; নাটোরের প্রাসাদ ম্লান; পুরাতন পরিখাত্রয়ের মধ্যে একটা মাত্র আছে, তাহার প্রশ্বসিত বিষবাষ্প ঘরে ঘরে ব্যাধি বিস্তার করিয়া ফেরে। দু' একটা কামান আজ মৃত অজগরশিশুর মত পরিখার ধারে পড়িয়া আছে।

আমাদের পরিচিত এক ব্যক্তি বলিত, নরক দেখি নাই, কিন্তু নাটোর দেখিয়াছি। বোধ করি তাহার এ উক্তি মিথ্যা নয়। ব্যাধি, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, কদাচার, অত্যাচারে নাটোরের বায়ুমণ্ডল ম্লান। যে যুগটা বাংলা দেশের অন্যত্র হইতে অপসারিত, তারই খানিকটা অন্ধকার যেন এখানকার সূর্য্যালোককে মলিন করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু, নরকেও সৌন্দর্য্য আছে, কেবল দেখিবার চোখ নাই। নাটোরেও সৌন্দর্য্য আছে, সৌন্দর্য্য না থাকুক, ইতিহাসের চিহ্ন আছে; বিগত যুগের চিহ্ন, স্বাধীন যুগের চিহ্ন, দুঃখ-দিনের দীর্ঘ গোধূলীর আলোয় স্বর্ণান্বিত হইয়া যখন চোখে পড়ে, তার অপেক্ষা অধিক সুন্দর আর কি আছে! রাজপ্রসাদের ভগ্নস্তূপের ধারে, পরিখার অনধিগম্য কোনও কোণে পুরাতন যুগের এক আধটা স্খলিত লগ্ন হয়তো পড়িয়া থাকিলে থাকিতে পারে, কিছুই অসম্ভব নহে!

নাটোর হইতে ছয় ক্রোশ পূবে জোড়াদীঘি গ্রাম। জোড়াদীঘির উত্তরে

একটা বিল, অপর তিন দিকে বড়ল নদী ঘিরিয়া থাকিয়া ইহাকে শত্রুর অক্রমণের অতীত করিয়া রাখিয়াছে। আমরা যে যুগের কথা বলিতে যাইতেছি, সেকালে লোকে বাসস্থানের নিরাপত্তার দিকেই প্রথমে মনোযোগ দিত।

জোড়াদীঘি অতি প্রাচীন গ্রাম। কথিত আছে, রাজা শ্যামলবর্ম্মা এখানে কয়েক ঘর বৈদিক ব্রাহ্মণকে বাস করাইয়াছিলেন। কিন্তু, গ্রামের প্রকৃত উন্নতি চৌধুরীদের আবির্ভাবের সময় হইতে, সে প্রায় চারিশত বৎসরের কথা।

চারি শত বৎসরের মধ্যে এই অঞ্চলের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। হয়তো নদী খানিকটা শুকাইয়াছে, বিলের মধ্যে মানুষের বসতি হইয়াছে, এই মাত্র। হাজার বছরের মধ্যেও কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই। বিস্তৃত বিলের ধারে মাঠের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলে আজ যাহা দেখা যায়; বোধ করি হাজার বছর পূর্ব্বেও তাহাই দৃষ্ট হইত। দূরে একটা রাখাল, এক পাল গোরু; বিলের জলে পদ্ম, জলের ধারে বক; সম্মুখে একটা বটগাছ, বটগাছে এক ঝাঁক পাখী, আকাশে মেঘ, দিগন্তে কুহেলিকা, আর সারা মাঠ ভরিয়া শরবন, বেনা বন, চোরকাঁটা আর শ্যামল তৃণ।

ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন, সাড়ে পাঁচ হাজার বছর পূর্ব্বে না কি এই অঞ্চল দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদী প্রবাহিত হইত, তাঁহারা মাটির তলায় কর্দ্দমস্তরে তাহার অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছেন। কিন্তু, আমাদের সে কথা কেমন মনে লাগে না। ঐ যে রাখাল আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখা-না-দেখার প্রান্তে কাঁপিতেছে, কোনো দিন সে যে এখানে ছিল না, তাহা আমরা ভাবিতে পারি না। আমরা এক বড় বংশের উত্থান-পতনের কাহিনী বর্ণনা করিতে যাইতেছি। বংশের উত্থান পতন আছে, সভ্যতার সৃষ্টি ধ্বংস আছে, কিন্তু নিছক মানুষটা ঐ রাখালের মধ্যে চিরকাল বিরাজ করিতেছে। কিন্তু সত্যই হয়তো একদিন মানুষ ছিল না। মানুষের অনন্তকালের ধারণা প্রকৃতির অনন্ত-

কাল নয়। মানুষ সান্ত্বনার জন্য নিজের ক্ষুদ্র স্মৃতির মানদণ্ডের অনুপাতে একটা অনন্ত কালের সৃষ্টি করিয়াছে। তার খ্যাতি, স্মৃতি, সভ্যতাকে যখন সে অনন্তকালব্যাপী মনে করে, তখন সে কাল প্রকৃতির নয়, মানুষের সৃষ্ট অনন্ত কাল। একদিন আসিবে, যখন তার সৃষ্ট অনন্ত সমাপ্ত হইয়া যাইবে; তখন অপরিমেয় তুষারস্তূপের তলে ঐ রাখাল-বালকের অস্থি আর প্রবল-প্রতাপান্বিত চৌধুরীবংশের অস্থি একত্র সমাহিত হইয়া যাইবে। তখনো নিঃসপত্ন প্রকৃতির অনন্তকাল ওষ্ঠাধরে তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া এই মাঠের মধ্যে মানবহীন নির্জ্জনতায় নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবে।

চৌধুরী বাড়ী

চৌধুরী-বাড়ীর কাছারীর প্রশস্ত আঙিনায় আজ সকালে বড় ভিড়। চোর ধরা পড়িয়াছে। কাছারীর বারান্দায় দেওয়ানজী বসিয়াছেন, টোলের ভট্টাচার্য্য আসন্নপ্রায় দুর্গাপূজার ব্যবস্থা করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি বসিয়াছেন, আমলাগণ বসিয়াছে। একপাশে বাড়ীর বালকেরা, সরিকের বাড়ীর বালকেরা নিঃশব্দ ঔৎসুক্যে স্থির হইয়া আছে। প্রাঙ্গণের একপাশে পাড়ার একদল ছেলেমেয়ে জুটীয়া গিয়াছে, অন্যদিকে বাড়ীর দারোয়ান-বরকন্দাজের দল। মাঝখানে সকলের মনোযোগের কেন্দ্রে চোর চুপ করিয়া বসিয়া আছে, নড়েও না, কথাও বলে না। আসামীর নিতান্ত নাবালক বয়স দেখিয়া ভোজপুরী ডালরুটির দল মনঃক্ষুণ্ণ। চহরজা সিং দলের মধ্যে দৈহিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ। সে সর্ব্বদাই বলিয়া থাকে, একবার ডাকু পড়িলে নিজের বলবীর্য্য প্রকাশ করিবার সুযোগ পায়। সে ভোরে উঠিয়া কুস্তি

করিতেছিল। চোরের কথা শুনিয়া বিক্রম প্রকাশের জন্য ছুটিয়া বাহির হইয়া একটা 'লেড়কা'—মাত্রকে দেখিয়া অপ্রসন্নচিত্তে চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

বালক-বালিকাদের আগ্রহই যেন কিছু বেশী! চোর ছেলেমানুষ, তাহাদের অপেক্ষা অল্প বড়। সেইজন্যই এই ব্যাপারটাতে তাহাদের অধিকার যেন অন্যদের অপেক্ষা অধিক। বালকমাত্র হইলেও চোর হওয়া যায়, এতগুলি বিক্রমশালী বয়স্কের ভয়ের কারণ হওয়া চলে, ইহা ভাবিয়া সেই বালক-চোরের প্রতি এমন কি নিজেদের নাবালকত্বের প্রতি তাহাদের মনে একটা গর্ব্বের ভাব জাগিতেছিল। এই সব নানা কথা ভাবিয়া তাহারা চোরের কাছে ঘেসিয়া বসিয়াছে।

ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রিক মানুষ কিন্তু তিনিও যে ফৌজদারী ব্যাপারে অপটু নন, তা প্রমাণ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাঁর হুঙ্কার সকলকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। তিনি হাঁকিলেন—বল্ বেটা, তোর নাম কি?

সকাল হইতে এই প্রশ্ন হইতেছে, কিন্তু চোরের মুখে কথা নাই। চহরজা সিং নিজের পরিপুষ্ট গোঁফ ও তৈলপুষ্ট লাঠিখানার দিকে একবার দৃক্‌পাত করিয়া ভট্টাচার্য্যের পণ্ডিতি প্রথার প্রতি মনে মনে ধিক্কার দিল। ভাবখানা এই যে, এরকম দেওয়ানী উপায়ে চোর কখনও নাম-ধাম বলে না। এ যদি বালকমাত্র না হইয়া একটা বিরাটকায় ডাকু হইত, তবে সে স্বীকারোক্তির হিন্দুস্থানী পন্থা দেখাইয়া দিত। কিন্তু, তার গুরুর হুকুম বালক ও স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিবে না। গুরুর আদেশ স্মরণ হইবামাত্র শিহরিয়া উঠিয়া মনে মনে সে গুরুকে প্রণাম করিল।

বেলা বাড়িয়া চলিল। চোর পূর্ব্ববৎ নিরুত্তর। রসভঙ্গ হয় দেখিয়া জনতা মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। সকাল বেলাতেই অভাবিত এমন একটা ঘটনা, এতক্ষণে তার নাটকীয়তার পঞ্চমাঙ্কে পঞ্চত্বে অবসান ঘটা উচিত ছিল। কিন্তু, এতবড় একটা সম্ভাবনার এমন অপমৃত্যু। সকলেই মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিল।

কিন্তু, লোকটা যখন চোর, তখন তার স্বীকারোক্তির জন্য আবার অপেক্ষা কেন! মানুষ যতই দোষী হ'ক না কেন, তাকে নিজের মুখে স্বীকার করাইয়া লইয়া দণ্ড দিলে মনে একটা আত্মপ্রসাদ পাওয়া যায়। সে যদি একবার মুখ খুলিয়া বলে, সে দোষী, তবে তাকে যথেচ্ছ দণ্ড দিতে মনে বাধে না। কিন্তু সে যদি নিরুত্তর থাকে? মানুষ ঐ নীরবতার রহস্যকে বড় ভয় করে। সেই জন্যই সমুদ্র, নিশীথ রাত্রি, গভীর অরণ্য ভয়ঙ্কর। আর সব চেয়ে ভয়ানক যে-মানুষ বোবা। কিন্তু, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তার অপেক্ষাও বড় কথা আছে। লোকটা যে সত্যই চোর, তাও প্রমাণ করা হয় নাই। চোর যখন কিছুতেই উত্তর দিল না, ভট্টাচার্য্য হতাশ হইয়া দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেওয়ানজী কি করা যায়। দেওয়ানজী ফৌজদারি মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। কিন্তু, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তিনি দেওয়ানী মনোভাব প্রকাশ করিলেন। বলিলেন—ওর বিরুদ্ধে কি প্রমাণ আছে দেখা যা'ক না।

ভট্টাচার্য্য যা আশঙ্কা করিতেছিলেন তাই বুঝি বটে। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—প্রমাণ! প্রমাণ আবার কি! জমিদারীর কাছারী শেষে কি কোম্পানীর আদালত হয়ে উঠবে না কি! তারপরে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে দেওয়ানজীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন—দেওয়ানজী প্রমাণের মধ্যে যাবেন না—সে বড় নটঘটি!

ভট্টচার্য্য এমন সত্য কথা জীবনে খুব কমই বলিয়াছেন। বোধ করি, অনেক ঠেকিয়াই শিখিয়াছেন। ন্যায় বিচারের পক্ষে প্রমাণের মত এমন গুরুতর বাধা অল্পই আছে। শাসকের উদ্যত দণ্ডকে প্রমাণ বাঁচাইয়া প্রয়োগ করিতে হইলে রাজ্যশাসন অসম্ভব হইয়া পড়ে। রাজদণ্ড ঘটোৎকচের মত সমস্ত গ্রাম জুড়িয়া পড়িবে, যাতে অপরাধীর বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা না থাকে। ভট্টাচার্য্য জানেন, সূক্ষ্ম প্রমাণের খিড়িকি দ্বার দিয়া কত চিহ্নিত ব্যক্তি রাজদণ্ডের হাত এড়াইয়া যায়। অতএব, সে দিকটা সর্ব্বতোভাবে

বন্ধ করিতে না পারিলে রাজ্যরক্ষা অসম্ভব। অতএব, তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—চহরজা সিং, তোল্ বেটাকে কাণ ধরে।

বালকের কর্ণধারণে গুরুবাক্য লঙ্ঘন হইবে কি না, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সে ছেলেটার হাত ধরিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। এতক্ষণে সকলে চোরকে সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইল। বয়স কত হইবে বলা যায় না তবে এখনও বালক। মাটি হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত পা দুটা বিসদৃশ ভাবে দীর্ঘ আবার কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত তেমনি বিসদৃশ ভাবে হ্রস্ব। হাত দুটা দেহের স্বাভাবিব অনুপাত ভঙ্গ করিয়া খর্ব্ব। মাথাটা ছোট, চোখ দুটা অত্যন্ত উজ্জ্বল ; মুখ বুজিয়া আছে, তবু মনে হয় সর্ব্বদা একটা ম্লান হাসির আভা সমস্ত মুখমণ্ডলে। দেহের এই অস্বাভাবিকতা বিরুদ্ধে প্রধান প্রমাণ হইয়া উঠিল।

ভট্টাচার্য্য পার্শ্ববর্ত্তী আমলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—ও হে সরকার দেখেছ।

সকলে যাহা দেখিয়াছে, সরকারও তাই দেখিয়াছে।

সে বলিল—আজ্ঞে হাঁ পা দুটা বিশ্রী রকম লম্বা।

ভট্টাচার্য্য ক্ষেপিয়ে উঠিলেন—তুমি ত কেবল পা-ই দেখেছ! সাধে কি চার টাকার চাকরি করে জীবন কাটালে!

বালকের দৈহিক অস্বাভাবিকতা ছাড়া আর যে কিছু দেখিবার আছে, কেহ তাহা ভাবে নাই। এবার সকলেই ভট্টাচার্য্যের দিব্যদৃষ্টির তারিফ করিতে লাগিল। এবং নিজেদের সে দৈবশক্তি নাই মনে করিয়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে থাকিল। ভট্টাচার্য্যের ইচ্ছা, সকলে তার মত তর্ক ছাড়িয়া বিশ্বাসের বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠুক, লোকটার একটা হেস্তনেস্ত হইয়া যা'ক। তিনি বলিলেন—না। তোমাদের দিয়ে হবে না—ডাক স্বরূপ সর্দ্দারকে।

স্বরূপ সর্দ্দার দেউড়িতে বসিয়া রোদ পোহাইতে ছিল, ডাক শুনিয়া আসিয়া হাজির হইল।

ভট্টাচার্য্য তাকে খুসি করিবার জন্য বলিলেন—সর্দ্দার এদের দ্বারা হ'ল না, তুমি একবার লাগত'। সে একবার বালকের দিকে তাকাইয়া একবার ভট্টাচার্য্যের দিকে তাকাইয়া, ধীরে ধীরে বলিল—হুজুর যে-হাতে একদিন পলাশীর ময়দানে তলোয়ার ধরেছি সে হাত ছেলে-মানুষের উপর তুলতে পারব না।

তার উত্তরে ভট্টাচার্য্যের মনে কি ভাবের উদয় হইল জানি না। বোধ করি, তিনি পলাশীর পরাজয় যে শাস্ত্রের বিধান, মনে করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতেছিলেন। স্বরূপ সর্দ্দারের উক্তিতে বালক সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল। কারণ, সর্দ্দার যাকে ছাড়িয়া দিল, ভট্টাচার্য্য জানিতেন, অন্য কোন বরকন্দাজ তাকে স্পর্শ করিবে না।

এমন সময়ে কাছারীর বারান্দায় যে কয়েকটি ছেলে বসিয়া ছিল, তন্মধ্যে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল—স্বরূপ দাদা, ছেলেটা বোবা! সর্দ্দারেরও তাহা সন্দেহ হইতেছিল, কাছে গিয়া ছেলেটাকে নাড়িতেই সে একটা দুর্ব্বোধ্য অস্পষ্ট অস্বাভাবিক বিকৃত চীৎকার করিয়া উঠিল। সকলেই বুঝিল, ছেলেটা যে এতক্ষণ কথা বলে নাই, তার কারণ সে কথা বলিতে পারে না। এ গ্রামে কেহ তাকে ইতিপূর্ব্বে দেখে নাই, এখানে সে নবাগত। চীৎকারের সহিত তার চোখ দিয়া অবিরাম জল পড়িতে আরম্ভ করিল এবং সে পূর্ব্বোক্ত বালকটির দিকে হাত নাড়িয়া কি যেন বলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল সেই অবোধ্য চীৎকার, চোখের জলে এবং মুখের বিকৃত চাপা হাসির ভাবে তার সমস্ত মুখ এমন অদ্ভুত হইয়া উঠিল যে, তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা ভয়াবহ ভাব মিশ্রিত না থাকিলে লোকে হাসিয়া ফেলিত। স্বরূপ সর্দ্দার সেই বালকটিকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া কেবলি বলিতে লাগিল—দাদাবাবু সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান্। বড় হলে সে……ইত্যাদি। হতাশ জনতা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

এতক্ষণ কেহ একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে নাই। যখন এই ঘটনা ঘটিতে-

ছিল, কাছারীর ছাদের উপরে একটা কাল দাঁড়কাক বসিয়া ক্রমাগত ডাকিতেছিল। জনতা কমিয়া গেলে কাকটা উড়িয়া আসিয়া ছেলেটার কাঁধের উপরে বসিল। সকলে দেখিল, কাকের একটিমাত্র পা। কাকটা কঃ কঃ শব্দ করিয়া ছেলেটাকে ঠোকরায়; ছেলেটা হোঃ হোঃ শব্দ করিয়া কাকটাকে চড় মারে।

এ ব্যাপারে দেখিয়া ভট্টাচার্য্য শঙ্কিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী সরকারকে বলিলেন —দেখলে ত!

সরকার তার বেতনের উল্লেখে এবং জীবনে যে আর বেতনবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই, এই ভবিষ্যৎ ভাষণে ম্রিয়মাণ হইয়া বসিয়া ছিল—সে সংক্ষেপে বলিল—হুঁ।

—কেন এবার পা দেখতে পাও না?

সরকার বলিল—কেন?

—কেন কি? দেখছ না একখানা পা। ভুষমণ। লক্ষণ ভাল নয় হে, লক্ষণ ভাল নয়।

এমন সময় ভট্টাচার্য্য দেখিতে পাইলেন কর্ত্তা অন্দর হইতে বাহির হইয়া বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। তিনি তখন ফৌজদারি বিভাগ ত্যাগ করিয়া আসন্নপ্রায় দুর্গোৎসবের ব্যবস্থা করিবার জন্য উঠিয়া বৈঠক-খানায় গেলেন। স্বরূপ সর্দ্দার দাদাবাবুকে কাঁধে করিয়া বোবা ছেলেটাকে টানিয়া লইয়া দেউড়ির দিকে চলিল। দেওয়ানজী সপরিষদ উঠিয়া কাছারীতে গিয়া বসিলেন।

২

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা তিনজন ব্যক্তিকে দেখিয়াছি, যাদের সহিত এই কাহিনী নিবিড়ভাবে জড়িত। চৌর্য্যশাসনহতাশ ভট্টাচার্য্য বৃদ্ধ কর্ত্তাকে বৈঠকখানায় আসিয়া বসিতে দেখিয়াছিলেন। আমরাও তাঁর অভ্যাস মাত্র দেখিয়াছিলাম, এখন ঘনিষ্ঠ-ভাবে তাঁর সহিত

মিশিবার সুযোগ পাইব। বৃদ্ধের নাম উদয়নারায়ণ চৌধুরী। ইঁহারই সময়ে চৌধুরী বংশের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি, আবার ইঁহারই সময়ে চৌধুরীবংশে ভাগ ঘটিল। যে-সময়ের কথা বলিতেছি, তখন চৌধুরীবংশের তিন সরিক। তন্মধ্যে মধ্যম তরফ প্রবলতম, উদয়নারায়ণ তার মালিক, এই কাহিনী মধ্যম তরফের পরনের ইতিহাস।

বৃদ্ধ না হইলে বুঝি পুরুষের যথার্থ সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায় না, অন্ততঃ উদয়নারায়ণকে দেখিয়া তাই মনে হয়। দীর্ঘাকৃতি বিরাট পুরুষ, বহুব্যবহৃত বিশাল হরধনুর মত ঈষৎ নত। পক্ককেশ, দাড়িগোঁফ কামানো; রোমশ ভুরুর নীচে অচঞ্চল চোখ, কাল দীঘির জলের মত; ক্ষণে ক্ষণে তাহাতে কৌতূহলের কিরণ ঝলকিয়া ওঠে। চাপা ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়া যেন একটি কথাও বাহির হয় না, বৃদ্ধের ভাব প্রকাশের প্রধান সহায় অদ্ভুত দুই চোখ। মুখে একটিও কথা বাহির হয় না বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে প্রচুর হাস্যের অট্টরবে অট্টালিকা কম্পিত হইতে থাকে। যে দিন ঐ অট্টহাস্য বন্ধ থাকে, সেদিন চৌধুরীদের প্রকাণ্ড বাড়ী আশঙ্কায় থম্ থম্ করে; কাছারীতে কোলাহল বন্ধ, পূজার দালানে শঙ্খ-ঘণ্টার শব্দও যেন ভীত-ভাবে ধ্বনিত হয়, চাকর-চাকরাণী, দাস-দাসী নীরবে যাতায়াত করে, এমন কি, বৃদ্ধের পৌত্রও অজানিত আশঙ্কায় খেলা-ধূলা ছাড়িয়া দেউড়ির ছাদে আশ্রয় লয়। সবল ঋজু দেহযষ্টিতে বার্দ্ধক্যের শিথিলতা আসিয়াছে, কিন্তু ব্যাকুল পুত্রকে যেমন অসন্তুষ্ট পিতার সম্পত্তির জন্য তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত সবুর সহিয়া থাকিতে হয়, তেমনি জরা জানে, মৃত্যুর পূর্ব্বে ঐ দেহকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারিবে না।

বাঙালীর ঘর হইতে এই বিরাট পুরুষের দল লোপ পাইয়া গিয়াছে। এই সব বিরাট দেহ বিরাট কাজের জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল। আজ দেড়শত বৎসরের অধিক বাঙালীর হাতে বড় কাজ নাই, অব্যবহারে, অপ্রয়োজনে মরিচা ধরিয়া এই সব বিরাট দেহ ধীরে ধীরে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

জোড়াদীঘির চৌধুরী-পরিবার

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর পাণ্ডবভ্রাতৃগণের বহু অক্ষৌহিণী-বিজয়ী সেই সব মহা অস্ত্রের কি হইয়াছিল বলিতে পার? আমি জানি। অষ্টাদশ দিবসে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী বিধ্বস্ত হইয়া গেলে জ্ঞাতিরক্ত ধৌত করিয়া প্রলয়ের শিখারূপী অস্ত্রগুলিকে প্রাচীন অস্ত্রশালার মৃত্যু-শীতল পাষাণ-প্রাচীরের গাত্রে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। তারপর পাণ্ডবেরা স্বর্গারোহণ করিলে লোকে সেগুলার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিল। বহু পরে কৌতূহলীর কোন অধস্তন পুরুষ হিমাস্তের গুহানিহিত সর্পরাজির মত সেই অস্ত্রগুলিকে একদিন্ আবিষ্কার করিল। কিন্তু হায়, বহু দিনের অব্যবহারে তাহারা প্রয়োগের অতীত হইয়া গিয়াছে। বাঙালীর বিরাট পুরুষদেরও সেই দশা। যে-দেহ রাজ্যচালনার জন্য, যুদ্ধ-চালনার জন্য, ইতিহাসের বল্গা-ধারণের জন্য অভ্যস্ত, বাক্‌চালনায় ও মসীচালনায় তাহার পুরাতন নৈপুণ্য কেমন করিয়া থাকিবে।

উদয়নারায়ণ বাল্যকালে পিতার সহিত ঝগড়া করিয়া গৃহত্যাগ করেন। ঘুরিতে ঘুরিতে মুর্শিদাবাদ গিয়া অল্প কিছু লেখাপড়া শিখিয়া নবাব-সরকারে একটি কাজ সংগ্রহ করেন। পিতার মৃত্যুসংবাদে যখন তিনি জোড়াদীঘিতে ফিরিয়া আসেন, তখন তিনি রীতিমত ধনবান্। সংসারের ভার লইয়া বিবাহ করেন, জমিদারির উন্নতি করেন। তাঁর একটি মাত্র পুত্র উদয়নারায়ণ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পুত্রের বিবাহ দেন। একটি পৌত্র জন্মিবার পরে পুত্রের সহিত বৃদ্ধের ঝগড়া। পুত্র গৃহ ত্যাগ করেন। কিছুদিন পরে সংবাদ আসে, বিদেশে পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার অল্প দিনের মধ্যে পুত্রবধূর মৃত্যু ঘটে। পৌত্র তখন শিশু। পুত্র ঝগড়া করিয়া বিদেশে যাওয়াতে বৃদ্ধ তেমন উদ্বিগ্ন হন নাই, কারণ এ অভিজ্ঞতা তাঁর ভাগ্যেও ঘটিয়াছে, বিশেষ, এইরূপ গৃহত্যাগ অনেক সময় শাপে বর হয়, তিনি ত ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া ফিরিয়াছিলেন। মনে মনে কষ্ট পাইলেও তিনি জানিতেন, একদিন সে ফিরিবেই, সেদিন তার দ্বিগুণ সুখ, পুত্রের প্রত্যাবর্ত্তনে ও পিতার জয়ে। বরঞ্চ পুত্রের গৃহত্যাগের পর তাঁকে অধিকতর আনন্দিত দেখাইত।

টোলের ভট্টাচার্য্যের সহিত সারাদিন কেবল অনুপস্থিত পুত্রের বিষয় আলাপ হইত। যেদিন পুত্র ফিরিবেন সেদিনের উৎসবটা কি রকম হইবে, এ বিষয়ে অনেক তর্ক হইয়াছে এবং অন্যান্য খরচের মধ্যে ভট্টাচার্য্যের জন্য একখানা শালের খরচ ধরা হইয়াছে। ভট্টাচার্য্য দাবী করিয়াছেন শাল, উদয়নারায়ণ বলিয়াছেন, সে হইবে না, তুমি ব্রাহ্মণীকে ফাঁকি দিয়া শাল গায়ে দিবে। তোমাকে দেওয়া হইবে বেনারসী শাড়ী। অবশেষে অনেক বিতণ্ডার পরে স্থির হইয়াছে শাল ও শাড়ী দুইই সেদিন বিতরিত হইবে। একদিন ভট্টাচার্য্য বলিলেন, তিনি ভোর রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, শ্রীমান বাড়ী ফিরিয়াছে। খোস-খবরের ঝুটাও ভাল বলিয়াই বৃদ্ধ কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, কিন্তু মনে মনে কেবল ব্যাকুলতার ভাব রহিয়া গেল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বৈঠকখানায় বসিয়া রহিলেন এবং বলিয়া দিলেন দেউড়িতে যেন লোক জাগিয়া থাকে।

অবশেষে, একদিন সংবাদ আসিল, প্রত্যাবর্ত্তনের নয়, পুত্রের মৃত্যুর। বাড়ীশুদ্ধ লোক ভয়ে নিস্তব্ধ, কি জানি অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে। অভাবনীয় কিছুই ঘটিল না। সেদিন হইতে পুত্রের উল্লেখ বৃদ্ধের মুখে বন্ধ হইল। অট্টালিকার গাত্রে যে বটগাছ জন্মে, বাহিরে তা এতটুকু মাত্র, দুটি পাতা, আর চার আঙুল কাণ্ড, কিন্তু গোপনে গোপনে তার বিরাট শিকড়জাল প্রাচীন অট্টালিকাকে অমোঘ মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া রস শোষণ করিতে থাকে। পুত্রের এই গুপ্ত মৃত্যুশোক বৃদ্ধকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিল। তিনি পৌত্রের সহিত দ্বিগুণ ঘনিষ্ঠতা জমাইয়া তুলিলেন।

একদিন পিতামহ, অন্যদিকে পৌত্র, মাঝখানে এক পুরুষের ছেদ; স্নেহ বল, ভালবাসা বল, কিছুতেই এ ছেদের সেতুবন্ধ হয় নাই। বৃদ্ধ হাত বাড়ায়, শিশু হাত বাড়ায়, হাতে হাতে আর স্পর্শ করে না, মাঝখানের এই অনতিক্রম্য অবকাশটায় আতুর হৃদয়ের স্নেহের অঞ্জলি বারংবার অতল শূন্যে পড়িয়া যায়।

উদয়নারায়ণের এক বিধবা ভগ্নী সংসারের কর্ত্রী। যেদিন বৃদ্ধের

বেশি মন খারাপ হইত, কিছুতেই আর বাক্যহীন শোকের উচ্ছ্বাস সহ্য করিতে পারিতেন না, সেদিন অকারণে গিয়া ভগ্নী দ্রবময়ীকে ভর্ৎসনা করিতেন। গভীর শোকের উপযুক্ত নিষ্ঠুর তিরস্কার। রূঢ়, অশ্লীল বাক্যে দ্রবময়ী যখন কাঁদিতে কাঁদিতে শয্যা গ্রহণ করিতেন, বৃদ্ধ তখন, আবার বহুদিন পরে অট্টহাস্য করিয়া উঠিতেন। দাসদাসীরা বুঝিত আবার কিছুদিনের মত ঝড় কাটিয়া গেল। ঝড় কাটিয়া যায়, কিন্তু মেঘ কাটে না। বৃদ্ধের অধৈর্য্য ঘুচিয়া যায়, কিন্তু শান্তি ফেরে না। কেবল একটি বিষয়ে ব্যতিক্রম ছিল না, মৃত্যুর পরে পুত্রের উল্লেখ কোনো দিন কেহ তাঁর মুখে শোনে নাই। উল্লেখ ছিল না, কিন্তু দুঃখ ছিল। সে দুঃখ কত তীব্র, একটি ঘটনায় তা প্রকাশ পায়। প্রতিবার বর্ষাকালে বরিশাল, ফরিদপুর, বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বার্ষিক বৃত্তি আদায়ের জন্য চৌধুরী-বাড়ীতে আসিতেন। সেবার এক হতভাগ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কর্ত্তাকে খুশী করিবার জন্য পুত্রের অবিমৃষ্য-কারিতার উল্লেখ করিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, পুত্রের নিন্দামাত্রের উল্লেখে ষষ্টিপর বৃদ্ধ জ্যা-বিমুক্ত ধনুকের মত অকস্মাৎ গর্জ্জন করিয়া খাড়া হইয়া উঠিলেন। অসমাপ্তবাক্য ব্রাহ্মণপণ্ডিত ততোধিক আকস্মিক এক লম্ফে দেউড়ির বাহিরে লাফাইয়া গিয়া পড়িলেন। সেই দিন হইতে হতভাগ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চৌধুরী-বাড়ীর বৃত্তির আশা নির্ম্মূল হইল।

৩

এক একটা লোক আছে, যাদের জীবনশৃঙ্খলের সবগুলি গ্রন্থির সন্ধান পাওয়া যায় না। তাদের ইতিহাসে সেগুলি অন্ধকার যুগ। এই অন্ধকারের রহস্য অনেক সময় সাধারণ লোককেও অসাধারণ করিয়া তোলে। স্বরূপ সর্দ্দার তেমনি একজন লোক। ইতিপূর্ব্বে পাঠক একবার তাকে

দেখিয়াছেন; সে এখন বৃদ্ধ; চৌধুরীবাড়ীতে তার জীবনের দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাটিয়াছে। তৎপূর্ব্বের ইতিহাসের ছিন্নগ্রন্থি জোড়া দিবার সাধ্য আমাদের নাই—আমরা যেটুকু পারি করিব মাত্র।

স্বরূপের বাড়ী বীরভূম জেলায়। তার শৈশবে বাংলাদেশের উক্ত অঞ্চল দিয়া একটা দুর্য্যোগের ঝড বহিয়া গিয়াছিল—বর্গীর হাঙ্গামা। সেই ঝড়ে শত শত অসহায় পরিবারের ন্যায় স্বরূপেরও পিতামাতা আত্মীয়স্বজন যে কেমন করিয়া বাঁচিয়া গেল, বলিতে পারি না। ইহার পরে পুনরায় যখন তাকে দেখি, তখন সে মুর্শিদাবাদে নবাবের সৈন্যদলে অশ্বারোহী সৈন্য। মাঝখানকার পর্ব্বের কথা কেহ জানে না. স্বরূপও কাউকে বলে নাই। বোধ করি, তা এতই অকিঞ্চিৎকররূপে সাধারণ, বলিবার মত নয়। সে পলাশীর যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় নবাবের সব আশা যখন নির্ম্মূলপ্রায়, তখন যে কয়েক শত অশ্বারোহী মহারাজ মোহনলালের অধীনে শেষবারের জন্য আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, স্বরূপ ভাগ্যক্রমে তাদেরও একজন ছিল। ইতিহাস-সূর্য্যের একরাশি হইতে অন্য রাশিতে সংক্রমণ করিবার সময় যারা প্রত্যক্ষ করিতে পারে. তারা সৌভাগ্যবান্ বটে। স্বরূপ ইতিহাসের এমন সন্ধিক্ষণে বার কয়েক উপস্থিত ছিল. কিন্তু তাদের গুরুত্ব সে বুঝিতে পারে নাই। তার দোষ কি, বোধ হয়, সমগ্রদেশে একটি লোকও তা বুঝিতে পারে নাই। কিংবা মানুষের বুদ্ধির সঙ্কীর্ণতার মধ্যেই ইহার মূল নিহিত। বর্ত্তমানের গুরুত্ব কে জানিতে পারে? বর্ত্তমান যখন অতীত হইয়া দেখা দেয়, তারিতো নাম ইতিহাস।

পলাশীর বিপর্য্যয়ের পর নবাবের সাহায্যকারী ফরাসী সৈন্যদলের ভৃত্যরূপে সে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে। কিছুকাল পরে মীরকাশিম নবাব হইলে সে সৈন্যদলে প্রবেশ করে। স্বরূপ উদয়নালা ও ঘিরিয়ার যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। শেষোক্ত রণক্ষেত্রে সে সাংঘাতিকরূপে আহত হয়।

করিয়াছে, সে-সড়কী আর কারো জন্য ধরিতে পারিবে না, এই বলিয়া সেই দীর্ঘ সড়কী সবলে সে মাটিতে নিক্ষেপ করিল। দীর্ঘ সড়কীর প্রায় তিন হাত মাটিতে বসিয়া গেল। সে বলিল, যদি কোনো দুষমণের সাধ্য থাকে, তবে যেন সে এই সড়কী একটানে তোলে। আর যদি আল্লার দয়া হয়, তবে আবার এই সড়কী সে নিজেই তুলিবে, আর কেহ পারিবে না। এই বলিয়া সে চৌধুরীবাড়ী ত্যাগ করিল। সত্যই সে সড়কী কেহ টানিয়া তুলিতে পারে নাই। স্বরূপ পারিত কি না জানি না, কিন্তু সে চেষ্টাই করে নাই। কর্ত্তা একদিন স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, স্বরূপ বলিয়াছিল, কর্ত্তার আশীর্ব্বাদে ইহা তার অসাধ্য নয়; কিন্তু আলিবর্দ্দী যে-পরিমাণে আহত হইয়াছে, তারপরে এই অহঙ্কারের সান্ত্বনাটুকু না থাকিলে সে বাঁচিবে না। একথা উদয়নারায়ণ ও স্বরূপ ছাড়া আর কেহ জানে না।

৪

চোর ধরার দৃশ্যে যে বালকটি বলিয়াছিল—চোর কথা বলিতে জানে না, সে আর কেহ নহে উদয়নারায়ণের পৌত্র, দর্পনারায়ণ। দর্পনারায়ণ শৈশব হইতে পিতৃমাতৃহীন। পিতার পিসীমাতা দ্রবময়ী ও দাসী জগদম্বা তাকে মানুষ করিয়াছে।

তার বয়স বছর বার; ঘটনার দিক হইতে তার জীবন উল্লেখ-যোগ্য নয়; কিন্তু তাই বলিয়া তা কম চিত্তাকর্ষক নয়। শিশু ও বৃদ্ধের জীবনে ঐক্য আছে; ঘটনায় বিচারে উভয়ের জীবন নগণ্য; শৈশব ও বার্দ্ধক্যের বৈচিত্র্য ঘটনায় নয়, স্মৃতিতে। শৈশবের সম্মুখে ভবিষ্যৎ, বৃদ্ধের সম্মুখে অতীত—এই দুই উদয়াস্তাচল-প্রসারিত বিস্তৃত ক্ষেত্রে স্মৃতির যেমন অবাধ বিহার, এমন আর কোথাও নয়। শিল্পী যেমন অট্টালিকা-নির্ম্মাণের পূর্ব্বে যৎসামান্য উপকরণে তার ক্ষুদ্র একটি আদর্শ গড়িয়া

নয়, শিশুও নিজের কল্পনার ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে ক্ষণভঙ্গুর উপাদানে ভবিষ্যতের বিরাট জীবনের আদর্শ মূর্ত্তি গড়িতে থাকে। এই হিসাবে শিশুর মনস্থগভীর।

দর্পনারায়ণ অনেক সময় নিজের শৈশবের কথা ভাবিত। তার চোখ দিয়া আমরা সেই স্মৃতির শোভাযাত্রা দেখিব।

চৌধুরী-বাড়ীতে দোলের বড় ধুম। আঙ্গিনাজোড়া প্রকাণ্ড সামিয়ানা খাটান হইত। বাঁশের খুটির আগাগোড়া দেবদারুপাতা-মণ্ডিত, মাটিতে পুরু করিয়া দেবদারু-পাতা পাতিয়া উপরে শতরঞ্চি পড়িত। সামিয়ানার চারিদিকে লাল শালুর ঝালর, মাঝখানে বৃহৎ ঝাড়লণ্ঠন কাঁচের দোলকে ইন্দ্রধনুর রং; বাতাসে কাঁচের দোলক দোলে, ইন্দ্র ধনু কাঁপিতে থাকে। ঝড়ের উপরে একশ'টা শুভ্র সরল মোমবাতি এক ঝাড় রজনীগন্ধার মত ফুটিয়া ওটে। আঙিনার উত্তরে প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপ; বারান্দায় চিক টাঙাইয়া মহিলাদের বসিবার স্থান। যাত্রার আসর অতিথি-অভ্যাগতে পূর্ণ, আসরের বাহিরে যেখানে যে পারিয়াছে, কেহ দাঁড়াইয়াছে, কেহ বসিয়াছে, কেহ কোন রকমে শুধু মুখখানি বাহির করিয়া রাখিয়াছে মাত্র। আসরের মাঝখানে যাত্রার দল; বাঁয়া-তবলা বাঁধা হইতেছে, বেহালার তারে দ্রুত ছড়ি চালাইয়া পরীক্ষা চলিতেছে, টুং টাং টুক টাক—এই পর্য্যন্ত। যাত্রার সময় আসন্ন হইয়া উঠিল, হঠাৎ আসরের গুঞ্জনের মধ্যে একটা বিরতি দেখা দিল, সকলে দেখিল, বৃদ্ধ উদয়নারায়ণ শুভ্র উত্তরীয় গায়ে দিয়া আসিয়া বসিলেন। ভৃত্যেরা পান-তামাক সাধিয়া বেড়াইতেছে। যাত্রা আরম্ভ হইল, মেয়ে-যাত্রা। আসরের মাঝখানে জালি চাদর পাতা, চাদরের তলে প্রচুর আবির ছড়ান। সুন্দরী সুবেশা তরুণীর নৃত্যের তালে তালে আবির উড়িয়া চারিদিক লাল করিয়া দিল। দর্শকের গাত্রবস্ত্র রঙীন হইল, মুখে রং লাগিল, চুলের ফাঁকে ফাঁকে রং জমিয়া গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে চতুর্দ্দিকে একটা

রঙীন কুয়াসা। সেই কুয়াসার ফাঁকে ফাঁকে নৃত্যপরায়ণা নর্ত্তকীর দল। আসর থমথম করিতেছে, হাজার লোকের নিশ্বাস উঠিতেছে, পড়িতেছে, ঝাড়ে আলো জ্বলিয়া উঠিল; একশ' শিখায় লক্ষ ইন্দ্রচাপ চূর্ণ করিয়া ছড়াইয়া দিতে লাগিল। আলো জ্বলে, আবির ওড়ে, বেলা পড়ে আর তারি মধ্যে শোনা যাইতে থাকে—

চুয়াচন্দন ভারি পিচকারি, হানত ব্রজ-কুমারী।

দর্পনারায়ণের স্মৃতির শোভাযাত্রার এটা বাসন্তিক পর্ব্ব।

দুর্গাপূজার এক মাস আগে চৌধুরী-বাড়ীতে সাড়া পড়িয়া যাইত। রাজমিস্ত্রী বাড়ী মেরামত করিত, তারপরে চুণকামের পালা। সারা বৎসরের মলিনতা সাদা হইয়া উঠিত, দেয়ালের গায়ে দোলের ফিকা লালের চিহ্নগুলি আবার মিলাইয়া যাইত। বৈঠকখানার দেয়ালে রঙের একটা দাগকে ঘোড়া কল্পনা করিয়া দর্পনারায়ণ মনে মনে চাপিয়া বহু দূরদেশে গিয়াছে। সেই রূপকথার বাহনটি সেবার যখন ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া যাইতে লাগিল, দর্পনারায়ণের বড় কষ্ট হইয়াছিল। তারপরে আঙিনায় ঘাস তুলিয়া ফেলিয়া সমান করা হইত, মণ্ডপের সম্মুখে বাঁশ খাটাইয়া তাহাতে কলা, বাদামী জামির টাঙাইয়া রচনা তৈয়ারি করা হইত। মণ্ডপের বারান্দায় কুমারে প্রতিমা গড়িত। কুমারের চেহারা দর্পনারায়ণের বেশ মনে পড়ে, অনেকটা তার নিজের রচিত শিব-ঠাকুরের মত, নাদুস-নুদুস, মাথাটি কিছু বড়, কেবল রঙটা ঘোর কালো; কুমারের পরে মালাকারের পালা। বৃহৎ প্রতিমা দেখিতে দেখিতে বিচিত্র বর্ণে মনোরম হইয়া উঠিত, দর্পনারায়ণ সারাদিন বসিয়া দেখিত; মাঝে মাঝে রঙের বাটীটা, তুলিখানা আগাইয়া দিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিত; তারপরে ডাকের সাজে, জরিতে প্রতিমা ঝলমল করিত, ক্রমে পূজার দিন আসন্ন হইয়া উঠিত; ধূপের গন্ধ, শেফালির সৌরভ, চাকরদের হাক-ডাক, প্রতিবেশী বালকদের

নূতন ধুতি-চাদর এ সমস্তই তার কাছে স্বপ্নের মত সত্য এবং সুদূর মনে হইত। পূজার কয়দিন সে কি ভিড়, সে কি ঢাকের শব্দ। সমস্ত দিন ব্যাপী নিমন্ত্রিতের কোলাহল, বিবিধ খাদ্য দ্রব্যের স্তূপ; আঙিনায় কাছারীঘরের দীর্ঘ বারান্দায় ভোজননিরত নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সুদীর্ঘ শ্রেণী।

সবচেয়ে তার মনে পড়ে বলির সময়টা। আঙিনায় লোক ধরে না, ছেলেবুড়ো, স্ত্রীলোক, চারটা ঢাক, ঢাকের উপর পালকের সাজ, তার সঙ্গে চারখানা কাঁসি। বলির পূর্ব্বে উদয়নারায়ণ সরল-ভাবে অত্যন্ত সংযত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন, জনতা নিঃশ্বাস রোধ করিয়া থাকিত। বলি হইয়া গেলে ঢাকের শব্দ দ্বিগুণ হইয়া উঠিত, জনতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিত।

আর, তার মনে পড়ে মহা-অষ্টমীর দিনে মহিষ-বলির দৃশ্য। প্রথমে প্রকাণ্ড একটা মহিষকে আট দশজন লোক ধরিয়া মণ্ডপের সম্মুখে আনিত; পুরোহিত তার কপালে সিন্দুর, বেলপাতা, গঙ্গাজল, দিয়া উৎসর্গ করিয়া দিতেন। তখন সেই দশজন পালোয়ান মহিষের গলায় দড়ি বাঁধিয়া গ্রামের পথে পথে বহুক্ষণ ধরিয়া তাকে দৌড় করাইত। ক্রমে সে ক্লান্ত হইয়া পড়িত, মুখে ফেনা বাহির হইত, পা ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িত, তখন তাকে ফিরাইয়া আনিয়া মণ্ডপের সম্মুখে হাড়িকাঠে ফেলা হইত। দর্শকের ভিড়ে আঙিনা, বারান্দা, বাড়ীর ছাদ কোথায়ও তিলধারণের স্থান থাকিত না। নিস্তব্ধ জনতা, সূচ পড়িবার শব্দ শোনা যায়। মহিষের ঘাড়ে ঘি মর্দ্দন করা হইত, তার পশ্চাতের দুই পায়ে দড়ি বাঁধিয়া চরকির সাহায্যে টানিয়া ধরা হইত, অবশেষে পুরোহিতের সম্মতিতে কর্ম্মকার সাষ্টাঙ্গে প্রতিমাকে প্রণাম করিয়া বিশাল খড়্গের এক আঘাতে মহিষের মুণ্ড ছিন্ন করিয়া ফেলিত। সমস্ত বাড়ীর উপর হইতে শঙ্কার ভাব কাটিয়া যাইত, জনতা উল্লাসে চীৎকার করিয়া

জোড়াদীঘির চৌধুরী-পরিবার

৫

পাঠক, তুমি ভাবিতেছ—এ কি হইল! তোমার গল্পপাঠের আগ্রহের পারদ দেখিতে দেখিতে নামিয়া একেবারে নৈরাশ্যের কোঠায় গিয়া ঠেকিয়াছে। তুমি ভাবিয়াছিলে, বালীগঞ্জ-বিলাসী এক জোড়া রুগ্ন যুবক-যুবতীর গল্প শুনিবে তাদের বৈকালিক চায়ের পেয়ালার অবকাশে সুদীর্ঘ 'ফ্রয়ডিয়ান' তত্ত্বের আলোচনায় তোমার যৌন ক্ষুধা মিটিবে; প্রক্ষিপ্ত দুচারটা কঁতিনাঁতাল নাম তোমার বান্ধবীসভায় আলাপের মূলধনরূপে পাইবে। কিন্তু, এ কেমন গল্প, বহু বৎসর আগেকার এক নগণ্য গ্রাম জোড়াদীঘি এবং তারই নগণ্যতর কথা! ধৈর্য্য ধর, (তোমাদের ধৈর্য্যের অভাব আছে এমন তো জানি না সিনেমার জানালা ধরিয়া ঝুলিয়া থাকিতে কে তোমাদের দেখে নাই?) গল্প আরম্ভ হইবার আগে সেই যুগটার কথা একটু শুনিয়া লও। সত্য কথা বলিতে কি পাঠক, তোমাদিগকে একটু ইতিহাস শুনাইব। বাংলা দেশের সেই সময়ের কথা, যাকে আমি বলি সত্যযুগ, তোমারা বলিবে স্বর্ণযুগ (স্বর্ণ ই তো সত্য, কি বল পাঠিকা?)

খৃষ্টীয় ১৭৯৩ হইতে ১৮২৫ অব্দের মধ্যবর্ত্তী কাল তোমরা শুনিয়া বলিবে অন্ধকার যুগ; আমি বলিব, হাঁ, কষ্টি-পাথরের মত কালো; যার উপরে বর্ত্তমান যুগটার যাচাই অবশ্যম্ভাবী! তোমরা সে যুগের কথা শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিবে, কর; বিদেশীর রচিত ইতিহাসে স্বদেশের কথা পড়িলে এমনটিই হয়। আমি বলিব, এ সেই যুগ, যার আদর্শ আমার হৃৎকমলের নিভৃতে পুনরাবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে; এ সেই যুগ, যাকে আমরা স্বেচ্ছায়, অবজ্ঞায় মোহাচ্ছন্ন ঘৃণায় ভাঙ্গিয়াছি আর ভাঙ্গিয়াছি, আর আজ তারই শ্মশানে বসিয়া ইউরোপের স্বপ্ন দেখিতেছি—বৈদেশিক স্বর্ণযুগের এবং রুগ্না বান্ধবীর!

জোড়াদীঘির চৌধুরী-পরিবার

যাক্, ক্ষুদ্র জোড়াদীঘি ছাড়িয়া যে বৃহৎ পটভূমিতে এই ক্ষুদ্র গ্রাম স্থাপিত, তার দিকে একবার তাকাই। কলিকাতা তখন ভারতবর্ষের রাজধানী, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সহর। বাংলা দেশের আর দুটি উল্লেখযোগ্য সহর, ঢাকা এবং মুর্শিদাবাদ। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে পরাজিত ব্রিটিশ-সেনাপতি কর্ণওয়ালিশ ইংলণ্ডের রাজনীতির দাবাখেলার পাকচক্রে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল। জমিদারের সহিত রাজস্ব সম্বন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল। জমিদারদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত হইল, প্রতি জেলায় জজ, কালেক্টার প্রভৃতি পৃথক্ ভাবে নিযুক্ত হইল।

তারপর বড়লাট ওয়েলেস্‌লির রাজনীতির বেড়াজালে দেশীয় সামন্ত রাজ্যের রুই-কাৎলা একে একে ধরা পড়িতে লাগিল। কোম্পানীর রাজ্য, সাম্রাজ্য হইয়া উঠিল। ওয়েলেস্‌লির নাম পড়িল কোম্পানীর রাজত্বের আকবর।

ওয়েলেস্‌লি ও লর্ড মিণ্টোর মাঝখানে আর একবার আমরা বৃদ্ধ কর্ণওয়ালিশের দেখা পাই, বৃহৎ বজরায় গঙ্গার মধ্যে। গাজিপুর অতিক্রম করিয়া বজরা আর অগ্রসর হইল না, কিন্তু বৃদ্ধ আরোহী অনেক দূর চলিয়া গেল।

লর্ড মিণ্টোর ভারতীয় রাজনীতি ইউরোপের দিকে তাকাইয়া চলিত। ইউরোপে তখন একজন মাত্র ব্যক্তি ছিল, আর সকলে নিঃশ্বাস টানিয়া বাঁচিয়া থাকিত মাত্র। তার বিখ্যাত ধূসর পিরাণ ও তিন-কোণা টুপি, পৃষ্ঠবদ্ধ বাহুদ্বয় ও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি, পৃথিবীব্যাপী লিলিপুটদের মধ্যে অস্বস্তি সৃষ্টি করিয়াছিল। কলিকাতা আলিপুরে, বেলভেডিয়ারের টানাপাখার তলে বসিয়া মিণ্টোর কল্পনায় বারংবার সেই মূর্ত্তি জাগিত তার চোখে আর ঘুম ছিল না।

ভারতবর্ষে, পাঞ্জাবে, ভীতির আর এক কারণ ছিল। শতদ্রুতীরে একচক্ষু এক যুবক।

জোড়াদীঘির চৌধুরী-পরিবার

মিণ্টোর পরে হেষ্টিংস। ওয়েলেস্লির অসমাপ্ত কাজ পুনরায় আরম্ভ হইল। শিখ ও মহারাষ্ট্র-শক্তি নগণ্যতা লাভ করিল, ভারতবর্ষে ইংরাজ সর্ব্বপ্রধান শক্তিরূপে দেখা গেল। এই সময়ে ১৮২০ এবং ১৮২৩-এ মেদিনীপুর ও যশোহরে দুইটি শিশুর জন্ম হইল, একজনের নাম ঈশ্বরচন্দ্র, অপর জন মধুসূদন।

রাজনীতির বিস্তৃত ক্ষেত্র ছাড়িয়া আর একবার জোড়াদীঘির কাছে ফিরিয়া আসি। নাটোর তখন রাজসাহী জেলার সদর। ১৮২২-এ উহা উঠিয়া রাজসাহী সহরে যায়। এই সময় কিছুদিন পরে আডাম সাহেব যে সরকারী রিপোর্ট দাখিল করেন, তাহাতে উল্লিখিত দেখি—নাটোরে তখন ১৪টি স্কুল, ১০-টী বাংলা, ৪-টী ফার্সি। এদের অধিকাংশ ব্যয় রাণী ভবানীর দত্ত বৃত্তি হইতে নির্ব্বাহিত হইত। এ ছাড়া জেলাতে বহু চতুষ্পাঠী ও চিকিৎসা-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। দেশে তখন শান্তি ছিল না, দস্যু ও দারোগার উপদ্রব পরস্পরের প্রতিযোগিতা করিত; কে জয়ী হইত জানি না, বোধ করি, রাজশক্তি হাতে ছিল বলিয়া দারোগারই জয় হইত।

এই সময়ে রাজা-জমিদারদের বিচারশক্তি, শাসনক্ষমতা অপহৃত হইল, প্রজার পক্ষে গভর্ণমেণ্ট ভিন্ন অন্য গতি রহিল না (অবশ্য এর পরেও অনেক জমিদার শাসন ও বিচার-ক্ষমতা ব্যবহার করিত, এখনও করে। আইনের মর্য্যাদা কোথায় না রক্ষিত হয়)!

পাঠক, আমাদের কাহিনীর পটভূমি উপরি-উক্ত কাল। উক্ত কালে যা সম্ভব, তার বেশী আমার গল্পে আশা করিও না; বালিগঞ্জবিলাসীদের কথা ইহাতে নাই, কারণ সেখানে তখন জলা আর জঙ্গল, সাপ আর শৃগাল; বাঘ বোধ করি ছিল না, কারণ বাঘের বাসায় নপুংসকের বাস সম্ভব হয় না।

৬

সেই চোর-ধরার ব্যাপারের পর হইতে স্বরূপ নূতন করিয়া দর্পনারায়ণকে দেখিতে পাইল। দর্পনারায়ণকে সে জন্ম হইতে জানে, এই পিতৃমাতৃহীন শিশুকে সে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, কাজেই তার প্রতি বৃদ্ধের স্নেহ অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। কিন্তু সেদিনের ব্যাপারে এই স্নেহের সহিত শ্রদ্ধা আসিয়া মিশিল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জ্যোতির্মণ্ডল ক্ষুদ্র বালককে এমন একটা আলৌকিকতা দান করিল যে, স্বরূপ নিজের চোখে তার নিকট নগণ্য হইয়া গেল। বুদ্ধি এমনই সম্পদ। স্বরূপ সকলের কাছে সগর্ব্বে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, আরে, দাদাবাবুর বুদ্ধি দেখেছ? বুড়ো বুড়ো লোকেরা ধরতে পারল না, দাদাবাবু কি না বলে ফেললে, ছেলেটা বোবা। দাদাবাবুর বয়স আর কতই, এইবার বারো-য় পড়েছে।

সত্য কথা বলিতে কি সে তেরো-য় পড়িয়াছে, কিন্তু বুদ্ধির মাহাত্ম্যকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিবার জন্য বয়সটা কিছু হাতে রাখিয়া বলিত।

দুপুরবেলা স্বরূপ সর্দ্দার উদয়নারায়ণকে কাহিনীটা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া শুনাইয়া বালকের বুদ্ধি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিল। বৃদ্ধ নীরবে শুনিলেন, ম্লানভাবে একবার হাসিলেন, যেন মরিচা-ধরা তলোয়ারের একান্তে ইস্পাতটা একবার ঝকমক করিয়া উঠিল, এ হাসি বছরের মধ্যে তার মুখে দু'চারবার মাত্র দেখা গিয়াছে। অট্টহাসি তার মুখে মাঝে মাঝে শোনা যায়, কিন্তু তাহা ত' হাসি নয়, অশ্রুহীন ক্রন্দনের বজ্রধ্বনি, যাহাতে বেদনার বিদ্যুত্তাপে হৃদয়ের ঘনায়মান মেঘ একমুহূর্ত্তে অশ্রুর অবস্থাকে লঙ্ঘন করিয়া বাষ্প হইয়া উবিয়া যায়। বৃদ্ধ বলিলেন, "বুদ্ধির দীপ্তি সে আর একজনের কাছ থেকে পেয়েছে।" সে একজন যে কে স্বরূপ তাহা স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না, কিন্তু বুঝিল। পুত্রের মৃত্যুর পর হইতে উদয়নারায়ণ কোন দিন তার নাম

উচ্চারণ করেন নাই, মাঝে মাঝে পরোক্ষভাবে তার উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র।

স্বরূপ বিশেষ ভাবে দর্পনারায়ণের ভার লইল। সকাল বেলায় দেখা যাইত, কাছারীর প্রাঙ্গণের একপাশে বৃদ্ধ লাঠি খেলা শিখাইতেছে দর্পনারায়ণ আর তার দুই জ্ঞাতি ভাই বিশ্বনাথ ও রঘুনাথকে। এত ভোরে তাহাদের লাঠিখেলা আরম্ভ হইত যে, বাহির-বাড়ীর লোকেরা লাঠির ঠকাঠক শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিত। ইহাতে স্বরূপের যেমন আগ্রহ, দর্পনারায়ণের তেমনি উৎসাহ। তখনকার কালে জমিদারের ছেলের পক্ষে বাঁশের কলমের অপেক্ষা বাঁশের লাঠি অধিক দরকার হইত। স্বরূপের কৃপায় তারা লাঠি, শড়কি, বন্দুক' তলোয়ারে পারদর্শী হইয়া উঠিল। বিকাল বেলায় জোড়াদীঘির বিলের প্রকাণ্ড মাঠে তারা ঘোড়ায় চাপিতে শিখিত। ঘোড়ায় চাপিতে তিন ভাই শিখিল, কিন্তু ঘোড়া মাত্র একটী, এতেই যাহা কিছু অসুবিধা। ঘোড়াটী আবার দর্পনারায়ণের খাস সম্পত্তি। সে ঘোড়ায় চাপিতে এতই ভালবাসিত যে, প্রায় সমস্তদিন ঘোড়ার পিঠেই থাকিত।

বৈকালিক অশ্বারোহণ-পর্ব্ব শেষ করিয়া সন্ধ্যাবেলা তিন জনে স্বরূপ সর্দ্দারের ঘরে গিয়া বসিত। দেউড়ির উপরে দোতলায় তার ছোট ঘর; স্বরূপ হাত-মুখ ধুইয়া খড়ম পায়ে দিয়া ঘরে আসিয়া বসিত। রেড়ির তেলের প্রদীপটী জ্বালাইয়া দিত; মন্দিরে সন্ধ্যারতির কাঁসি ঘণ্টা বাজিয়া উঠিত, চার জনে নিস্তব্ধ বসিয়া থাকিত। আরতির শব্দ থামিয়া গেলে স্বরূপ গল্প আরম্ভ করিত।

পলাশীর যুদ্ধের কাহিনী তাদের সবচেয়ে প্রিয় ছিল। এই একই গল্প তাহারা বহুদিন শুনিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই যেন তৃপ্তি হয় না। বালকেরা একই গল্প বহুবার শুনিতে ভালবাসে, কাহিনীটাকে সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে তাদের সময় লাগে।

পলাশীর বিরাট প্রহসনে স্বরূপ সর্দার একজন নগণ্য অভিনেতা ছিল, সে নিজের-জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে পলাশীর বর্ণনা করিত। (পাঠক, এখানে অবান্তর একটা কথা বলিয়া রাখি! পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজের পক্ষে নাকি মাত্র সতেরো জন নিহত হইয়াছিল। বাংলাদেশের পক্ষে সপ্তদশ সংখ্যাটা বড় শুভ নয়। পলাশীর কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে সতেরো জন তুরস্ক নাকি নবদ্বীপ জয় করিয়াছিল। ইতিহাসের ধারা আবর্ত্তিত হয়, এ প্রবাদটা বাংলা দেশের ভাগ্যে বোধ করি সত্য!)

কিন্তু, একটা ব্যাপার দর্পনারায়ণ কিছুতেই বুঝিতে পারিত না। তিন হাজার লোকে কি করিয়া পঞ্চাশ, ষাট হাজার লোককে পরাজিত করিতে পারে! দর্পনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিত—আচ্ছা স্বরূপ দাদা, তিন হাজারে কেমন করে পঞ্চাশ হাজার লোককে হারিয়ে দেয়?

স্বরূপ বলিত—যুদ্ধ না করলে আর কি হবে দাদা!

—যুদ্ধ কেন করল না?

ইহার উত্তর স্বরূপেরও ভাল করিয়া জানা ছিল না। বহু কাল আগে পলাশীর মাঠে দাঁড়াইয়াও সে ইহার রহস্য বুঝিতে পারে নাই। মোহন-লালের অশ্বারোহীর মধ্যে সে যখন একতম হইয়া আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিয়াছে, তখন যে কেন ফিরিয়া আসিল তাহাও সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, আজও পারে না।

দর্পনারায়ণ আবার জিজ্ঞাসা করিত—আচ্ছা তুমি নবাবকে দেখেছ?

—দেখেছি বই কি!

—কেমন দেখতে?

—এই আমাদের মত মানুষ, তবে—

তবে? দর্পনারায়ণ জানে পোষাক ভাল, ঘোড়া ভাল। নবাব যে মানুষ তাতে দর্পনারায়ণের সন্দেহ ছিল না, কিন্তু তবু তাহাদের মতই একজন মানুষ শুনিয়া কেমন যেন নৈরাশ্যের উদয় হয়।

স্বরূপ আবার বলিত—দাদাবাবু, নবাব আমাদের মত মানুষ যে শুধু তাই নয়, বয়সও খুব কম। ধর ও বাড়ীর মহেন্দ্র গোমস্তার সমান।

দর্পনারায়ণের মনে এই আর একটা খটকা। সে ভাবিত, নবাবী তবে কি তেমন একটা জটিল ব্যাপার নয়, না বয়সের সঙ্গে জটিলতার কোন সম্বন্ধ নাই।

—আচ্ছা, মোহনলাল খাঁ ত' আক্রমণ করতে গিয়েছিল, সে কেন ফিরে এল?

—কি করবে বল, নবাবের হুকুম।

—কিন্তু তুমি কেন ফিরলে?

—না ফিরে কি পারি! সেনাপতির হুকুম।

—আচ্ছা' মোহনলাল খাঁ না ফিরলে সেদিন ফিরিঙ্গিরা—

স্বরূপের উৎসাহ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত—ঠিক বলেছ দাদাবাবু, আমরা তাদের গঙ্গা পার করে দিয়ে ফিরতাম।

—অনেক লোক নিশ্চয় গঙ্গায় ডুবে মরত?

—মরত বই কি। বেটাদের গঙ্গাস্নান করিয়ে তবে ছাড়তাম।

দর্পনারায়ণ ভাবিত সে মোহনলাল হইলে কখনই ফিরিত না—নবাবের হুকুমেও নয়, ফিরিঙ্গিদের হটাইয়া দিয়া তবে নবাবের কাছে যাইত।

দর্পনারায়ণ হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিত—আচ্ছা দাদা, ফিরিঙ্গিরাও ত আমাদের মত মানুষ?

—মানুষ বই কি? তবে রংটা একটু ফর্সা, আর কাটা পোষাক পরে।

দর্পনারায়ণ বুঝিয়া উঠিত না, তাদের বীরত্ব এই দুটা বৈশিষ্ট্যের কোনটাকে অবলম্বন করিয়া—রংএর মধ্যে যে বীরত্ব থাকিতে পারে, এ বিশ্বাস তার ছিল না। তবে মনে হইত পোষাকের মধ্যে হয় তো কিছু থাকিলেও থাকিতে পারে।

সে বলিল—এবার যখন নবাব লড়াই করবে, সে যেন সৈন্যদের কাটা পোষাক পরিয়ে নেয়।

স্বরূপ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিত—আর তো লড়াই হবে না দাদা!

—কেন?

—নবাব ত' নাই?

—তবে কে আছে?

—কোম্পানী, এটা যে এখন কোম্পানীর মুল্লুক।

—আচ্ছা, কোম্পানীকে তুমি দেখেছ?

স্বরূপ নিজেই জানিত না, কোম্পানী একজন সাহেবের নাম, না অন্য কিছু। দর্পনারায়ণ শুনিয়াছিল, কোম্পানী ব্যবসা এবং রাজত্ব দুই-ই করে। সব শুদ্ধ মিলিয়া কোম্পানী সম্বন্ধে অস্পষ্ট একটা ধারণা জন্মিয়াছিল। কোম্পানী একজন সাহেব, সাদা তার রং, লাল রঙের কাটা পোষাক, তার গায়ে। এক হাতে তার তলোয়ার, কারণ সে রাজত্ব করে; অন্য হাতে তার দাড়িপাল্লা, কারণ সে ব্যবসাও করিয়া থাকে। একটা বড় ঘোড়ায় চাপিয়া উক্ত কোম্পানী-সাহেব গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়। কবে যে হঠাৎ সে জোড়াদীঘিতে আসিয়া পড়ে, এই সন্দেহ তার ছিল। কোম্পানীর আগমনকে সে যে ভয় করিত, এমন কথা বলি না, কারণ সে আমাদের মত মানুষ বটে, তবে পোষাকের মধ্যে কি থাকিতে পারে ঠিক করিয়া বলা যায় না। যাই হোক, কোম্পানী আসিলে মন্দ হয় না, একটা নূতন জিনিষ দেখা যায়।

দর্পনারায়ণ বলিত, স্বরূপ দাদা, তুমি আমাকে একবার পলাশীর মাঠে নিয়ে যাবে?

স্বরূপ বলিত, বেশ তো; অনেক দিন গঙ্গাস্নান করিনি, একবার করে আসা যাবে।

তখন সকলে মিলিয়া পলাশী-যাত্রার উৎসাহকর আলোচনায় সাগ্রহে

যোগ দিত। আলোচনার শেষ হইত না, কিন্তু রাত্রি বাড়িয়া যাইত, তিন বালকে অনেক ডাকাডাকির পর বাড়ীর মধ্যে ঘুমাইতে যাত্রা করিত।

৭

দর্পনারায়ণদের জীবন নিরবিচ্ছিন্ন সুখের ছিল না, তাদের খানিকটা করিয়া পড়িবার ব্যবস্থা ছিল।

চৌধুরীদের বাহির বাড়ীতে আটচালায় সকাল বেলা পাঠশালা বসিত। গ্রামের শ'খানেক ছেলে সেখানে পড়িত। এদের মধ্যে সাত হইতে সতেরো—সব বয়সের ছেলেই ছিল; অতি ভোরে সকলে চোখ মুছিতে মুছিতে পাঠশালায় আসিয়া জুটিত; প্রাতঃকালীন উদ্বোধনের জন্য গুরুমহাশয় একটা নিয়মিত ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কতকগুলি ছেলের উপরে একজন করিয়া সর্দ্দার পড়ুয়া ছিল; নির্ব্বিচারে তারা অধীনস্থ ছাত্রগুলিকে এক ঘা করিয়া বেত মারিয়া যাইত। ইহার ব্যতিক্রম বা আবশ্যকতা ছিল না; জ্ঞানের পথ যে কণ্টকাকীর্ণ এ বোধ হয় তারই প্রতীক। ছেলেরা মাদুরে বসিয়া কলাপাতায় দাগা বুলাইতে সুরু করিত। কেবল দর্পনারায়ণদের তিন ভাইয়ের জন্য স্বতন্ত্র একটু ব্যবস্থা ছিল, পৃথক্ একখানি মাদুর ও কলাপাতার বদলে তুলোট কাগজ।

হঠাৎ ছাত্রমহলে চাঞ্চল্য পড়িয়া যাইত এবং সকলে তারস্বরে শতকিয়া কড়াকিয়া আবৃত্তি করিয়া উঠিত। ইহাতে বোধ করি বৈকুণ্ঠে সরস্বতীর প্রাতঃকালীন নিদ্রাভঙ্গের কাজ হইত। ভোরের ঘুম ভাঙাইলে দেবতা ও মানুষ দুইয়েরই মনোভাব প্রায় এক রকম হয়; এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্যই বোধ করি পাঠশালায় প্রবেশের পূর্ব্বে ও প্রস্থানের পরে ছাত্রদের জ্ঞানের কোন তারতম্য হইত না; নতুবা তাদের তো চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না।

শতকিয়া-অভিনন্দিত পণ্ডিত নর্ত্তনশীল একখানা বেত হাতে করিয়া ছাত্রদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইতেন। তিনি অবলীলাক্রমে একদিক হইতে সকলের মাথায় এক ঘা করিয়া বসাইয়া দিতেন, ইহার নাম বোধ হয় নিরপেক্ষ ছাত্রবাৎসল্য। কোন নবাগত ছাত্র কাঁদিয়া উঠিলে পণ্ডিত মৃদু হাসিয়া বলিতেন—"হুঁ হুঁ বাবা! একেবারে চোখের জল না ফেলে পণ্ডিত হবে? আমি কি কম কষ্ট করে বিদ্যালঙ্কার হয়েছি। (বলা বাহুল্য, এই অলঙ্কারটুকু পণ্ডিত মশায়ের স্বোপার্জ্জিত)। কি বলিস রে মধু?"

মধুর মাথার উপরে তখন বেতখানা আসন্ন কাজেই তার আপত্তি করিবার সাহস ও অবকাশ ছিল না, সে কেবল একটা অব্যক্ত সম্মতি প্রকাশ করিত। "তবেই দেখ, যত বেশী ঘা খাবি তত পণ্ডিত," এই বলিয়া মধুর মস্তকে ঘা কয়েক পড়িত। "কেমন তাই না রে!" মধু মুখের স্বাভাবিক বিকৃতিকে যতদূর সম্ভব আনন্দব্যঞ্জক করিয়া বলিত, 'আজ্ঞে তা বই কি।' কিন্তু, উদ্‌গত চোখের কয়েক ফোঁটা জলকে সে বাগ মানাইতে পারিত না, তাহার গাল বহিয়া পড়িত। পণ্ডিত খুসী হইয়া বলিতেন, "এই তো চাই, মনে আনন্দ, দেহে কষ্ট, এ না হলে বিদ্যা হয়? তোর হবে রে মধু, তোর হবে। মধু ভবিষ্যতের ভরসায় উল্লসিত হইয়া উঠিত, কিন্তু মাথাটা সন্ত্রস্ত হইয়াই থাকিত।

সকলকে মারিতে মারিতে দর্পনারায়ণদের নিকট আসিয়া হঠাৎ তিনি থামিয়া যাইতেন। দরকার হইলে তাদের মারিবার হুকুম তাঁর ছিল; কিন্তু পণ্ডিতের বুদ্ধিও ছিল। জমিদারের উত্তরাধিকারীকে মারিয়া নিজের উত্তরকালকে তিনি সন্দেহযুক্ত করিতে চাহিতেন না।

পণ্ডিতের নাম শরচ্চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার। ছাত্রদের মাথায় জ্ঞানের গজাল ঠোকা শেষ হইলে তিনি সকলকে বেতখানি দিয়া বাতাসে অদৃশ্য পেরেক ঠুকিয়া বেড়াইতেন। তিনি নিজেও একখানি মানবরূপী বেত। এই যুগ্ম

শ্বেতখণ্ডকে সরস্বতীর কমলবনে এক রাশি ভেকের মধ্যে উদ্যত সর্পের জিহ্বার মত মনে হইত। পণ্ডিতের মাথায় নিরঙ্কুশ, টাক, কেবল মাথার তিন দিকে বেষ্টন করিয়া সূক্ষ্ম একটি চুলের রেখা। পণ্ডিতের সমস্ত মুখমণ্ডলে সূর্য্য-ঘড়ির শঙ্কুযন্ত্রের মত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বিষম একটি নাসিকা। পাঠশালার অধিকাংশ ছাত্র রাত্রে এই নাকের স্বপ্ন দেখিয়া ঘুম ভাঙিয়া কাঁদিয়া উঠিত।

পণ্ডিতের জ্ঞানের পরিমাণ আমরা জানি না, কেহই জানে না; জ্ঞানের কি শেষ আছে, এবং সেই কারণেই আরম্ভও নাই; কিন্তু তাঁর জ্ঞানের পরিমাপের সুযোগ কেহ পায় নাই। পাঠ কিছুদূর অগ্রসর হইলে তিনি পাঠশালার মূর্খতম ছাত্রকে প্রথম দিকের একটা পড়া জিজ্ঞাসা করিতেন, বলা বাহুল্য, সে পারিত না। পণ্ডিত মনঃকষ্টে বলিয়া উঠিতেন, "ও বাবা, গোড়াতেই ভুলে বসেছে, এর উপরে ইমারত তুলব কেমন করে'—পড় পড়, আবার গোড়ার দিকে পড়।"

আবার সমস্ত ছাত্র ঘুরিয়া পাঠ লইত, জ্ঞানের ইমারত আর গাঁথা হইত না। এই রকম করিয়া কয়েক বৎসর পুরাতন পাঠের পাকে আবর্ত্তিত হইয়া পনেরো-যোলো-য় পড়িয়া ছাত্রেরা পাঠশালা ত্যাগ করিত। জ্ঞানের ভিত্তি অবশ্য বনেদী রকমে পাকা হইত, কিন্তু সুযোগ অভাবে কারও আর ইমারত উঠিত না। আটচালার চাল ছাইবার জন্য বৎসরে পণ্ডিত কিছু টাকা পাইতেন। তিনি চালে খড় দিবার সময় ঘরামিদিগকে উপদেশ দিতেন যে, এমন করিয়া ঘর ছাইতে হইবে, যাতে সূর্য্য দেখা যায়, অথচ বৃষ্টির জল না পড়ে।

ছেলেরা বসিয়া কড়াকিয়া পড়িত. দাগা বুলাইত, আর দর্পনারায়ণেরা তিন জনে একদিকে বসিয়া তুলোটে নানা রকম ছবি আঁকিত। দর্পনারায়ণ আঁকিত ঘোড়া, তার উপরে একজন মানুষ, হাতে তার তলোয়ার, নীচে লিখিয়া দিত, 'মোহনলাল'। বিশ্বনাথ মোহনলালের

মাথায় একটি পাগড়ী জুড়িয়া দিত, ইহাতে কাহারও আপত্তি ছিল না, কিন্তু রঘুনাথ যখন প্রস্তাব করিত, 'মোহনলালের গোঁফ জুড়িয়া দাও', তখন দর্পনারায়ণ পণ্ডিতের অস্তিত্ব ভুলিয়া সশব্দে আপত্তি প্রকাশ করিত।

প্রতিদিনই তারা একই ছবি আঁকে, প্রতিদিনই তারা এই গোঁফের সমস্যায় আসিয়া ঠেকিয়া যায়। তাহাদের গোলমালে পণ্ডিত নিষ্ফল গর্জ্জন করিয়া ওঠেন। অবশেষে অনেক দিনের আলোচনায় স্থির হইল, মোহনলালের গোঁফ ছিল না, কিন্তু দাড়ি ছিল। তখন সেই চিত্রে দাড়ি যুক্ত হইল, পাছে মর্ম্ম অবধারণে কাহারও ভুল হয়, তাই নিম্নে লিখিত হইল—"সেনাপতি মোহনলাল (মহারাজ হইলেই ইতিহাস সম্মত হইত, কিন্তু সেনাপতি না হইলে আর বৈশিষ্ট্য কোথায়?) অশ্বে (আগে লিখিত ছিল 'ঘোড়া', ঘোড়াতে যে কেহ চড়িতে পারে, তারাও তো চড়ে; মোহনলালকে অশ্বেই মানায়); মুখে দাড়ি (দাড়ি অবশ্য মুখেই থাকে, দর্পনারায়ণ বলে তাঁহার গোঁফ ছিল না। কিন্তু, অভিমন্যুবধ যাত্রায় ভীমের কত বড় গোঁফ! বাপ্‌রে! মোহনলাল বীর হইলে কেন গোঁফ থাকিবে না? দর্পনারায়ণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য গোঁফের বদলে দাড়ি। আমি এখনও বলি মোহনলালের গোঁফ ছিল); হাতে তলোয়ার, যুদ্ধ জয় করিতেছেন।" পলাশীতে অবশ্য তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই তুলোট কাগজে তিনি যুদ্ধ জয় না করিলে আর তাঁকে আঁকিয়া লাভ কি!) অতঃপর ছবিখানি দর্পনারায়ণের শয়ন ঘরের দেয়ালে আঠা দিয়া টাঙ্গাইয়া রাখা হইল।

দশটার সময় পাঠশালার ছুটি হইত। সারাদিন ছাত্রদের ছুটি। দর্পনারায়ণদের তিন জনের দুপুর বেলা সংস্কৃত পড়িতে হইত।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরে টোলের একজন ছাত্র সংস্কৃত পড়াইতে আসিত। বৈঠকখানার এক কুঠুরীতে দেবভাষার আলোচনার স্থান। ছাত্রটীর নাম বাণীবিজয় শর্ম্মা বলা বাহুল্য, বাণীর সহিত তার সম্বন্ধ পিতৃদত্ত

নামের অধিক অগ্রসর হয় নাই। বাণীবিজয়ের মত এমন চতুষ্কোণ মুখমণ্ডল মানুষের মধ্যে কম দৃষ্ট হয়। হঠাৎ তাকে দেখিলে মনে হয়, বিধাতা একটা চৌ-কোণা বাক্সের ছাঁচে তার মুখখানা গড়িয়াছেন। চৌ-কোণা মুখ ও সুবৃহৎ মস্তকে সুদীর্ঘ শিখা লইয়া বাণীবিজয় দুপুর বেলা আসিয়া উপস্থিত হইত। সে আসিয়াই একটা তাকিয়া টানিয়া লইয়া ফরাসের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িত। তারপরে অত্যন্ত ধীর ভাবে আরম্ভ করিত—"বুঝলে দর্পনারায়ণ, বিদ্যা-চর্চ্চা অন্য কেউ শিখিয়ে দিতে পারে না, সমস্তই নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করে। মনে আছে তো সেই বোপদেবের কাহিনী?" 'কাহিনীর পরিবর্ত্তে 'গল্প' বলিলেই চলিত, কিন্তু ঘটনাকে গুরুত্ব দিবার জন্য বাণীবিজয় বলিত 'কাহিনী'। তার এই রকম আরও কয়েকটা গুরুতর শব্দ ছিল, খুড়াকে বলিত পিতৃব্য, লেখাপড়াকে বলিত বিদ্যাচর্চ্চা, নিজের পণ্ডিতকে বলিত শাস্ত্রপিতা, আর স্ত্রীকে বলিত সহধর্ম্মিনী। তার ছাত্রেরা বোপদেবের কাহিনী শুনিয়া অনেকদিন উহার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা আর কিছুই নয়, পণ্ডিতের আসন্ন নিদ্রার সূচনা মাত্র।

বাণীবিজয় বলিত, "দাও তো বাপু, তাকিয়াটা একটু এগিয়ে। আমি একটু দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করে' নি।" তাকিয়া আশ্রয় করিয়া পণ্ডিত ঘুমাইয়া পড়িত এবং ছাত্রেরা শুনিত, কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সুগভীর নাসিকা-ধ্বনি তালে তালে 'বামে পানি' হাঁকিতে হাঁকিতে স্বপ্ন-সমুদ্র পরিমাপ করিয়া চলিয়াছে। একদিন রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'আচ্ছা পণ্ডিতমশায়, ঘুমিয়ে আপনি কি দর্শন করেন?"

পণ্ডিত হাসিয়া বলিয়াছিল দর্শন মানে দেখা নয়, দর্শন শাস্ত্র। হিন্দুদের ন্যায়, সাংখ্য প্রভৃতি ষড়্‌দর্শন আছে, বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে তোমরা তা চর্চ্চা করবে; কিন্তু, এ ছাড়া আর একটা দর্শনের কথা আমাদের

ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা জানতেন, তার নাম স্বপ্ন-দর্শন। দাও তো বাপু, একটু জলপাত্রটা এগিয়ে। এই বলিয়া সে জলপাত্র মুখে স্পর্শ না করিয়া অনেকটা জল পান করিয়া ফেলিল। খানিকটা জল বুক ও পেট বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল, উত্তরীয়-প্রান্ত দিয়া মুছিয়া লইয়া বাণীবিজয় বলিল—সবাই তো ত্রিকালজ্ঞ ঋষি ছিলেন না, এক সঙ্গে জন্ম, মৃত্যু ও নিদ্রা এই তিন কালকে কয়জনে জানতে পারে!

বিশ্বনাথ বলিত, আচ্ছা পণ্ডিত মশায়, কুম্ভকর্ণ, তা হলে ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন, তিনি তো খুব ঘুমোতেন। বিশ্বনাথ ইহার আগে পর্য্যন্ত কুম্ভকর্ণকে তুমি বলিত, কিন্তু 'ত্রিকালজ্ঞ' শব্দের ব্যাখ্যা শুনিয়া তাকে সসম্মানে স্মরণ করিল। বিশ্বনাথের কথা শুনিয়া বাণীবিজয় ঝিঙার বীচির মত দন্তপংক্তি বিকশিত করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসির শব্দে অ হইতে ঔ পর্য্যন্ত সবগুলি স্বরবর্ণ আয়ত্ত ছিল। একবার হাসিয়া উঠিলে হঃ হঃ হাঃ হাঃ হইতে আরম্ভ করিয়া হোঃ হোঃ হৌঃ হৌঃ পর্য্যন্ত না পৌছিয়া থামিত না। কেবল ঋ ৯ ৯৯ এর বেলায় কি হইত বলিতে পারি না। বাণীবিজয় হাসিতে স্বরবর্ণ আবৃত্তি শেষ করিয়া বলিল, কুম্ভকর্ণ তো রাক্ষস ছিল, সে ঘুমুত। আমি কি ঘুমুই? আমি স্বপ্ন-দর্শন অধ্যয়ন করি।

আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি সেদিনও বাণীবিজয় তাকিয়া আশ্রয় করিয়া স্বপ্ন-দর্শন অধ্যয়ন করিতে লাগিল। তার দীর্ঘ উন্মুক্ত শিখা মস্তকে ঝুলিয়া পড়িয়া ফরাসের চাদর স্পর্শ করিয়া ঝুলিতে লাগিল। পণ্ডিত নিঃশঙ্ক-চিত্তে ঘুমাইয়া পড়িল। হায়! পরবর্ত্তী যুগের শিখাধারী হতভাগ্য পণ্ডিতের দল, তোমরা নিশ্চয় ঐ নিঃশঙ্কনিদ্র বাণীবিজয়কে ঈর্ষ্যা করিতেছ। তোমাদের অদৃষ্টে শিখা উন্মুক্ত করিয়া এমন নিরঙ্কুশ নিদ্রা নাই; ঐ ক্ষুদ্র কেশগুচ্ছকে রক্ষা করিতেই তোমাদের অর্দ্ধেক শক্তির অপব্যয় হয়। তবু যদি রক্ষা হইত। কখনো চাপকানের পকেটে,

কখনো উত্তরীয়প্রান্তে, কখনো আরও কত অসম্ভব স্থানে উহার দেখা পাওয়া যায়। যাহা অনিবার্য্য তাহার জন্য দুঃখ করিয়া লাভ কি। শিখার যুগ চলিয়া গিয়াছে!

বাণীবিজয় ঘুমাইয়া পড়িলে (সে জাগিয়া থাকিলে কখনই ইহা স্বীকার করিত না) দর্পনারায়ণ অপর দুইজনকে কাছে ডাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল—আজ দেখবি?

বিশ্বনাথ তাচ্ছিল্য সহকারে—দূর আমি বিশ্বাস করি না।

—আর যদি দেখাতে পারি?

বিশ্বনাথ জেদের সহিত বলিল—আর যদি না দেখাতে পারিস্!

রঘুনাথ তাহার কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল—তোর ঘোড়াটা দিবি। দর্পনারায়ণ একটু ভাবিয়া বলিল—আচ্ছা।

উভয়ে বলিল—কখন?

—আজ সন্ধ্যাবেলা।

—কোথায়?

—বাস্তুর বাগানে।

বাস্তুর বাগানের নাম শুনিয়া উভয়ের আগ্রহে ভাটা পড়িয়া আসিল।

রঘুনাথ বলিল—সন্ধ্যাবেলা বাস্তুর বাগানে যেতে নেই।

দর্পনারায়ণ বলিল' বাস্তুর বাগানে যাব কেন? পূবের দালানে উঠে ছাদের উপর থেকে দেখাব।—বাস্তুর বাগানে যাইতে হইবে না শুনিয়া বিশ্বনাথের সাহস ফিরিয়া আসিল। সে বলিল—যেতেই বা আপত্তি কি?

বিশ্বনাথ বড় খারাপ জায়গায় পা ফেলিয়াছে বুঝিতে পারিল, সে বলিল—তা বই কি!

রঘুনাথ তাকে বাঁচাইয়া দিল—পূবের দালানে উঠে দেখা গেলে আর বাস্তুর বাগানে গিয়ে কাজ নাই; বাস্তু রাগ করতে পারে।

বিশ্বনাথ আর একটু সাহস করিয়া বলিল—কিন্তু দেখা যাবে তো?

দর্পনারায়ণ বলিল—নিশ্চয়, কতবার দেখেছি।

—কিন্তু না পারলে, ঘোড়াটা মনে আছে তো?

দর্পনারায়ণ বলিল—নিশ্চয়।

যতক্ষণ ইহাদের আলাপ চলিতেছিল, বাণীবিজয়ের স্বপ্নদর্শনের বিরাম ছিল না। নাসিকাধ্বনির তালে তালে সে স্বপ্ন-দর্শন আবৃত্তি করিতেছিল।

হঠাৎ পণ্ডিত জাগিয়া উঠিল। বালকদের কথা বন্ধ হইল। বাণী-বিজয় বলিল—আঃ কি গভীর শাস্ত্র! দাও তো বাপু জলপাত্রটা এগিয়ে। শীতল জল পান করিয়া নিদ্রাতৃপ্ত পণ্ডিত বলিল—অনেকক্ষণ বিদ্যাচর্চ্চা করেছ, যাও আজকার মত ছুটী। বালক তিন জন দ্রুত পলায়ন করিল। বাণীবিজয় আর একবার শীতল জল পান করিয়া উত্তরীয়খানা লইয়া টোলের অভিমুখে যাত্রা করিল।

৮

চৌধুরী বাড়ীর নিভৃত অংশে একটা পোড়ো-বাগান আছে। নেহাৎ বাড়ীর মধ্যে বলিয়া তাকে বাগান বলিলাম, নতুবা বন বলিলেই মানাইত। বিঘা দুই জমি আম, জাম, নারিকেল, ফলসা, কাঁঠাল, নিম ও শ্যাওড়া গাছে পূর্ণ। এই বনস্পতি শ্রেণীর তলে এরণ্ড, শটী, ভাটি, ঝিণ্টী, কাটা খুড়া আগাছার জঙ্গল; সেই আগাছার মধ্যে যত আবর্জ্জনা, হাড়ি কলসী, তোরঙ্গ, ঝামা-ইট, একধারে একটা অর্দ্ধনিঃশেষিত পোড়া-ইটের পাঁজা। সেখানে একটা বৃহৎ পাকুড় গাছের গুড়ি বেষ্টন করিয়া সুবৃহৎ এক অজগর সাপ।—চৌধুরী-বাড়ীর বাস্তু-সাপ তাই এই জায়গাটিকে সকলে বাস্তুর বাগান বলিয়া থাকে।

এ সাপ এখানে কেমন করিয়া আসিল কেহ জানে না। শোনা যায়, চৌধুরীদের আদিপুরুষ সাপটিকে দেখিয়া শুভ-চিহ্ন বলিয়া মনে করিয়া-ছিলেন এবং এখানে ভদ্রাসন প্রস্তুত করেন। সে অনেক দিনের কথা,

জোড়াদীঘির চৌধুরী-পরিবার

অনেক শত বৎসরের। তখন চৌধুরীদের সামান্য কয়েক খানি খড়ের ঘর ছিল; তারপরে দালানের পর দালান উঠিয়াছে, একতালা ক্রমে তেতালায় গিয়া ঠেকিয়াছে, প্রায় দশ-বিঘা জমি অধিকার করিয়া চৌধুরীদের বিশাল বাড়ী। কিন্তু, বাস্তুর বাগান সেই প্রথমে যেমন ছিল তেমনি আছে, কেবল আগাছা আর জঙ্গল বাড়িয়াছে। এদিকে কেহ আসে না, আসিবার আবশ্যকও হয় না; শুধু পৌষ-মাসের সংক্রান্তির দিনে বাস্তু-পূজার সময় একবার এখানে লোকজনের আগমন হয়। যথারীতি পূজা হইয়া গেলে একটি ছাগ বাস্তুর উদ্দেশে নিবেদন করা হয়। ছাগটিকে নিবেদন করিয়া পাকুড়গাছের নিকটে ফেলিয়া দেওয়া হয়, নিমেষের মধ্যে অজগর আগাছার জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া পশুটিকে সবলে জড়াইয়া ধরে। সে বেষ্টন এতই ক্ষিপ্র, এতই প্রবল যে, হতভাগ্য পশুর প্রথম আর্ত্তনাদ কণ্ঠে অর্দ্ধোচ্চারিত ভাবে থামিয়া যায়। অজগর ক্রমে পশুটিকে জড়াইয়া ধরিয়া চাপিতে থাকে কিছুক্ষণের মধ্যে ছাগের দেহ একটি সুদীর্ঘ মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। তখন সে পিছনের দুই-পা হইতে সেই মাংসপিণ্ডকে গিলিতে আরম্ভ করে। ছাগের মুণ্ডটি শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায়, গাল বাহিয়া রক্তের দাগ, কোটরাগত দুই চক্ষু-তারকার অস্বাভাবিক একটা দ্যুতি জঙ্গলের অন্ধকারে দুটি জোনাকীর মত জ্বলিতে থাকে। ক্রমে তাহাও লুপ্ত হইয়া যায়। সকলে বাস্তুর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসে, সারা বছরের মধ্যে আর কেহ সেদিকে যায় না।

সাপের মত এমন ভয়ঙ্কর প্রাণী আর নাই। ইহা কি তার বিষের জন্য! না—ইহার সহিত কি যেন একটা রহস্য জড়িত আছে। ইহার পা নাই, হাত নাই, তবু চলে; ইহার নখ নাই, শিং নাই, তবু মারাত্মক; বাঘে মানুষ খায়, তাই মানুষ মারে, সাপ শুধু শুধু মানুষ মারিয়া চলিয়া যায়; বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করা চলে, সাপকে মারিতে পার,

কিন্তু সাপের সঙ্গে কে কবে লড়াই করিয়াছে? ইহা চলে, কিন্তু নিঃশব্দে; বলে, কিন্তু নীরবে; মারে, কিন্তু বিনা অস্ত্রে; বাঁচে, কিন্তু খাদ্য ব্যতীত; কিন্তু সাপ কি কখনও প্রাণ ত্যাগ করে! জড়তাই তার মৃত্যু খোলস ত্যাগ করিয়া সে নবজীবন লাভ করে। একাধারে সে মৃত্যু ও জীবনের দূত। দুই বিপরীত কোটি যেখানে মিলিত হয় সে স্থান রহস্যময়, রহস্যই ভীতির প্রধান উপাদান। সমুদ্র ভীষণ, একাধারে তাহাতে অমৃত ও হলাহল; আকাশ ভীষণ, বজ্র এবং বৃষ্টির আশ্রয়; রমণী ভীষণ, জনয়িত্রী ও মারয়িত্রী; সর্প ভীষণ, জীবন ও মরণের প্রতীক। সাপকে যে শয়তান বলে, তাহা বোধ করি অত্যুক্তি নহে!—

দুপুরবেলা নির্জ্জন বাড়ীর মত এমন রহস্য বোধ করি আর নাই। রৌদ্র যখন ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, অশথ পাতার ঝির ঝির, শুষ্ক পাতার খস্ খস্, করুণ ঘুঘুর বিষণ্ণ স্বর, তখন নিস্তব্ধ বাড়ীর কথা বলিয়া ওঠে। সেখানে যখন মানুষের বাস ছিল, তখন সে মানুষের ভাষা বুঝিত; এখন মানুষ সেখানে থাকে না, মানুষের ভাষা সে ভুলিয়াছে। রৌদ্র, বাতাস, বন-জঙ্গলের সঙ্গে থাকিয়া এখন সে প্রকৃতির স্বভাবী! এ যেন এক সময়ে মানুষ ছিল, এখন বনে গিয়া বনমানুষ, তখন ছিল সে মানুষের আত্মীয়, এখন সে মানুষের পরম-শত্রু। গ্রীষ্মের দুপুরে মানুষ যখন ক্ষণকালের জন্য ঘুমাইয়া পড়ে, প্রকৃতি তখন জাগিয়া ওঠে, তার সহিত জাগিয়া ওঠে নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, পরিত্যক্ত অট্টালিকা।

বাস্তুর বাগানের দক্ষিণে চৌধুরী-বাড়ীর অতিশয় পুরাতন পরিত্যক্ত অংশ। যখন চৌধুরীদের অবস্থা ভাল ছিল না, তখন এই নীচু, সিক্ত, দালানগুলিতে বসবাস ছিল, এখন বহুকাল হইতে এগুলি পড়িয়া আছে, এখানে বাস করা তো দূরের কথা, এদিকেও কেহ বোধ করি আসে না।

দর্পনারায়ণ অনেক সময় ভোরবেলা এদিককার ছাদে উঠিয়া বেড়াইত। ছাদের উপরে ঢোল-কলমীর ফুল ফুটিয়াছে, অশথ গাছের শিকড় দেয়াল

বাহিয়া নামিয়া গিয়াছে। রাতের বেলায় বোধ করি বাদুড়ের দল এখানে আসে, এক রাশি জামের বীচি, আমের আঁঠি ছড়ানো। দর্পনারায়ণ একাকী বেড়ায়, কিন্তু সকালবেলা কিছু বুঝিবার উপায় নাই, পোড়ো-বাড়ী নেহাৎ ভালমানুষের মত পড়িয়া থাকে। সন্ধ্যাবেলাতেও সে আসিয়াছে, বাড়ী তখন নির্জ্জীব বাড়ীমাত্র। দুপুরবেলা কখনও আসে নাই, কারণ দুপুরবেলা বেড়াইবার সময় নয়। যদি আসত, দেখিত দালানের চেহারা অন্য রকম। বাতাস শন শন করিয়া বহে—বাড়ীর কক্ষে কক্ষে, জানালায়, ঘুলঘুলিতে তার প্রতিধ্বনি; বাহিরে অশথ পাতার ঝর ঝর—ভিতরে বাদুড়ের পাখার মুহুর্মুহুঃ কম্পন; বাহিরে শুষ্ক পাতার মর্ম্মর—ভিতরে অলক্ষ্য সরীসৃপের সঞ্চরণ; রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করে, বাড়ীর নিস্তব্ধতা রী রী করিয়া ওঠে, আর সকলকে ছাপাইয়া মাঝে মাঝে শুষ্ক অট্ট, চকিত একটা হাসি। সে হাসি যে-ওষ্ঠাধর হইতে উত্থিত, তাহাতে যেন মাংস নাই, কোমলতা নাই, জীবন্ত মানুষের স্পর্শ নাই, রস নাই, যেন কোন কঙ্কালের অস্থিসার পাণ্ডুর মুখগহ্বর হইতে সে হাসির উদ্ভব।

এ হাসির শব্দ চৌধুরী-বাড়ীর অনেকে শুনিয়াছে। দু'এক জন অবিশ্বাসী বলে, ইহা খেঁকশিয়ালের শব্দ। কিন্তু বৃদ্ধেরা জানে ব্যাপারটা কি। তারা জানে, বাড়ীর ঐ অঞ্চলটাতে কত হতভাগ্যের কঙ্কাল নিহিত; কত মুমূর্ষুর অশ্রু ওদিকে ঝরিয়াছে। তাদের মধ্যে কোনও হতভাগ্য মৃত্যুর পূর্ব্বে জীবনটাকে যে একান্ত ভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, মৃত্যুর পরে আজ তার ব্যর্থতা বুঝিয়া হয়ত শুষ্ক অট্টহাস্যে জীবনকে পরিহাস করিয়া থাকে। কে জানে! দর্পনারায়ণ একদিন এ হাসি শুনিতে পাইল। শুষ্ক হাসির ক্রমোচ্চ শব্দ, মনে হইল, যেন নীরস শীতল শ্বেতপাথরের একশ্রেণী সোপান মাটি হইতে কোন রহস্যের অভিমুখে উঠিয়া গেল। ভয়ের পরিবর্ত্তে তার কৌতূহল হইল। তার পরে সে অনেক দিন এই শব্দ শুনিয়াছে, কিছু ঠিক করিতে পারে নাই। একদিন সন্ধ্যাবেলা সে

ছাদের উপর হইতে বাস্তুর বাগানের দিকে তাকাইয়া দেখিল, একটা মানুষ। কৌতূহল আরও বাড়িল।

তখন সে এই ব্যাপার তার দুই ভাইকে বলিল। তারপর কি ঘটিল, পাঠক অবগত আছেন।

৯

সেদিন সন্ধ্যার পরে তিনজনে বাস্তুর বাগানের ছাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। খিড়কি পার হইলেই বাস্তুর বাগান, কিন্তু সেখানে প্রবেশের সাহস তাদের নাই। সিঁড়ি দিয়া ছাদে উঠিলে সহজেই হইত, কিন্তু তাতে কর্ত্তৃপক্ষের নজরে পড়িবার আশঙ্কা। বাস্তুর বাগানের নামে বিশেষ অন্ধকারে, রঘুনাথের মনে ভয় জন্মিয়াছিল, এই সমস্যায় মুক্তির হয়তো একটা ক্ষীণ আশা দেখিয়া সে বলিল,—তা হলে ভাই কি করে হবে।

দর্পনারায়ণ বলিল,—সে আমি ঠিক করে রেখেছি, মই এনেছি। রঘুনাথের ক্ষীণ আশাও বিলুপ্ত হইল। বৈশাখ মাসের সন্ধ্যা, সারাদিনের গুমোটের পরে সবেমাত্র ঝিরঝিরে বাতাস উঠিয়াছে। বাতাস এখনও আসিয়া পৌঁছে নাই, পশ্চিম হইতে ধীরে চলিয়া আসিতেছে, তারি স্পর্শে বাস্তুর বাগানের অশথ গাছের ঝর ঝর শব্দ উঠিয়াছে। দূরে একটা বেনেবউ পাখী ঠক ঠক শব্দে এক মনে বনলক্ষ্মীর অলঙ্কার নির্ম্মাণে লাগিয়া গিয়াছে; রহিয়া রহিয়া এক ঝাঁক বাদুড় ডানার শব্দ তুলিয়া বাস্তুর বাগানের বৃক্ষাশ্রয় ত্যাগ করিয়া আহার অন্বেষণে উড়িয়া যাইতেছে; অতিদূরে হুতুমের বিপজ্জনক সুগম্ভীর তাল ঠোকার শব্দ। দর্পনারায়ণ মই লইয়া ফিরিল। কোথায় কে একজন কূয়া হইতে জল তুলিতেছিল, তাহারি চরখির শব্দ লক্ষ্য করিয়া রঘুনাথ বলিল—আঃ কে যেন ঠাণ্ডা জল তুলছে।

বিশ্বনাথ বলিল,—তোর কি গলা শুকিয়ে এসেছে নাকি?

দর্পনারায়ণ ইসারায় বলিল, চুপ।

ছাদে মই লাগান হইল ; প্রথমে দর্পনারায়ণ, তার পরে রঘুনাথ সব শেষে বিশ্বনাথ, ধীরে ধীরে যথাসম্ভব নীরবে ছাদে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সম্মুখেই গভীর বাস্তর বাগান, অন্ধকার, নির্জ্জন, ভীষণ, রঘুনাথ ব্যাপার-টাকে যত শীঘ্র সম্ভব সংক্ষেপে সারিয়া ফেলিবার জন্য বলিল,—কই কিছুইতো দেখা যাচ্ছে না। চল এবার যাওয়া যাক।

দর্পনারায়ণ এক দৃষ্টিতে কি খুঁজিতেছিল ; সে বলিল,—না ; এখনও সময় হয় নি।

রঘুনাথ কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল,—ওই যে দেখা যাচ্ছে, দেখছ না? কেহ কিছু দেখিতে পাইল না। সত্য কথা বলিতে কি সে-ও কিছু দেখতে পায় নাই, তবে কি না ভৌতিক ব্যাপার সকলের চোখে পড়ে না, সেই ভরসায় যে কোন একটা ছুতা করিয়া সরিয়া পড়িবার ইচ্ছায় ছিল।

দর্পনারায়ণ সাগ্রহে বলিল,—কই?

রঘুনাথ অন্ধকারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল,—ওই যে।

বিশ্বনাথ লক্ষ্য করিয়া বলিল,—তা বটে' কিন্তু ওর মাথা নেই যে।

রঘুনাথের এতটা খেয়াল হয় নাই' কিন্তু ভয়ে অনেক সময়ে মানুষের বুদ্ধি জোগায়, সে বলিল,—কবন্ধ। বলিয়া নিজের কল্পনায় নিজেই কাঁপিয়া উঠিল।

দর্পনারায়ণ নৈরাশ্য ও অবজ্ঞার মাঝামাঝি সুরে বলিল—দূর, ওটা একটা গাছ। মজ্জমান ব্যক্তি তৃণগুচ্ছকেও অবলম্বন করে।

রঘুনাথ বলিল,—ওরা তো ইচ্ছা করলেই যে কোন মূর্ত্তি গ্রহণ করতে পারেন।

বিশ্বনাথ সন্দেহের স্বরে কহিল,—কিন্তু গাছ হতে তো শোনা যায়নি।

রঘুনাথ বলিল,—আজ বোধ হয় দেখা দেবেন না।

এমন সময় দর্পনারায়ণ ইসারায় কহিল,—ওই দেখ্।

রঘুনাথ এই জন্যই প্রস্তুত হইয়াছিল, সে বলিল,—হাঁ, হাঁ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মেজ দা, তোমার ঘোড়াটা এবার বেঁচে গেল। চল এবার—

কিন্তু বিশ্বনাথ বাঁকিয়া বসিল,—সে কিছুই দেখে নাই। বিশেষ ঘোড়াটা নিশ্চিত হস্তগত হইবে ভাবিয়া সে একটা পুরাতন জিনও ইতি মধ্যে সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছে। সে বলিল, কই আমি তো কিছু দেখছি নে।

দর্পনারায়ণ বলিল,—ওই যে বকুল গাছের তলায়।

বিশ্বনাথ লক্ষ্য করিয়া দেখিল একটা মনুষ্য-মূর্ত্তি বটে।

দর্পনারায়ণ বলিল—মানুষ।

বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল—দূর। ওঁরা।

দুইজনে দেখিল মূর্ত্তিটি চলাফেরা করিতেছে। দুইজনে এই জন্য যে, রঘুনাথ মনুষ্যমূর্ত্তির নাম শোনা অবধি চোখ বন্ধ করিয়াছিল—সে শুধু বলিল,—কবন্ধ।

বিশ্বনাথ—দূর, মাথা যে দেখা যাচ্ছে।

ওঁরা ইচ্ছারূপী কি না, চল এবার যাওয়া যাক। মেজ দা তোমার ঘোড়াটা খুব বেঁচে গেল। কিন্তু মেজদার নড়িবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

সে বলিল,—আচ্ছা দেখাই যাক না, মানুষ না ভূত। এই বলিয়া সে একটা ঢিল কুড়াইয়া ছুড়িবার উপক্রম করিতেই রঘুনাথ কেমন করিয়া বুঝিতে পারিয়া ব্যাকুলভাবে তাহার হাত জড়াইয়া ধরিল।

দর্পনারায়ণ বলিল,—কিরে!

রুদ্ধবাক রঘুনাথের বিগলিত অশ্রুধারা তার জবাব দিল।

—কি রে, ভয় পেয়েছিস?

হায়, অজস্র অশ্রুতে এ বিষয়ে যার সন্দেহ থাকিয়া যায়, মুখের কথায়

কি সে বিশ্বাস করিবে। তবু মুখের কথায় সে বলিতে পারিল না যে, ভয় পাইয়াছে। চোখের জল মানুষের সংস্কার, তার উপরে আমাদের হাত নাই, কিন্তু মুখের কথা মানুষের সংস্কার, তার উপরে আমাদের হাত নাই, কিন্তু মুখের কথা মানুষের শিক্ষা, তাকে সে যথেচ্ছ চালনা করিতে পারে। সংস্কার সত্য কথা বলিলেও রঘুনাথের শিক্ষা স্বীকার করিতে পারিল না যে, সে ভীত।

দর্পনারায়ণ তাকে সান্ত্বনা দিল,—কোন ভয় নেই, ও আমাদের কি করতে পারে, আমরা বিষ্ণুমণ্ডপের ছাদে দাঁড়িয়ে যে!

রঘুনাথ অগত্যা নিরুপায় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দর্পনারায়ণ সেই মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুঁড়িল। ঢিলের পতনে মূর্ত্তি চঞ্চল হইয়া সরিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট শুষ্ক অট্টহাসির শব্দ উঠিল। একবার একটা কাকের ডাকের মতও যেন শোনা গেল। ইহা শুনিয়া বিশ্বনাথেরও সাহসে ভাটা পড়িয়া আসিল। সে বলিল,

—চল, যাওয়া যাক।

রঘুনাথ এতক্ষণে নিজের দোসর পাইয়া দর্পনারায়ণের হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। হাসির শব্দ থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু এ কেমন হাসি, ইহার নীরবতা অট্টরোলের অপেক্ষা ভয়ানক। সে হাসির অপেক্ষা স্মৃতি ভীষণতর। বিশ্বনাথ এবার বেশ ভয় পাইল, তখন তারা দু'জন দর্প-নারায়ণের দুই হাত ধরিয়া প্রায় টানিতে টানিতে তাকে ছাদ হইতে নামাইয়া আনিল। বিশ্বনাথ ও রঘুনাথকে—সে রাত্রের মত আর দেখা গেল না। দর্পনারায়ণ তাদের সঙ্গে খানিকটা গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তারা দু'জন দৃষ্টির বাহিরে গেলে সে আবার ফিরিল।

দর্পনারায়ণ পুনরায় ছাদে উঠিল; বাগানের মধ্যে তখনও মূর্ত্তিটা আছে, শুষ্ক পত্রের মর্ম্মরে তার পদ-চালনা অনুমান হয়। সে যে ভূতে বিশ্বাস করে না, এমন নয়, কিন্তু এ ব্যাপারটা আর একটা কিছু বলিয়া

তার বিশ্বাস। সে বিশ্বাস এতই দৃঢ় যে, সে ঠিক করিল, বাগানে প্রবেশ করিয়া ভাল করিয়া দেখিবে তাহা সত্য কিনা। মইখানা টানিয়া তুলিয়া ছাদের অন্য দিকে বাগানের মধ্যে স্থাপন করিল। এইবার নামিবার পালা। গা একবার ছম ছম করিয়া উঠিল। সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস টানিয়া উপরে তাকাইল—স্বচ্ছ আকাশ তারায় ভরিয়া গিয়াছে; দূরে বেনেবউটা তখনও শব্দ করিতেছে, হুতুমটা কখন থামিয়া গিয়াছে! সে ধীরে ধীরে মই বাহিয়া নামিতে লাগিল। বাগানের মধ্যে পেঁাছিয়া থামিল। জঙ্গলে অন্ধকার দ্বিগুণ। অতি সন্তর্পণে সে পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, দেখিল মূর্ত্তিটা সত্যই মানুষের। মূর্ত্তিটা বোধ করি পিছন ফিরিয়া ছিল, তাকে দেখিতে পাইল না। সে কাছে গিয়া লোকটাকে চিনিল, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—কে আব্বর! মূর্ত্তি চমকিত হইয়া তাহার দিকে ফিরিল, এক মুহূর্ত্ত মাত্র, তার পরেই অন্ধকারকে সন্ত্রস্ত করিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। ঢোলের শব্দের ফাঁকে ফাঁকে কাঁশির আওয়াজের মত সেই হাসির মধ্যে কাকের ডাক শোনা যাইতে লাগিল। পাঠক বোধ হয় সেই অদ্ভূত চোর ও এক-পাওয়ালা কাকটাকে ভুলিতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য আব্বর সেই চোর এবং তার চির সঙ্গী ওই কাকটা। দর্পনারায়ণ সেদিনকার হাসি ভুলিতে পারে নাই। বাস্তর বাগানে এই অদ্ভূত হাসি অনেকেই শুনিয়াছে, কিন্তু সবাই যখন সেই শব্দকে ভৌতিক মনে করিত, দর্পনারায়ণ মনে মনে তাকে সেই অদ্ভূত হাসির সহিত অভিন্ন স্থির করিয়াছিল, সেই বিশ্বাসের বলেই সে একাকী অন্ধকারে এই ভীষণ স্থানে আসিতে সাহস করিয়াছিল। তাকে দেখিয়া বালক হাসে, বালক যত হাসে, কাকটা তত তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকে। বালক হাসে হঃ হঃ, কাক ডাকে কঃ কঃ! হাসিতে বালকের সমস্ত দেহ কাঁপিতে থাকে; কাকটা বালকের হাতে বসিয়া কঃ কঃ শব্দ করে আর নাচিতে থাকে। বালক তাকে থাবা মারে, কাক

বালককে ঠোকর মারে, কেহ থামে না, কেহ হারও মানিতে চাহে না। দর্পনারায়ণ অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

১০

এই বালক গ্রামে নবাগুক। প্রথম দিনেই সে যে বিপদে পড়িয়াছিল পাঠক তাহা জানেন। উদ্ধার পাইবার পরে সে গ্রাম হইতে গেল না, দর্পনারায়ণ তাকে বাড়ীতে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাতেও সম্মত হইল না। ভাল-মন্দ এত বাসস্থান থাকিতে সে আশ্রয় লইল কালীবাড়ির চকের জীর্ণ পরিত্যক্ত ভগ্ন দালানটাতে। সে দালানটাকে এখন মানুষের কীর্ত্তি বলিলে ভুল হইবে, সে বহুকাল প্রকৃতির সহবাসে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একটা বিশাল অশথ গাছ বহু শিকড়ের জালে তাকে পাকে পাকে জড়াইয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এপাক যদি প্রণয়ের হয়, বুঝিতে হইবে প্রকৃতি তাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছে। আর যদি ইহা ক্রোধের চিহ্ন হয়, তবে প্রকৃতি এখনও তাকে মানুষের কীর্ত্তি বলিয়া ক্ষমা করিতে পারে নাই। এ জগতে রাগ ও অনুরাগের বাহ্য লক্ষণ এমন অভিন্ন যে, তাহা বুঝিতেই জীবনের অর্দ্ধেক কাটিয়া যায়। বালক সেই বাড়ীতে আশ্রয় লইল।

গ্রামের মধ্যে সে বড় আসিত না। মাঝে মাঝে আহারের সময় কারও বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইত, যা পাইত, খাইত, বেশী হইলে সঙ্গে করিরা লইয়া যাইত। কিন্তু আহার্য্য প্রতি দিন আবশ্যক, ইহাকে প্রতি দিন দেখা যাইত না; সকলে ভাবিত, লোকটা খায় কি? তার পরে তার চিরসঙ্গী ওই দাঁড়কাকটা! যমের বাহন মহিষ কিন্তু যমরাজা যখন উড়িয়া চলেন, তখন বোধ করি দাঁড়কাকেই তার বাহনের কাজ করে। দাঁড়কাক অলক্ষণ; সেই দাঁড়কাকের সাহচর্য্যে বালক ভীষণতর হইয়া উঠিল, লোকে কেন ইহাকে ভয় করিত জানি না, বোধ করি

সে আর সকলের মত মানুষ হইয়াও যে সকলের হইতে ভিন্ন, সেই জন্যই লোকে যতদূর সম্ভব তাকে এড়াইয়া যাইত। বালকেরা দূর হইতে তাহার দিকে ঢিল ছুড়িত, কাছে আসিলে পলাইত। মেয়েরা ছেলেমেয়ের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তাকে বাড়ীর কাছে আসিতে দিত না, বুড়োদের তাকে দেখিয়া নানা রকম আধিভৌতিক কাহিনী মনে পড়িত। তার প্রতি দর্পনারায়ণের অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া কেহ কোন অত্যাচার করিতে সাহস করিত না।

ক্রমে বালকের নানা রকম অলৌকিক ক্ষমতার কথা প্রচার হইতে লাগিল। যে-বিরাট ভৌতিক সন্ন্যাসী দরগাতলার বটগাছে এক পা, চৌধুরীদের মন্দিরে অন্য পা দিয়া জটা শুকায়, যাকে কেহ কোন দিন দেখে নাই, তবু বিশ্বাস করে, তার সহিত না কি বালকের কথাবার্ত্তা চলে। অবশ্য কেহ কথা বলিতে দেখে নাই, সেই জন্যই সকলে তা আরও বেশি বিশ্বাস করে, কারণ ইহা সকলে দেখিতে পায় না। একদিন বালকের গলায় একটা রুদ্রাক্ষের মালা দেখা গেল। বৃদ্ধেরা পরস্পরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, দেখেছ? সকলেই দেখিল; কিন্তু ব্যাপারটা নূতন কিছু নয়; গোড়া হইতেই তার গলায় এ মালা ছিল। কিন্তু, তার পর দিন গ্রামময় রাষ্ট্র হইল—বালকের গলার মালার রুদ্রাক্ষ সেই সন্ন্যাসীর গলার রুদ্রাক্ষ দিয়া তৈয়ারী। সন্ন্যাসী গভীর রাত্রে বটগাছ ও মন্দিরের চূড়ায় দুই পা স্থাপন করিয়া যখন গলার মালা ছাড়িয়া দেয়, তা গাছের তলশায়ী পথের উপরে আসিয়া পড়ে। গভীর রাত্রিতে কেহ সে পথে আসিলে রুদ্রাক্ষের মালায় পা জড়াইয়া আছাড় খায়। ছুতারপাড়ার কেদার এমন আধ্যাত্মিক আছাড় একদিন খাইয়াছিল। দুই একজন আগ্রহভরে কেদারকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিল; কেদার তিন বৎসর পূর্ব্বের অভিজ্ঞতায় পুনরায় ভীত হইয়া পায়ে একটা ক্ষতচিহ্ন দেখাইয়া দিল। বিশ্বাসের কাংস্যপাত্রে আর টোল

খাইবার সম্ভাবনা রহিল না। ক্রমে কেদারের ক্ষত ও বালকের রুদ্রাক্ষ গ্রাম্য গল্পের ভাণ্ডারে সহোদরত্ব লাভ করিল। কিন্তু আমরা জানি, বালকের রুদ্রাক্ষের সহিত সন্ন্যাসীর কোন সম্বন্ধ নাই; তবে কেদারের ক্ষতচিহ্নের সহিত একটা সম্বন্ধ আছে, সন্ন্যাসীর মালার নয়, ভাঙের নেশার। নেশা করিয়া আসিতে বহুবার আছাড় খাইয়া পড়িয়াছে, সেদিনও অনেকবার পড়ি, পড়ি করিয়াছে, অনেক আগেই পড়া উচিত ছিল, ঘটনাক্রমে বটতলাতে আসিয়া পড়িয়াছিল। তবে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, বিশেষ করিয়া বটতলাতেই পড়িল কেন, তবে আমরা বলিব একটা লতায় পা জড়াইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তা যে লতা তা-ই বা কে বলিল! কেহ বলে নাই, আমাদের বিশ্বাস। আর যদি তাকে সন্ন্যাসীর মালা বলিয়া বিশ্বাস করি? করুন তাতে গল্পের কোন ক্ষতি হইবে না।

গ্রামের ছুতার সম্প্রদায় যখন এই গল্প প্রচলন করিয়া দিল, জেলেদের পিছাইয়া থাকিলে চলিবে কেন? গ্রামের জেলে ও ছুতারদের মধ্যে বহুদিনকার রেষারেষি। রসিক জেলে বলিল, সে এবং আরও অনেকে দেখিয়াছে, ছেলেটা রাত্রে বিলে আলো জ্বালিয়া মাছ ধরিয়া বেড়ায়। ইহা শুনিবার পর দু'চার জন রাত্রে বিলের ধারে সত্যই আলো লক্ষ্য করিয়াছে। কিন্তু সে আলো যে ছেলেটার, তার প্রমাণ কি? ছেলেটা দিনে খায় না, তবে বাঁচে কেমন করিয়া! সে যে বাঁচিয়া আছে, তার কোন প্রমাণ আবশ্যক হয় না। খাইবার জন্যই সে মাছ ধরিয়া বেড়ায়। আরও প্রমাণ—তার জীর্ণ বাসস্থানের কাছে (ঠিক কাছে নয়, আধক্রোশ দূরে) একটা জীর্ণতর পলো পাওয়া গেল। এই পলো দিয়াই অবশ্য সে মাছ ধরে। আরো প্রমাণ আবশ্যক? সেবার গ্রীষ্মকালে বিল শুকাইয়া গেল, একটা মাছও পাওয়া গেল না। একাকী যদি সে তিন হাজার বিঘা বিলের মাছ না ধরিয়া ফেলিবে, তবে মাছ পাওয়া

যাইবে না কেন? আর বিল শুকানো, তাহার সহিত যে ছেলেটার হাতের আলোর সম্বন্ধ নাই, তাহা কেমন করিয়া বলি। সকলে জল ও অনলের সম্বন্ধ-বিচারের জন্য ভট্টাচার্য্যকে গিয়া ধরিল। ভট্টাচার্য্য বার পাঁচ সাত নস্য লইয়া (নস্য লইবার মস্ত সুবিধা এই যে, ওই অবকাশটাতে উত্তর ভাবিয়া লওয়া যায়) বলিলেন—"সহস্রগুণ-মুৎস্রষ্টুম্ আদত্তে হি রসং রবিঃ। সকলে সংস্কৃত শুনিয়া খুসী হইয়া চলিয়া গেল। পাশের ঘরে বাণীবিজয় তখন নৈবেদ্যের কলাটি সংগ্রহ করিয়া চর্ব্বণ করিতেছিল, পাছে ভট্টাচার্য্যের উত্তরে হাসি পাইয়া কদলীর অংশবিশেষ মুখ হইতে পড়িয়া যায়, সেই জন্য দুই হাতে মুখ চাপিয়া ধরিল।

ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, বাণীবিজয়, কি করছ হে?

সে বলিল—আজ্ঞে রসচর্চ্চা। বাণীবিজয় শাস্ত্রপিতার নিকটে কখনও অনৃত বাক্য বলে না।

ছুতারপাড়া ও জেলেপাড়া যখন দুইটি কাহিনী রাষ্ট্র করিয়া দিল, হাড়িপাড়া নীরবে থাকে কেমন করিয়া। একদিন প্রাতে বৃদ্ধ রমেশ ভট্টাচার্য্যের কাছে আসিয়া বলিল,—কর্ত্তা। বলিয়াই ভূমিকা না করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া দিল।

ভট্টাচার্য্য যত কারণ জিজ্ঞাসা করেন, রমেশ তত কাঁদিতে থাকে। শেষ তিনি নিরুপায় হইয়া ডাকিলেন, বাণীবিজয় শীঘ্র এদিকে এস।

বাণীবিজয় তখন ব্যবহারিক রসবিদ্যার চর্চ্চা করিতেছিল। পাঠক কি ভাবিতেছেন, কাব্য, অলঙ্কার, রসতত্ত্ব? না, সে তখন পুঁটি নামধারিণী এক গোপ-বালিকার সহিত চক্ষুআলাপ চালাইতেছিল। চক্ষু-আলাপকে চাক্ষুষ আলাপ যেন কেহ ভাবিবেন না। চক্ষু আলাপ স্বতন্ত্র এক জিনিষ। ইহা বাক্যের পরিবর্ত্তে ইঙ্গিতে চালাইতে হয়।

বাণীবিজয় এক চোখ টিপিল, দূর হইতে বালিকা দুই চক্ষু বুজিল। বাণীবিজয় ভাবিল, তার ইঙ্গিতের প্রতীঙ্গিত। তা নয়, একটা ডাঁশ

মাছির ভয়ে। বাণীবিজয় নিজের গালে এক টোকা মারিল। বালিকা নাকের ডগা চুলকাইল। কারণ, পূর্ব্বোক্ত ডাঁশ মাছির উপদ্রব। বাণীবিজয় একবার তুড়ি দিল। পুঁটি চুড়ি সামাল করিয়া লইল। বাণীবিজয়ের দন্তপংক্তি আমূল বিকশিত হইল। বালিকা নাকের নথে হাত দিল। পুঁটি আর একটা নথ চায় ভাবিয়া বাণীবিজয় শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সে দাঁড়াইয়া রহিল, পুঁটি দুধের পাত্র লইয়া পাড়ায় রওনা হইল। টোলের কাছে আসিতেই বাণীবিজয় ইসারায় তাকে ডাক দিল। পুঁটি আসিল। সে যুগপৎ পুঁটি ও পূর্ণ দুগ্ধ-পাত্রের দিকে তাকাইয়া তৃষ্ণা-কাতরস্বরে বলিল—পুঁটি, বড় ভালবাসি। এ কথার সাধারণতঃ একটাই অর্থ হয়। হাতে দুধের পাত্র না থাকিলে এই উক্তির অর্থ সম্বন্ধে হয় তো পুঁটির সন্দেহ থাকিত না, কিন্তু কাম্য বস্তুর দ্বিত্ব হওয়াতে সংশয়জড়িত স্বরে পুঁটি বলিল,—আমি কি করব।

বাণীবিজয় তখন ঘাড় কাত করিয়া রঘুর উনবিংশ সর্গের একটা শ্লোক আলোচনা করিতেছিল, সে মনে মনে অগ্নিবর্ণের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া বলিল—পুঁটি রে, বড় তৃষ্ণা!

পুঁটি এক্ষণে একটা হদিস পাইল, বলিল,—জল খাও, জল খাও!

বাণীবিজয় আর্দ্র স্বরে বলিল—পুঁটে, দুধের তৃষ্ণা কি জলে যায়? আমরা যদিও জানি রূপকের নানা অর্থ হয়, এবং রূপকের দুগ্ধ গোদুগ্ধ না-ও হইতে পারে, কিন্তু অনভিজ্ঞ পুঁটিকার সন্দেহের আর অবকাশ রহিল না। সে তাহার ক্ষুদ্র গোপ-জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছে, ভালবাসা বলিতে টাকার প্রতি টান বুঝায় এবং তৃষ্ণাটা দুগ্ধের ছাড়া আর কোন পদার্থের নহে।

পুঁটি বলিল,—খাও।

প্রত্যুত্তরে বাণীবিজয় একটি পাত্র অগ্রসর করিয়া বলিল—দাও।

এমন সময়ে ভট্টাচার্য্য হাঁকিলেন,—বাণীবিজয়, কি করছ হে?

বাণী উত্তর করিল,—আজ্ঞে 'মনোরমা-কুচমর্দ্দিনী' অভ্যাসের চেষ্টা করছি। সে কখনো অনৃত বাক্য প্রয়োগ করে না, তবে রূপক ব্যবহার করিয়া থাকে। বাণীবিজয় অকস্মাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়া পুঁটির হাত হইতে দুধের পাত্র টানিয়া লইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে সের খানেক আলগোছে নিজের মুখে ঢালিয়া দিয়া সংক্ষেপে বলিল,—পুঁটি বড় ভাল।

পুঁটি ঠিক ধরিতে পারিল তার নাম সম্বোধনে ব্যবহৃত হইল না, কর্ত্তৃপদ রূপে।

বাণীবিজয় ভট্টাচার্য্যের কাছে আসিতে বলিলেন—কি রকম চর্চ্চা হল হে।

বাণীবিজয় বলিল,—চেষ্টা করছিলাম, সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে পারিনি।

ভট্টাচার্য্য বলিল,—তাতে চিন্তিত হ'য়ো না, ব্যাপারটা বড়ই কঠিন।

বাণীবিজয়—আত্মপ্রত্যয়ের স্বরে বলিল,—তা হোক, আশা করি, কাল পরশু সফলতা লাভ করব।

ভট্টাচার্য্য শিষ্যের আত্মপ্রত্যয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া বলিলেন,—আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সফল হও।

এমন আশীর্ব্বাদ পাছে সম্পূর্ণ ফলবান্ না হয়, সেই আশঙ্কায় সে গুরুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

রমেশ তখনও কাঁদিতেছে। ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—দেখ তো বিজয় ব্যাপারটা কি!

বিজয় বলিল,—সবুর করুন দেখছি।

ভট্টাচার্য্য ক্রমাগত নস্য লইতে লাগিলেন, রমেশ ক্রমাগত অশ্রুপাত করিতে লাগিল এবং বাণীবিজয় মনে মনে কোন্ নেশার কি গুণ বিচার করিতে লাগিল। মদে মানুষকে প্রবল করিয়া তোলে, সেটা রৌদ্র রস; তাড়িতে মানুষকে বিকৃত করে, সেটা বীভৎস রস; আফিঙে মানুষকে জড় করিয়া ফেলে, সেটা শান্ত রস; মোদকে মানুষ অকস্মাৎ প্রেমিক হইয়া ওঠে, ওটা আদি রস; গুলি ও চরস অসম্ভব জগতের দ্বার খুলিয়া দেয়, ওটা

৫

অদ্ভুত রস ; গাঁজা মনে বৈরাগ্য আনিয়া দেয়, ওটা সন্ন্যাস রস ; তাতে মানুষ বিদূষকত্ব পায়, ওটা হাস্য রস ; সিদ্ধিতে—, এই বলিয়া সিদ্ধির গুণ সম্বন্ধে সে আলোচনা করিতে লাগিল। পাঠক দেখিবেন বাণীবিজয়ের রসচর্চ্চা একেবারে বিফল হয় নাই। রসকে কেবল কাব্যের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া সে ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করিয়াছে।

অকস্মাৎ বাণীবিজয় চীৎকার করিয়া উঠিল,—বুঝেছি,—বুঝেছি—সিদ্ধি, সিদ্ধি, বেটা, সিদ্ধি খেয়েছে—ওটা করুণ রস।

রমেশ ততোধিক চীৎকার করিয়া কহিল—সত্যি বলছি দাদাঠাকুর, সিদ্ধি নয়, এই নিজেকে ছুঁয়ে বলছি। রমেশ বুঝিয়াছে আত্ম অপেক্ষা বড় কেষ্ট নয়।

বাণীবিজয় আত্মপ্রত্যয়ের স্বরে বলিল,—শাস্ত্র মিথ্যা হ'তে পারে না।

রমেশ পুনরায় কাঁদিয়া বলিল,—শাস্তর মিথ্যা হবে কেন? কিন্তু সিদ্ধি নয়, দাঁড়কাক। বাণীবিজয়ের খটকা লাগিল। দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞান সে সঞ্চয় করিয়াছে (তা একেবারে অকিঞ্চিৎ নয়), তাতে জানে দাঁড়কাকের মাংস তিক্ত কিন্তু তা যে এমন অশ্রুর জোলাপ, তার জানা ছিল না। সে একটা নূতন তথ্য লাভ করিল ভাবিয়া রমেশকে জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ রমেশ, সত্যি তো?

রমেশ দৃঢ়তর স্বরে বলিল,—সত্যি দা' ঠাকুর দাঁড়কাক তাতে আর ভুল নাই।

বাণীবিজয় ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করিল, ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হল বাণী?

—আজ্ঞে দ্রব্যগুণের টীকায় লিখে রাখি দণ্ডকাকের মাংসে অশ্রুপাত হয়। হ্যাঁ রমেশ, কতটা খেয়েছিস্?

রমেশ বিস্মিত হইয়া বলিল,—খাব কেন, দা'ঠাকুর?

—তবে কি রে?

—আজ্ঞে দেখেছি।

বাণীবিজয় ভট্টাচার্য্য কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না। ভট্টাচার্য্য ক্রমাগত এতই নস্য লইয়াছেন যে, শামুকের খোলাটা শূন্য হইয়া গিয়াছে। তিনি অন্যমনস্ক ভাবে শূন্য খোলা হইতে শূন্য আঙুল ক্রমাগত নাসারন্ধ্রে দিতে লাগিলেন ও নেশা হইতেছে না দেখিয়া নস্যকারকে মনে মনে গালিদিতে লাগিলেন। তখন রমেশ যা বলিল, তাহা হইতে অশ্রুর অংশ সেচিয়া ফেলিলে এইরূপ দাঁড়ায়। কাল রাত্রে (এখানে তার নৈশ আহার্য্যের একটি সুদীর্ঘ তালিকা ও গৃহিণীর সহিত কলহের সংবাদ ছিল, অবান্তরবোধে বাদ দিলাম) যখন সে ও পূর্ণ তামাক সেবন করিতেছিল (এখানে পাড়ার মতি গোয়ালিনী সম্বন্ধে আর একটা মুখরোচক অংশ ছিল, প্রক্ষিপ্ত অনুমান করিয়া বাদ দিলাম), তখন সে দেখিল (এখানে অনেকক্ষণ ধরিয়া অশ্রুপাত), সেই দুষমনটা, যার নাম করিতে নাই, সে তার দাঁড়কাকটায় চাপিয়া হঠাৎ মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল। (পূর্ণ অবশ্য দেখে নাই, কারণ সে নেশা করিয়াছিল; আমরা পূর্ণর বক্তব্য শুনিয়াছি, সে ঠিক উল্টা কথা বলে; তার মতে রমেশ নেশা করিয়াছিল বলিয়াই দেখিতে পাইয়াছিল)।

ভট্টাচার্য্য সব শুনিয়া বলিলেন,—দেখলে তো বিজয়?

সে বলিল,—আজ্ঞে আমি আর কই দেখলাম, দেখল তো রমেশ?

ভট্টাচার্য্য প্রত্যয়-দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন,—ওই হ'ল। আচ্ছা রমেশ, দাঁড়কাকটার ক'টা পা?

—একটা কর্ত্তা, একটা।

আর কারো কোন সন্দেহের অবকাশ রহিল না। সেই দিনই ভট্টাচার্য্যের অনুমোদিত এই কাহিনী পাড়ায় রাষ্ট্র হইল। ছেলেটা রাত্রে কাকের পিঠে চাপিয়া কামাখ্যা যায়। এই কাহিনীগুলির মধ্যে রমেশেরটা একেবারে প্রমাণকণ্টকশূন্য ও রোমাঞ্চকর বলিয়া গ্রামের লোকের সর্ব্বাপেক্ষা মুখরোচক হইয়া উঠিল।

১১

প্রথম যে দিন আমরা দর্পনারায়ণকে দেখিয়াছিলাম, তার পরে আজ দীর্ঘ ছয়-সাত বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আজ সে আঠার-উনিশ বৎসরের যুবক। এই কয় বৎসরে চৌধুরীপরিবারে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। বৃদ্ধ উদয়নারায়ণের দেহে জরার আক্রমণ ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু আজিও তিনি তেজস্বী পুরুষ। প্রদীপের তৈল নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, তবু শিখা এখনও উজ্জ্বল। কিছু দিন হইল তাঁর দৃষ্টি ও শ্রুতিশক্তিতে হানি ঘটিয়াছে। কিন্তু, উৎসাহ ও মানসিক প্রফুল্লতা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। ইহার কারণ আছে। পৌত্রের বিবাহের জন্য একটি উপযুক্ত পাত্রী সংগ্রহ করিয়াছেন। অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা বলিলে ভুল হয়, কারণ রাজত্ব অর্দ্ধেক নয়, সম্পূর্ণ এবং তাকে রাজকন্যা বলা বোধ করি নিরর্থক নয়।

জোড়াদীঘি হইতে তিন-চার ক্রোশ দূরে রক্তদহ নামে একটা গ্রাম আছে। সেই গ্রামের জমিদারের কন্যা ইন্দ্রাণী। কুলীনের মেয়ে, বয়স কিছু বেশি, কিন্তু রূপ তার অপেক্ষা কম নয়; সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলিতে হয়, রূপ ও রূপা ইন্দ্রাণীর মধ্যে প্রতিযোগিতা করিতেছে। বোধ করি, রূপেরই জিত হয়। আর মস্ত সুবিধা এই যে, মেয়ের দুই কুলে কেহ নাই, কাজেই তার ঐশ্বর্য্যের নদীটা ভাবী শ্বশুর-কুলের সিন্দুক-সঙ্গমের দিকেই প্রবাহিত। উদয়নারায়ণের বৃহৎ জমিদারির মধ্যে রক্তদহের জমিদারিটা একটা উদ্ধত প্রক্ষেপের মত ছিল। উদয়নারায়ণ ভাবিলেন, ভগবান তাকে এত দিনে একটা সুযোগ দিয়াছেন। ইন্দ্রাণী শৈশব হইতে পিতৃ-মাতৃহীন; তার বিশ্বাসী দেওয়ান, দূর সম্পর্কের এক জ্যেঠা তাকে পালন করিয়াছে, জমিদারি দেখিয়াছে, সামাজিক ভাবে এই বৃদ্ধই ইন্দ্রাণীর অভিভাবক। কিন্তু ইন্দ্রাণীর স্বাভাবিক অভিভাবক ইন্দ্রাণী নিজেই সে কথা যথাসময়ে প্রকাশ পাইবে।

চৌধুরী-পরিবারের সহিত বিবাহের প্রস্তাবে ইন্দ্রাণীর দেওয়ান-জ্যেঠা

রাজি হইলেন; ইন্দ্রাণীর অসম্মতির কোন কারণ হইল না। বৃদ্ধ উদয়নারায়ণ একদিন পাল্কী চাপিয়া রক্তদহে গিয়া পৌত্র-বধূকেও-ও সেই সঙ্গে জমিদারিটা দেখিয়া আসিলেন। বৃদ্ধ ইন্দ্রাণীর নাম দিলেন রক্তদহের রক্তকমল।

দর্পনরায়ণ শুনিল, তার বিবাহ আসন্ন! সেকালে বিবাহের জন্য পাত্রের সম্মতির অপেক্ষা করিতে হইত না। সম্মতি চাহিলেও দর্পনারায়ণের আপত্তির কারণ ছিল না। কারণ, সে রক্তদহের বিলে হাঁস শিকার করিতে গিয়া রক্তদহের রক্তকমলকে দেখিয়া আসিয়াছে। তখন বিবাহের সম্ভাবনা ছিল না; ইন্দ্রাণীকে তার আকাশের তারার মত সুন্দর লাগিয়াছিল। বিবাহের প্রস্তাবের পরে আর একবার লুকাইয়া গিয়া দেখিয়া আসিল। দেখিল, ইন্দ্রাণী গৃহের প্রদীপের মত স্নিগ্ধ। দর্পনারায়ণ আজকাল প্রায়ই শিকারে যায়, উদয়নারায়ণ ও স্বরূপ সর্দ্দার তাহা লক্ষ্য করিয়া হাসে। বহুদিন পরে আজকাল বৃদ্ধের অধরে দু'একটা স্নিগ্ধ হাসির রেখা দেখা দেয়। স্বরূপ সর্দ্দারের দেহের কাঠামোটা এখনও অবিকৃত রহিয়াছে, কিন্তু ভিতরে তাহা অন্তঃসারশূন্য। এ যেন বর্ষাশেষের নদীর তীরের মত, উপরে শ্যামল ঘাস, কিন্তু তলায় ক্ষইয়া গিয়াছে, ধ্বসিয়া পড়িবার এক মুহূর্ত্ত আগেও বুঝিবার উপায় নাই। তার এখন অখণ্ড অবসর। দর্পনারায়ণরা তিন ভাই তার আখড়া হইতে ছুটি পাইয়াছে; ইহার অনেক আগেই ছুটি পাইয়াছে শরৎ পণ্ডিতের পাঠশালা ও বাণীবিজয়ের চতুষ্পাঠী হইতে। শরৎ পণ্ডিতের পাঠশালা আজিও নিয়মিত বসে। বাণীবিজয় আর বালকদের অধ্যাপনা করে না, স্বপ্নদর্শনের কাজটা বোধ করি নিজের বাড়ীতেই সারে।

দুর্গাপূজার পরে অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহের দিন স্থির হইল। চৌধুরী বাড়ীতে বিষম একটা আন্দোলন পড়িয়া গেল। বৃদ্ধের কারণে-অকারণে তাগিদের জ্বালায় লোকজন অস্থির হইয়া উঠিল। পূজার বরাদ্দ এবার দ্বিগুণ। বাড়ী চুণকাম সুরু হইল, ইন্দ্রাণীর জন্য নূতন তেতলা উঠিল।

বুদ্ধ আগে মনে করিতেন, দিন বড় শীঘ্র যায়, এখন দেখিলেন, কালের গতি মন্থর। দুরতিক্রম্য এই দীর্ঘ সময়টা তাঁর কাটিতে লাগিল স্বরূপের সঙ্গে ইন্দ্রাণীর আদর-আপ্যায়ণের আলোচনায়, আর দেওয়ানজীর সঙ্গে ভাবী জমিদারির শাসনের ব্যবস্থায়।

১২

একদিন রাত্রে দর্পনারায়ণ দরজায় শব্দ শুনিয়া জাগিয়া উঠিল; বাহিরে আসিয়া দেখিল, সেই বোবা ছেলেটা দাঁড়াইয়া আছে। দর্প-নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিল, কি রে আব্বর, ব্যাপার কি? আব্বর হাতে একটা চক্র আঁকিয়া দেখাইল, দর্পনারায়ণ বুঝিল, বিশেষ দরকারে কোথাও যাইতে হইবে। দর্পনারায়ণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, এত রাত্রে কোথায় যেতে হবে রে? আব্বর একবার নিজের মাথায়, একবার কাকটার মাথায় চড় মারিয়া মুখ বিকৃত করিল; দর্পনারায়ণ বুঝিল, ছিদাম বহুরূপীর বাড়ীতে।

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। আব্বর কথা বলিতে বা বুঝিতে পারিত না; অন্য কারো কথা বুঝিবার জন্য তার আগ্রহও বোধ করি ছিল না। দর্পনারায়ণের সহিত ঘনিষ্ঠতা হওয়াতে উভয়ের মধ্যে ভাব প্রকাশের জন্য কতকগুলি সঙ্কেতের সৃষ্টি হইয়াছিল। আব্বর সেই সব সঙ্কেত করিত, দর্পনারায়ণ বুঝিত; দর্পনারায়ণ সঙ্কেত করিত, আব্বর বুঝিত; ইহা ছাড়া দর্পনারায়নের দু'চারটা কথা বোধ হয় আব্বর বুঝিতে পারিত। বিজ্ঞান কি বলে জানি না, সমবেদনায় অনেক কিছুই সম্ভব হয়।

দুই জনে নীরবে চলিতে লাগিল। দর্পনারায়ণ বুঝিল, ছিদামের আবার সেই উৎপাত দেখা দিয়াছে। ছিদাম এ অঞ্চলের একটা প্রসিদ্ধ লোক; গ্রামে গ্রামে বহুরূপীর তামাসা দেখাইয়া পয়সা রোজগার করে।

এ গ্রামে তার বাড়ী নয়, কোথায়, তাহা কেহ জানে না। বোধ করি তার বাড়ী-ঘর নাই, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ানোই অভ্যাস। তবে, মাঝে মাঝে এ গ্রামে আসিয়া কিছুদিন করিয়া থাকে, সেই জন্য লোকে তাকে এখন জোড়াদীঘির অধিবাসী বলে।

ছিদাম লোকটা অদ্ভুত রকমের। দিনের বেলায় সে রঙতামাসা দেখাইয়া বেড়ায়, লোককে হাসায়, নিজে হাসে। মাথার টাকের পরচুলা পরে, গোঁফ জুড়িয়া দেয়, একটা ভাড়ের মুখোস পরে, বিরাট একা ভুঁড়ি বাহির করে; বাড়ীতে বাড়ীতে আমোদ দেখাইয়া যা পায়, লইয়া সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফেরে। রাত্রিবেলা সেই পোষাক খুলিয়া রাখিয়া শুইয়া পড়ে, কিন্তু ঘুমাইতে পারে না। সেই মুখোস ও পোষাকটা দেখিয়া চীৎকার করিতে থাকে। যাহা বলে, তার মর্ম্মগ্রহণ করা যায় না। পাড়া-পড়শীরা আসিয়া পোষাক আর মুখোস সরাইয়া লইলে, শান্ত হওয়ার পরিবর্ত্তে আরও বেশি করিয়া চীৎকার করে। বাধ্য হইয়া উহা পুনরায় কাছে আনিয়া দিতে হয়। সে ভীত আতঙ্কিত হইয়া আবার চীৎকার করিতে থাকে। এই রকম করিয়া তার জীবন কাটে, সবাই ইহা জানে। দিনের বেলায় তাকে এ সব কথা বলিলে সে বুঝিতে পারে না, হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। দিনের বেলায় লোকেরও বিশ্বাস করতে বাধে যে, ঐ হাসিখুসি লোকটা রাত্রে এমন বীভৎস ব্যাপার করিতে পারে। গ্রাম্য অনেক জটিল সমস্যার মধ্যে ছিদামের এই অদ্ভুত ব্যাপার অন্যতম।

সম্প্রতি কয়েক বছর হইল, সে এই গ্রামে ঘন ঘন আসিতেছে ও আগের অপেক্ষা দীর্ঘকাল ধরিয়া বাস করিতেছে। কিন্তু রাত্রের ঐ অদ্ভুত আচরণের কোন অন্যথা হয়নি।

দিনের বেলা আব্বর যতটা সম্ভব ছিদামকে এড়াইয়া যায়, কাছে আসিলে ঢিল ছুড়িয়া পালায়। রাত্রিবেলা সে বহুরূপীর ঘরের আনাচে

দেখিয়া দর্পনারায়ণের বুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল, সে ছিদামকে সান্ত্বনা না দিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। হাসির শব্দে পিছনে তাকাইয়া দেখে আব্বর ভয়ানক হাসিতেছে। তার হাসিতে ছিদাম রাগিয়া উঠিল, দেখ দেখ দাদাবাবু, অদৃষ্টের ফেরে আমি কাঁদছি, ও বেটা হাসছে।

দর্পনারায়ণ এমনিতেই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, আব্বরের হাসিতে তার গা জ্বলিয়া উঠিল, সে বিরক্তির সহিত জিজ্ঞাসা করিল, আব্বর হাসছিস্ কেন?

আব্বর ছিদামের গালের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইল। একটা জিনিষ এতক্ষণ তার চোখে পড়ে নাই। ছিদামের গালে উল্কি দিয়া আঁকা একটা গণেশের মূর্তি ছিল। ক্রন্দনের সময়ে মাংসপেশীর সঙ্কোচ প্রসারণে সেই গণেশের শুড়টা নড়িতেছিল। এই অদ্ভুত দৃশ্য আব্বরের হাসির কারণ, আব্বরকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, দর্পনারায়ণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া না উঠিলে হয়তো নিজেই হাসিয়া ফেলিত।

ছিদাম বলিল, দাদাবাবু, বাপের দুঃখ দেখে ছেলে হাসে শুনেছ?

সে বুঝিল, এ সব হেঁয়ালির অর্থ-বোধ করিবার চেষ্টা বৃথা, সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ছিদাম বলিল,—দাদাবাবু, আমি ওর বাপ।

দর্পনারায়ণ বুঝিল, এটাও একটা প্রলাপ। কিন্তু' তাহার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাহাতে কথাটা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। দর্পনারায়ণ অবাক হইয়া বসিয়া রহিল।

ছিদাম বলিতে লাগিল—

আমি কখনো বিয়ে করি নি। কিন্তু ও আমার ছেলে। পাছে লোকে ওকে যা-তা বলে সেই জন্য আমি পৈতৃক গ্রাম ছেড়ে ওকে নিয়ে অন্যত্র গেলাম। কিন্তু তার দরকার ছিল না। ভগবান্ ওকে এমন ক'রেই গড়েছিলেন, ভাল-মন্দ কোন কথাই ওর শোনবার উপায় ছিল

না। বুঝলেন দাদাবাবু, ভগবানের বিচার আছে। এই বলিয়া মুখে ভগবানের প্রতি এমন একটা পৃষ্ঠপোষণীয় ভাব আনিল, যাহা ঘরের কোণ-হইতে লক্ষ্য করিয়া তিনি বোধ করি পরম আশ্বস্ত হইলেন। সে আবার আরম্ভ করিল—

—হরিশপুরের মেলায় ওকে ছোট বেলায় হারিয়ে ফেলি। কত খুঁজিলাম শেষে এই বাগানে পেলাম দেখা, বহুকাল পরে। ও আর আমাকে চিনিতে পারল না, আমিও ওকে বোঝাতে পারলাম না, ও না পায় শুনতে, না পারে বলতে। ভগবানের এটা অবিচার। তাকে একবার পেলে বুঝলে কি না দাদাবাবু।—দাদাবাবু বুঝিল কি না জানি না, কিন্তু ভগবান বুঝিলেন। আমার বিশ্বাস জগতের এই সব সম্মিলিত 'বুঝলে কি না দাদাবাবু'র আশঙ্কাতেই ভগবান্ নিরাকার। সে পুনরায় সুরু করিল—

—দেখলাম অন্য কাউকে বলে লাভ নেই। হয় তো কেউ বিশ্বাস করবে না, কেউ ওকে ঘৃণা করবে, কেউ করবে আমাকে। তাই ওকে জানালাম না বটে, কিন্তু এই গ্রামেই ঘন ঘন আসতে লাগলাম, আর থাকতে লাগলাম। আমি আর বেশিদিন বাঁচবো না, বোধ করি আজ রাত্রেই আমার শেষ হবে। তোমাকে বলে গেলাম, দেখেছি তুমি ওকে স্নেহ কর। তুমি ওকে একটু দেখো।—আরে আরে দেখছ বেটা শয়তানের কাণ্ড—তবে রে শালা, আমার সঙ্গে চালাকি! প্রবল বিকারের ঝোঁকে ছিদাম আবার ভীষণ হইয়া উঠিল। চোখ ঠেলিয়া বাহিরে আসিতে চায়, গাল আরো বসিয়া গেল, মুখ দিয়া ফেনা পড়িতে লাগিল।

এই করুণ দৃশ্যে আব্বর দুঃখিত হইল, তার সমবেদনার চিহ্নস্বরূপ বক দেখাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ছিদাম উদ্দাম হইয়া উঠিল—ওরে বেটা আমি তোর বাপ মরি, আর তুই করিস্ ঠাট্টা ?

দর্পনারায়ণ তাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, উহা ছেলেটার ক্রন্দনের চিহ্ন, করুণার প্রতীক।

কিন্তু ছিদামের ক্ষিপ্তভাব কিছুতেই যায় না, আব্বরের বক দেখানও কমে না। ছিদাম কাঁদে, লাফায়, হাত পা ছোঁড়ে, চুল ছেড়ে ঠেলিয়া উঠিতে চায়, আর অদূরে দাঁড়াইয়া আব্বর নীরবে বক দেখায়। দু'জনের জন্য দু'জন পিতা পুত্র পরস্পরের জন্য পরস্পর সত্যই ব্যাকুল, কিন্তু তা বুঝিবার উপায় নাই, একজন শোনে না, অন্য জন বোঝে না, একজন নির্ব্বোধ, অন্য জন পাগল, দুই জনকে ভুল বুঝিয়া দুই জনের তুমুল তাণ্ডব। ভগবানের যে বিচার আছে, সে বিষয় আর সন্দেহ নাই।

বিস্মিত দর্পনারায়ণ, এই পিতা-পুত্র প্রহসনের একমাত্র দর্শক। কিন্তু না, বোধ করি আরো একজন ছিলেন। শিল্পী যে-তৃপ্তিতে স্বনির্ম্মিত মূর্ত্তিটি দেখিতে থাকেন, সেই তৃপ্তিতেই বোধ করি জগৎ-শিল্পী এই অপূর্ব্ব প্রহসন দেখিতেছিলেন, ওই উপরে চালের বাতায় বসিয়া,—আর পাগলের কথাকে যদি বিশ্বাস করা যায়, তা হইলে বোধ হয়, ওই মুখোসটার অন্তরাল হইতে।

রাত্রিশেষের সঙ্গে সঙ্গে ছিদামের জীবন-প্রদীপের তৈল ফুরাইয়া আসিল। প্রদীপ নিভিবার পূর্ব্বে শেষবারের জন্য প্রবল দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিল। প্রবল বিকারের ঝোঁকে দর্পনারায়ণকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া ছিদাম লাফাইয়া গিয়া আব্বরকে আক্রমণ করিল, বলিল, খোল বেটা, মুখোস খোল। দৃঢ় হাতের চাপে নিঃশ্বাস রোধ হইয়া আব্বরের মরিবার উপক্রম। দর্পনারায়ণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া আব্বরকে তাহার আয়ত্ত হইতে মুক্ত করিল। নিরুপায় ছিদাম বলিল,—বেটা খোল নিজে মুখোস, খুললি নে মুখোস; দাঁড়া আমি মুখোস পরে নি। এই বলিয়া সে মুখোস আঁটিয়া লইয়া নাচিতে নাচিতে গান ধরিল,

"যাদু কথায় কি কাজ করে
যেমন যাদু করে যাদুকরে ॥
গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল
তাতে কি আশা পোরে ॥"

কি বেটা চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস, বাপ নাচছে? নাচ বেটা নাচ। এই বলিয়া সে আব্বরের হাত চাপিয়া ধরিয়া দুই জনে নাচিতে লাগিল। সে কি নাচ! একেবারে পিতাপুত্রের সম্মিলিত নৃত্য।

অবশেষে শ্রান্ত ছিদাম বিছানায় গিয়া শুইল। অনেকক্ষণ কোন সাড়া শব্দ নাই, কেবল ঘন ঘন নিঃশ্বাসের তালে জীর্ণ বক্ষের স্পন্দন। হঠাৎ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল, তার কৃশ চঞ্চল পা দুখানি খিঁচাইয়া উঠিয়া সরলভাবে পড়িয়া গেল মুখোসের আড়াল হইতে শোনা গেল,—আঃ দাদাবাবু, বাঁচতে পারলে হ'ত।

দর্পনারায়ণ বুঝিল, এইবার শেষ। এমনিই হয় বটে! জীবনের সহিত মানুষের প্রৌঢ় পত্নীর সম্বন্ধ; রাগারাগি করে, ছাড়িয়া যাইতে চায়, তবু বিপদে এবং দুঃখে তাকেই আঁকড়িয়া ধরে! আনন্দ হয় তো জীবনের পরপারে, কিন্তু সান্ত্বনা জীবনের মধ্যেই। মানুষের কাছে হয়তো আনন্দটাই বড়; কিন্তু সান্ত্বনার দৃঢ় তটভূমির আশ্রয় না থাকিলে কিছুই কিছু না।

অনেকক্ষণ শব্দ না পাইয়া, দর্পনারায়ণ মুখোস খুলিয়া ফেলিল। ভাঁড়ের মুখোসের বিকৃত হাসির অন্তরালে নিজের মুখের প্রচুর অশ্রু-চিহ্ন রাখিয়া ছিদাম চলিয়া গিয়াছে। প্রথমে দর্পনারায়ণ বুঝিতে পারে নাই লোকটা তখনও জীবিত কি মৃত! আব্বর তার গালের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখাইল—সেখানে শুঁড়-শুদ্ধ সিদ্ধিদাতা গণেশ নিশ্চল। সে চোখ বন্ধ করিয়া জিভ বাহির করিয়া বুঝাইয়া দিল, ছিদাম মরিয়াছে। ততক্ষণে প্রভাত হইয়াছে, ভোরের আলো লক্ষ্য করিয়া দাঁড়কাকটা বার কয়েক ডাকিয়া উঠিল। দর্পনারায়ণ আব্বরকে পাহারায় রাখিয়া মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থার জন্য বাহির হইয়া আসিল।

কিন্তু ছিদামের ক্ষিপ্তভাব কিছুতেই যায় না, আব্বরের বক দেখানও কমে না। ছিদাম কাঁদে, লাফায়, হাত পা ছোঁড়ে, চুল ছেড়ে ঠেলিয়া উঠিতে চায়, আর অদূরে দাঁড়াইয়া আব্বর নীরবে বক দেখায়। দু'জনের জন্য দু'জন পিতা পুত্র পরস্পরের জন্য পরস্পর সত্যই ব্যাকুল, কিন্তু তা বুঝিবার উপায় নাই, একজন শোনে না, অন্য জন বোঝে না, একজন নির্ব্বোধ, অন্য জন পাগল, দুই জনকে ভুল বুঝিয়া দুই জনের তুমুল তাণ্ডব। ভগবানের যে বিচার আছে, সে বিষয় আর সন্দেহ নাই।

বিস্মিত দর্পনারায়ণ, এই পিতা-পুত্র প্রহসনের একমাত্র দর্শক। কিন্তু না, বোধ করি আরো একজন ছিলেন। শিল্পী যে-তৃপ্তিতে স্বনির্ম্মিত মূর্ত্তিটি দেখিতে থাকেন, সেই তৃপ্তিতেই বোধ করি জগৎ-শিল্পী এই অপূর্ব্ব প্রহসন দেখিতেছিলেন, ওই উপরে চালের বাতায় বসিয়া,—আর পাগলের কথাকে যদি বিশ্বাস করা যায়, তা হইলে বোধ হয়, ওই মুখোসটার অন্তরাল হইতে।

রাত্রিশেষের সঙ্গে সঙ্গে ছিদামের জীবন-প্রদীপের তৈল ফুরাইয়া আসিল। প্রদীপ নিভিবার পূর্ব্বে শেষবারের জন্য প্রবল দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিল। প্রবল বিকারের ঝোঁকে দর্পনারায়ণকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া ছিদাম লাফাইয়া গিয়া আব্বরকে আক্রমণ করিল, বলিল, খোল বেটা, মুখোস খোল। দৃঢ় হাতের চাপে নিঃশ্বাস রোধ হইয়া আব্বরের মরিবার উপক্রম! দর্পনারায়ণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া আব্বরকে তাহার আয়ত্ত হইতে মুক্ত করিল। নিরুপায় ছিদাম বলিল,—বেটা খোল নিজে মুখোস, খুললি নে মুখোস; দাঁড়া আমি মুখোস পরে নি। এই বলিয়া সে মুখোস আঁটিয়া লইয়া নাচিতে নাচিতে গান ধরিল,

"যাদু কথায় কি কাজ করে
যেমন যাদু করে যাদুকরে ॥
গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল
তাতে কি আশা পোরে ॥"

কি বেটা চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস, বাপ নাচছে? নাচ বেটা নাচ। এই বলিয়া সে আব্বরের হাত চাপিয়া ধরিয়া দুই জনে নাচিতে লাগিল। সে কি নাচ! একেবারে পিতাপুত্রের সম্মিলিত নৃত্য।

অবশেষে শ্রান্ত ছিদাম বিছানায় গিয়া শুইল। অনেকক্ষণ কোন সাড়া শব্দ নাই, কেবল ঘন ঘন নিঃশ্বাসের তালে জীর্ণ বক্ষের স্পন্দন। হঠাৎ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল, তার কৃশ চঞ্চল পা দুখানি খিঁচাইয়া উঠিয়া সরলভাবে পড়িয়া গেল মুখোসের আড়াল হইতে শোনা গেল,—আঃ দাদাবাবু, বাঁচতে পারলে হ'ত।

দর্পনারায়ণ বুঝিল, এইবার শেষ। এমনিই হয় বটে! জীবনের সহিত মানুষের প্রৌঢ় পত্নীর সম্বন্ধ; রাগারাগি করে, ছাড়িয়া যাইতে চায়, তবু বিপদে এবং দুঃখে তাকেই আঁকড়িয়া ধরে! আনন্দ হয় তো জীবনের পরপারে, কিন্তু সান্ত্বনা জীবনের মধ্যেই। মানুষের কাছে হয়তো আনন্দটাই বড়; কিন্তু সান্ত্বনার দৃঢ় তটভূমির আশ্রয় না থাকিলে কিছুই কিছু না।

অনেকক্ষণ শব্দ না পাইয়া, দর্পনারায়ণ মুখোস খুলিয়া ফেলিল। ভাঁড়ের মুখোসের বিকৃত হাসির অন্তরালে নিজের মুখের প্রচুর অশ্রু-চিহ্ন রাখিয়া ছিদাম চলিয়া গিয়াছে। প্রথমে দর্পনারায়ণ বুঝিতে পারে নাই লোকটা তখনও জীবিত কি মৃত! আব্বর তার গালের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখাইল—সেখানে শুঁড়-শুদ্ধ সিদ্ধিদাতা গণেশ নিশ্চল। সে চোখ বন্ধ করিয়া জিভ বাহির করিয়া বুঝাইয়া দিল, ছিদাম মরিয়াছে। ততক্ষণে প্রভাত হইয়াছে, ভোরের আলো লক্ষ্য করিয়া দাঁড়কাকটা বার কয়েক ডাকিয়া উঠিল। দর্পনারায়ণ আব্বরকে পাহারায় রাখিয়া মৃতদেহ সংকারের ব্যবস্থার জন্য বাহির হইয়া আসিল।

১৩

দর্পনারায়ণের বিবাহের কথাবার্ত্তা যতদিন চলিতেছিল, একেবারে স্থির হয় নাই, ততদিন চৌধুরীবাড়ীর কারও মনে স্বস্তি ছিল না। কালবৈশাখীর আসন্ন গুরুতা চৌধুরী বাড়ীকে ঘিরিয়া ছিল, কর্ত্তা ঝড়ের গুমোটের মত নীরব। বিনা কারণে কারও চাকরি যাইতেছে, তুচ্ছ কারণে কেহ চাবুক খাইতেছে, স্বয়ং দেওয়ানজী কয়েকবার তিরস্কৃত হইলেন, এমন কি স্বরূপ সর্দ্দারও কুণ্ঠিত ভাবে কর্ত্তার কাছে যায়। রক্ত-দহ ও জোড়াদীঘির মধ্যে ঘোড়ার ডাক বসিয়া গেল, দিনের মধ্যে দশবার চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান চলিতেছে। ঘোড়সোয়ার সুসংবাদ আনিয়াছে ভাবিয়া হাসিমুখে চিঠি দিতে গেল, চাবুক খাইয়া সে অবাক হইল, আবার যে লোকটা চিঠি দিবার পূর্ব্বে ভয়ে কাঁপিতেছিল, অপ্রত্যা-শিতরূপে সে পাইল বকশিস্। আবহ-বিজ্ঞানের ভাষায় চৌধুরীবাড়ীর আবহাওয়াকে বলা যায়—অনিশ্চিত।

সেদিন কি খবর আসিল—বৃদ্ধ উদয়নারায়ণ গেলেন বাড়ীর ভিতরে। তাঁহার ভগ্নী দ্রবময়ী তখন রান্নাঘরে বসিয়া তরকারী কুটিতেছিল, তিনি সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্রবময়ী একখানি পীঁড়ি দিয়া বলিল—দাদা বসো। তিনি রূঢ়স্বরে বলিলেন—থাক থাক হ'য়েছে। দ্রবময়ী আবার জিজ্ঞাসা করিল—দাদা ওরা কি বলল? উদয়নারায়ণের মুখ খুলিয়া গেল, সে কি ভৎ'সনা। যেমন অশ্লীল, তেমনি রূঢ়, আর তেমনি অকারণ।

দ্রবময়ী ঝর ঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল, পূর্ব্বোক্ত রকমের ও ততোধিক অশ্লীল গালির স্রোত বহিয়াই চলিল, অবশেষে দ্রবময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে পাগলের মত ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। সে চলিয়া গেলে কর্ত্তা এক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া বিরাট শব্দে হাসিয়া

উঠিলেন। সেই হাসি রাশি রাশি শুভ্র প্রসন্নতায় যেন ঘরের বায়ুমণ্ডল পূর্ণ করিয়া দিল। সে কি হাসি! শীতের শেষে হিমালয়ের চির-নীহার শিখর হইতে তুষারস্তূপ খসিয়া গিয়া পাহাড় হইতে পাহাড়ে গড়াইয়া যেমন শব্দ করে এ হাসির ধ্বনি সেই রকম। আর সেই চূর্ণীকৃত তুষারপুঞ্জ যেমন দিক্‌-বিদিক শাদা করিয়া দেয়, এ হাসির শুভ্রতা সেই রকম। কর্ত্তা বিজয়ীর মতো ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। সেই হাসির শব্দে চৌধুরীবাড়ীর বহুদিন স্থায়ী চটকা ভাঙ্গিয়া গেল। সকলে বুঝিল এখন কিছুদিন আর ভয়ের কারণ নাই; আর বুঝিল বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে।

দর্পনারায়ণের বিবাহের জন্য সেবার দুর্গোৎসব কিছু বেশি সমারোহে সম্পন্ন হইল। বিবাহের আয়োজন হইতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ এক বাধা উপস্থিত হইল। সেদিন দর্পনারায়ণ রক্তদহের বিলে হাঁস শিকার করিতে গিয়াছে—এমন সময়ে বাড়ী হইতে চাকর সংবাদ দিল, স্বরূপ সর্দ্দারের শেষ সময় উপস্থিত। দর্পনারায়ণ সংবাদ পাইয়া ঘোড়ায় ফেনা ঝরাইয়া জোড়াদীঘিতে আসিয়া পৌছিল। স্বরূপের ঘরে গেল। বৃদ্ধ তখন মুমূর্ষু। তার মৃত্যু যেমন বিনা খবরে আসিয়াছে, তেমনি বিনা চিহ্নে তার দেহে আশ্রয় লইয়াছে, দেখিয়া কিছু বুঝিবার উপায় নাই। দর্পনারায়ণ বলিল—স্বরূপ দাদা!

স্বরূপ বলিল—দাদাবাবু, তোমার বিয়ে দেখে যেতে পারলাম না।

দর্পনারায়ণ বলিল—দাদা, কথা ছিল এবার শীতকালে তোমার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ যাব।

স্বরূপ বলিল—আমার অস্থি গঙ্গায় দিতে মুর্শিদাবাদ যেয়ো, তা হলেই তোমার সঙ্গে আমার যাওয়া হবে। অধিক কথাবার্ত্তা হইতে পারিল না। সন্ধ্যায় দীপ জ্বলিবার সঙ্গে, সন্ধ্যার তারা উঠিবার সঙ্গে, দিনের আলো নিভিবার সঙ্গে, বৃদ্ধের প্রাণ নীরবে, বিনা কষ্টে, প্রায় বিনা লক্ষ্যে বাহির

হইয়া গেল। তার মুখে এমন শান্ত ভাব, মৃত্যু ও জীবনের প্রভেদ সে মুখ দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই। অন্ধকার ঘরে মৃতের পাশে দর্পনারায়ণ একাকী গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল।

১৪

স্বরূপ সর্দ্দারের মৃত্যুর পরদিনই আলিবর্দ্দি চৌধুরীবাড়ীতে দেখা দিল যেন সে এতদিন দেউড়ীর ঠিক বাহিরেই কোথাও অপেক্ষা করিতেছিল। তার শত্রুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে পুনরায় প্রভুগৃহে প্রবেশ করিল। যেদিন সে অভিমানে ও রাগে চৌধুরীবাড়ী ত্যাগ করিয়াছিল তার বয়স ছিল পঁচিশ আজ সে পঞ্চান্ন বছরের বৃদ্ধ ; ইতিমধ্যে ত্রিশ বছর চলিয়া গিয়াছে, একটা যুগ মানুষের জন্ম-মৃত্যুর মাঝে একটা জীবন।

চৌধুরীবাড়ীতেও এই সময়ের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বৃদ্ধ উদয়নারায়ণের পঞ্চান্ন বছর বয়সের উপর আরও ত্রিশটা বছর চাপিয়া বসিয়াছে ; তার চুলে এবং মুখে এই দীর্ঘকালের তুষারপাত চির-নীহারের মত শুভ্র আসন পাতিয়া দিয়াছে। বৃদ্ধের পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে এবং পৌত্র আজ বিশ বছরের যুবক। দর্পনারায়ণকে আলিবর্দ্দি ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখে নাই।

আলিবর্দ্দি যখন সদর কাছারীর আঙ্গিনায় প্রবেশ করিল, তখন ভোর বেলা, তখনো অনেকেই নিদ্রিত। দু'চারজন বরকন্দাজ যারা অত ভোরে জাগিয়া উঠিয়াছিল, তারা আলিবর্দ্দিকে চিনিতে না পারিয়া গ্রাহ্যই করিল না। একটি বিশাল বাড়ীর নির্জ্জনপ্রায় আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া সে একাকী ভাবিতে লাগিল। কালের স্রোতের মধ্যে আমরা অবিরত আছি তাই তার গতি সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই, কিন্তু হঠাৎ যখন ডাঙ্গার দিকে চোখ পড়ে তখন দেখিতে পাই, একি! ভোর বেলা

যেখানে দেখিয়াছিলাম মাটভরা ধান, এখন সেখানে দেখিতেছি প্রকাণ্ড বালুর চর। না, ঠিক সেখানে নয়! সেই শস্যের মাঠ এতক্ষণ বহুপশ্চাতে গিয়া পড়িয়াছে, ইতিমধ্যে অনেক দেশ ছাড়াইয়া আসিয়াছি। আলিবর্দ্দি বোধ হয় এই রকম কিছু একটা ভাবিতেছিল, কারণ কালের পরিবর্ত্তনটা আজ তার কাছে হঠাৎ খুব দৃঢ়ভাবে ধরা দিয়াছে। নিজের জীবনের ত্রিশটা বছর তার কাছে তত স্পষ্ট নয়, যেমন স্পষ্ট চৌধুরীবাড়ীর এই ত্রিশ বছরের ব্যবধান। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় জনশূন্য প্রাঙ্গণে একাকী দাঁড়াইয়া, হঠাৎ জীবনের দ্রুত গতিকে লক্ষ্য করিয়া তাহার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

এমন সময়ে অত ভোরে বৃদ্ধ উদয়নারায়ণ খড়মের শব্দ তুলিয়া বাহিরে আসিলেন। বৃদ্ধের দৃষ্টিশক্তি নষ্টপ্রায়, কিন্তু এবার সে ভুল করিল না। তিনি দু'একবার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ওখানে ও কেরে? আলিবর্দ্দি নাকি।

আলিবর্দ্দি চমকিয়া উঠিল; সসম্ভ্রমে অগ্রসর হইয়া আসিয়া নত হইয়া একবার সেলাম করিল—বলিল, হাঁ কর্ত্তা।

বৃদ্ধ বলিল—কখন এলি?

আলিবর্দ্দি বলিল—আজই ভোরে।

ত্রিশ বছর পরে প্রভু-ভৃত্যের এই প্রথম আলাপ। কিন্তু ইহাতে কেহ কোন প্রকার বিস্ময় প্রকাশ করিল না। যেন গত সন্ধ্যাবেলায় দুজনে দেখা হইয়াছিল, যেন ক' দিনের জন্য সে ছুটি লইয়া বাড়ী গিয়াছিল। সামান্য এই ক'টি কথায় আলিবর্দ্দি মনে ভারি সান্ত্বনা পাইল, যেন কালের এই নিয়ত সরণশীল প্রবাহের মধ্যে একটা দাঁড়াইবার স্থান মিলিল। সে জ্ঞানত না বুঝিতে পারিলেও অস্পষ্টভাবে বুঝিল কালের গতিটাই একমাত্র সত্য নয়, কাল যতই প্রবল হ'ক না কেন, দু'চারটি জিনিষ আছে যাকে সে নড়াইতে পারে না। আজ তেমনি একটা আশ্রয় সে পাইয়াছে।

উদয়নারায়ণ বলিলেন—ভালই হল। তোর কথাই ভাবছিলাম।

আলিবর্দ্দি বলিল—আমি ত আসবার জন্য তৈরী হয়েই ছিলাম—কেবল আমার দুষমণটার জন্যই এতদিন আসতে পারিনি।

উদয়নারায়ণ—ও এখনো তার উপরে তোর রাগ আছে দেখছি। না, রে সে খুব ভাল লোক ছিল। ওই দেখ আঙিনার কোণে তোর সড়কি আজও তেমনি পোঁতা রয়েছে!

আলিবর্দ্দি তা লক্ষ্য করে নাই বটে, বোধ করি ভুলিয়াই গিয়াছিল। সেই ত্রিশ বছর আগে প্রভুগৃহ ত্যাগ করিবার ক্ষণে ক্রোধে এবং দম্ভে যে সড়কি সে মাটিতে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। সেই সড়কি একটানে তুলিবার জন্য তার নবাগত দুষমণকে সে সদম্ভে আহ্বান করিয়াছিল। সেই সড়কি আজও তেমনি পোঁতা রহিয়াছে। কেহই তা তুলিতে পারে নাই, এমন কি স্বরূপ সর্দ্দারও নয়। আলিবর্দ্দির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মনে হইল হঠাৎ তাহার বয়স যেন কমিয়া আবার পঁচিশের কাছে গিয়া ঠেকিয়াছে। সে যেন আপন মনে বলিয়া উঠিল—আল্লা হাকিম! তারপরে বৃদ্ধের দিকে তাকাইয়া বলিল—কর্ত্তা, যে-হাতে আপনার সম্মুখে সেদিন এই সড়কি পুঁতেছিলাম, আজ সেই হাতেই আপনার সম্মুখে আজ তা তুলব।

তারপরে কি ভাবিয়া সে যেন থামিল, ধীরে ধীরে বলিল, আর না তুললেই বা কি ক্ষতি! আমার দুষমণ ত তুলতে পারে নি।

না তুলিবার কথা সে মুখে বলিল বটে, কিন্তু তুলিবার জন্যই যেন সড়কির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন উদয়নারায়ণ যে-কথা ত্রিশ বছর কারও কাছে প্রকাশ করেন নাই, আলিবর্দ্দিকে তা বলিলেন। বৃদ্ধ আরম্ভ করিলেন—

শোন্, স্বরূপ তোর সড়কি তোলেনি বটে, কিন্তু তা শক্তির অভাবে

নয়। সড়কি তুললে তোর গর্ব্বে আঘাত লাগবে বলেই সে ইচ্ছা করে তোলেনি।

আলিবর্দ্দি অবিশ্বাসমিশ্রিত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাইল, যেন তার দৃষ্টি বলিতেছে, না কর্ত্তা, অত শক্তি তার ছিল না। উদয়নারায়ণ তার চাহনির অর্থ যেন বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—আমি জানি তার শক্তি অনেক বেশী ছিল। প্রভুর কথা আলিবর্দ্দি অবিশ্বাস করিতে পারিল না। সে হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। বৃদ্ধ ধীরে ধীরে একে একে স্বরূপ সর্দ্দারের কথা হইতে আরম্ভ করিয়া এই ত্রিশ বছরের কাহিনী বলিয়া গেলেন। কথা শেষ হইলে আলিবর্দ্দিকে বলিলেন—কি রে সড়কিটা তুলবি না কি? তোর জিনিষ তুই-ই তুলে ফেল। কিন্তু এবার আর তার মুখে দম্ভের চিহ্ন দেখা গেল না। সে বলিল—না কর্ত্তা, যেখানে সর্দ্দার ইচ্ছা করে হার মেনেছে, তার উপর আমি হাত দিয়ে আর অপরাধ বাড়াব না। এই বলিয়া সে অনুত্তোলিত সড়কির দিকে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া স্বরূপ সর্দ্দারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তিনবার সেলাম করিল।

১৫

অবশেষে স্বরূপ সর্দ্দারের অস্থি গঙ্গায় দিবার জন্য যাত্রার দিন উপস্থিত হইল। জোড়াদীঘি অঞ্চলের লোক গঙ্গাস্নানের জন্য মুর্শিদাবাদে যাইত। সেখানেই যাওয়া স্থির হইল। দর্পনারায়ণ স্বরূপ সর্দ্দারের মৃত্যু-শয্যায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তার অস্থি নিজে গিয়া গঙ্গায় দিয়া আসিবে। একে সর্দ্দারের অস্থি, তার উপরে দর্পনারায়ণ তার উদ্যোক্তা, কাজেই যাত্রার আয়োজন ভাল ভাবেই হইল।

তখনকার দিনে যাতায়াত এত অনায়াসে ছিল না, বিপদ ছিল, খরচ

ছিল, তাই লোকে কালে ভদ্রে দূরদেশে যাইত। সকলেই এই রকম একটা সুযোগের জন্য অপেক্ষা করিত।

জোড়াদীঘির চৌধুরীদের আর যে-খ্যাতিই থাকুক, ধর্ম্মপরায়ণতার খ্যাতি ছিল না। তাঁরা কদাচিৎ তীর্থ-যাত্রা করিতেন। একবার বছর ত্রিশ আগে উদয়নারায়ণ কাশীধামে গিয়াছিলেন, গাঁয়ের অনেক লোক তাঁর সঙ্গে যাইবার সুযোগ পাইয়াছিল! বৃদ্ধেরা আজও সেই কথা আলোচনা করিয়া থাকে। কাশী, প্রয়াগ, গয়া তো দূরের কথা, নিকটতর মুর্শিদাবাদে গঙ্গাস্নানের জন্য বছর পাঁচেকের মধ্যে তেমন বড় কেউ যায় নাই। এবার এই সুযোগ পাইয়া গাঁয়ের অনেক লোক জমিদারের সহযাত্রী হইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিল।

এই তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। কথাটা অবান্তর হইতে পারে, কিন্তু জীবনটাই তো এমনি অবান্তরতার একটা মালা।

আমার একটি বন্ধু ছিলেন তিনি ভূতের গল্প বলাতেই যেন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। প্রত্যেকবার ভূতের গল্প আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তিনি এই রকম একটা ভূমিকা করিতেন। "আজ কাল ভাই ভূতের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে, কি আর ছাই বলব! তোমরা ভাব্‌ছ ভূতের সংখ্যা আবার কমে কিসে? তবে শোন, গয়ায় পিণ্ড দিলে প্রেতাত্মার উদ্ধার হয়। সেকালে যখন রেল-ষ্টীমার ছিল না, পিণ্ড দান করতে লোকের পক্ষে গয়ায় যাওয়া এত সহজ ছিল না। কাজেই প্রেতাত্মার দল বাধ্য হ'য়ে বাড়ীর পাশে বেল গাছ, নিমগাছ, বট, অশথে বাস করত। সে-ই ছিল বটে ভূতের গল্প বলবার যুগ। আর আজকালকার দিনে মানুষ মরতে না মরতেই লোকে গয়ায় গিয়ে চট্‌ করে' পিণ্ড দিয়ে ফেলছে, ভূত আর কই থাকতে দিল।', এই বলিয়া তিনি নিতান্ত বিষণ্ণ ভাবে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতেন। ভাবটা যেন, তাঁর হাতে রাজশক্তি থাকিলে রেল ষ্টীমার তুলিয়া দিতেন, অন্তত গয়ায় যাওয়া যে দুরূহ করিয়া তুলিতেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ভূতের কথা সম্বন্ধে একথা খাটে কি না আমার বন্ধুই জানেন, কিন্তু সেকালের গঙ্গাস্নানের সুযোগ এত অনায়াস ছিল না, বোধ করি তা ভালই ছিল। অনেকের পক্ষে জীবনেও একবার গঙ্গাস্নান ঘটিয়া উঠিত না। তাই লোকে দুষ্কার্য্য একটু বুঝিয়া সুঝিয়া করিত; জানিত চট্ করিয়া পাপের ভার গঙ্গায় বিসর্জ্জন দেওয়া চলিবে না। এখন স্থান-বিশেষে দুবেলা পাপের ভার গঙ্গায় দেওয়া যায়। বোধ হয় অনায়াস-সুযোগলব্ধ বহু যাত্রীর পাপের মালিন্যেই গঙ্গায় চর পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। গঙ্গাতীরের লোকেরাই পাপ সব চেয়ে বেশী করে এবং গঙ্গা হইতে যত দূরে যাওয়া যায়, লোকে তত সংযত হইয়া জীবন যাপন করে, গঙ্গা তাদের সহজ প্রাপ্য নয়।

পূজার পরে কার্ত্তিক মাসের প্রারম্ভে একদিন প্রভাতে জোড়াদীঘির ঘাটে একখানা বজরা ও খান তিনেক বড় ঢাকাই নৌকা আসিয়া জুটিল। আর নদীর ঘাটে গায়ের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল।

বড় বজরা খানা দর্পনারায়ণের জন্য। মাঝি-মাল্লা ছাড়া কেবল আলিবর্দ্দি সর্দ্দার সেই নৌকায় স্থান পাইল, এই কয়দিনেই সে অতি সহজে স্বরূপ সর্দ্দারের স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে।

একখানা নৌকায় চাকর, বামুন ও রান্নার আয়োজন। এক খানায় জনকয়েক লাঠিয়াল, পথে বিপদের আশঙ্কা সর্ব্বদা আছে। আর এক-খানাতে জোড়াদীঘির অদ্বিতীয় পণ্ডিত শরৎচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয় কোন রকমে একটু স্থান করিয়া লইয়াছেন। তাঁর বিশ্বাস এ সৌভাগ্যটুকুর মূলে তাঁর সেই দূরদৃষ্টি, যে দূরদৃষ্টির বলে তিনি দর্পনারায়ণকে কোন দিন পাঠশালাতে প্রহার করেন নাই। এই নৌকায় আর একজন যাত্রীকেও পাঠকের মনে থাকিতে পারে, তিনিও দর্পনারায়ণের শিক্ষক ছিলেন বটে। তাঁর নাম বাণীবিজয় শর্ম্মা। সত্য কথা বলিতে কি, এই উঠতি বয়সে তাঁর গঙ্গাস্নানে যাইবার তেমন ইচ্ছা ছিল না, বিশেষ পুঁটি নাম্নী

সেই গোপবালা ইতিমধ্যেই অল্প বয়সে বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু, গঙ্গাতীরে শাস্ত্রীয় কার্য্যের জন্য একজন পুরোহিত দরকার, কাজেই বাণীবিজয় শর্ম্মা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুখে একখানি আঠার ইঞ্চি হাসি বিকসিত করিয়া পুটলি-পোটলা লইয়া নৌকায় চাপিলেন। আর একখানা নৌকায় গ্রামের একদল লোক পুণ্যসঞ্চয় ও পাপমোচনের জন্য জমিদারের সঙ্গ লইয়াছে।

বৃদ্ধ উদয়নারায়ণ ঘাট পর্য্যন্ত আসিলেন। দর্পনারায়ণ তাঁর পদধূলি লইলে বৃদ্ধ বলিলেন, দাদা, তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে ফিরো; অগ্রাণ মাসেই কিন্তু রক্তদহের রক্তকমলকে ঘরে আনব। আর দেরী নয়। দর্পনারায়ণ হাসিল, নাতিকে বিদায় দিতে দিতে বৃদ্ধের চোখ ছল ছল করিল।

দর্পনারায়ণ নৌকায় উঠিলে বৃদ্ধ মাঝিদের ইঙ্গিত করিলেন, অমনি নৌ-বহর ডঙ্কার শব্দ করিয়া বাঁধন খুলিয়া দিল। উত্তরে বাতাসে পাল ফুলিয়া উঠিল, জল কল কল করিয়া উঠিল, আর কয়েকখানি নৌকা সগর্ব্বে পাল ফুলাইয়া ধীরগতিতে ভাসিয়া চলিল।

জোড়াদীঘির জনতা তীরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, নৌকার আকার ক্রমে কমিয়া আসিতেছে, দূরে হঠাৎ নৌকাগুলি নদীর বাঁক ঘুরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল বজরাখানির মাস্তুলের খুঁটির আগাটা দৃশ্যমান—বৃদ্ধ উদয়নারায়ণের দৃষ্টি তার সহিত লগ্ন। ক্রমে সেটুকুও অদৃশ্য হইয়া গেল। গাঁয়ের লোক একে একে ফিরিতে লাগিল। আসিবার সময়ে এই পথখানি উদয়নারায়ণ নাতির সঙ্গে গল্প করিতে করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু ফিরিবার সময়ে সেই পথটুকু আর হাঁটিয়া ফিরিতে পারিলেন না, পাল্কী বেহারা সঙ্গে ছিল, তিনি পাল্কীতে উঠিয়া বসিলেন। পাল্কীতে উঠিয়া একবার নদীর বাঁকের দিকে চাহিলেন, সেখানে কিছু নাই। তিনি সশব্দে পাল্কীর দরজা বন্ধ করিয়া বেহারাদের হুকুম করিলেন, তাড়াতাড়ি চল।

পলাশী

১

ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে পলাশী নামে এক মাঠ আছে, ছিল বলাই উচিত, কারণ অনেক দিন হইল তা নদীতে ভাঙিয়া গিয়াছে, কিন্তু না থাকিলেই বোধ হয় ভাল ছিল। এই মাঠে একদা এক প্রহসনের অভিনয় হইয়াছিল, বাঙালীর পক্ষে তার ফল অত্যন্ত ট্র্যাজিক হইয়াছে। ইংরাজের লেখা ইতিহাসে ইহা পলাশীর মহাযুদ্ধ বলিয়া বর্ণিত।

ক্লাইভ ও সিরাজদ্দৌলা। ব্যক্তিগত ভাবে এরা কেহই মহাপুরুষ নয়; জীবন-রঙ্গমঞ্চের প্রধান অভিনেতাদের সঙ্গে এদের সমান আসন পাইবার যোগ্যতা নাই। কিন্তু, ইতিহাসের বিধাতা রসিক পুরুষ, মাঝে মাঝে তিনি ছোট লোককে দিয়া বড় কাজ করাইয়া থাকেন। ভারত ইতিহাসের পাদটীকায় বর্জ্জ...স্ অক্ষরে যে এখনো এ দুটি নাম দৃষ্ট হয়, তার কারণ আর কিছুই নয়, ইতিহাসের এক যুগসন্ধিকালে এই দুই জনের উপরে গুরুতর ভার অর্পিত হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জ্জুন, কৃষ্ণ প্রভৃতি মহারথ ও মহাপুরুষেরা থাকা সত্ত্বেও একবার শিখণ্ডীর ডাক পড়িয়াছিল। ক্লাইভ ও সিরাজদ্দৌলা যুগ্ম শিখণ্ডী। কার মুখপাত্র এই দুই শিখণ্ডী? দুই ভিন্ন দেশীয় জীবনতন্ত্রের। ক্লাইভ ইউরোপীয়

জীবনতন্ত্রের প্রতীক, সিরাজ ভারতীয়। পলাশীর যুদ্ধে ইউরোপীয় ফিলজফির নিকটে ভারতীয় ফিলজফির পরাজয়। কে বলিল, পলাশীর যুদ্ধ মহাযুদ্ধ নয়।

গীতার প্রথম দুটি শব্দ "ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে" ভারতবর্ষের ইতিহাসকে যেমন প্রভাবিত করিয়াছে, এমন আর কিছু নয়। ওই ধর্ম শব্দটির নাম-মাহাত্ম্যে যুদ্ধকে ভারতবর্ষের লোকেরা হাডু-ডু-ডু খেলা মনে করিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে দল ভাগ করিয়া লইয়া খেলা চলিবে, যুদ্ধ ভাঙিয়া গেলেই আবার শত্রু-মিত্র একজায়গায় গিয়া বসিবে। যুদ্ধের যে একটা নেপথ্য-বিধান আছে, এমন কি নেপথ্য-বিধানটাই যে যুদ্ধক্ষেত্রের চেয়ে বড়, এ কথাটা ভারতীয় মনে তেমন করিয়া ধরা পড়ে নাই। যাত্রার আসরে নেপথ্য নাই, ভীমের গর্জ্জন ও অধিকারীর হুঁকার শব্দ একই সঙ্গে ধ্বনিত হইতে সেখানে বাধা নাই। ভারতীয় মন এইরূপ যাত্রার আসর। সেই জন্য নেপথ্যে কিছু ঘটিলে সে বিব্রত হইয়া পড়ে, তাকে অন্যায় যুদ্ধ বলে, তার মনে পড়িয়া যায় 'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে'। সেই জন্য সেকেন্দার শা বিখ্যাত নৈশ অভিযানে শতদ্রু পার হইলে, মহাবীর পুরু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জন্য আকবর মশালের আলোকে শত্রুসেনাপতিকে শরবিদ্ধ করিলে, সে নিশ্চয় ভাবিয়াছিল, গীতায় তো এমন ব্যাপার নাই।

না, গীতার দোষ নয়, গীতা বুঝিবার দোষ। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের মত এমন অন্যায় যুদ্ধ কদাচিৎ দেখা যায়। প্রথমেই দেখ, এক দলে সাত অক্ষৌহিণী, অন্য দলে একাদশ—অধর্ম্মের সূত্রপাত। অর্জ্জুনের সম্মুখে শিখণ্ডীকে দাঁড় করিয়া ভীষ্মকে নিহত করা হইল। স্বয়ং কৃষ্ণ অস্ত্রধারণ করিবেন না বলিয়া রথচক্র ধারণ করিলেন, ইহাতে তাঁর সুবিধাই হইয়াছিল, কারণ চক্রই ছিল তাঁর অস্ত্র। জয়দ্রথ বধের ষড়্‌যন্ত্রটাও বোধ করি ধর্ম্মযুদ্ধ নয়। আর, অভিমন্যুবধকে কি বলিব?

শ্রীকৃষ্ণের বাস্তব জ্ঞান ছিল। বস্তুসম্বন্ধহীন আদর্শবাদ তিনি পছন্দ

করিতেন না। তিনি জানিতেন, জীবন-রঙ্গমঞ্চ দৃশ্য-আসর ও অদৃশ্য-নেপথ্যের সমাবেশ। আসরে যার অভিনয়, নেপথ্যে তার বিধান। মহাভারতের পর হইতে ভারতীয় মন ক্রমে বস্তুসম্বন্ধহীন আদর্শবাদের উপাসক হইয়া উঠিয়াছে, সেই জন্যে মহা-ভারত গঠন সম্ভব হয় নাই।

ইউরোপীয় মন বস্তুসম্বন্ধযুক্ত তা নিছক আদর্শকে পছন্দ করে না। সেই জন্যই ক্লাইভ যুদ্ধক্ষেত্রের পূর্ব্বাহ্নে পরম যত্ন সহকারে নেপথ্য-বিধান করিয়াছিল—তাকে ষড়্‌যন্ত্র বল, নীচতা বল, বিশ্বাসঘাতকতা বল, হয় তো সব সত্য; কিন্তু ওসব না হইলে যুদ্ধ-জয় হয় না। ইউরোপীয় মানুষ যুদ্ধজয়কেই লক্ষ্য মনে করে, কেমন করিয়া সে জয় হইল—সে প্রক্রিয়াকে নয়। ভারতবর্ষেয় মানুষ প্রক্রিয়াটা ধর্ম্মানুযায়ী হইল কি না দেখে, সেই জন্য অভারতীয় জাতির সঙ্গে যুদ্ধে, ইতিহাসের যুগসন্ধির সবগুলি যুদ্ধেই—ভারতবাসী পরাজিত হইয়াছে।

আজ যাদের বিশ্বাসঘাতক বলিয়া নিন্দা করিতেছি, তারা হয় তো তত নিন্দার পাত্র নয়। তারা ভাবিয়াছিল, ক্লাইভকে দিয়া সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবে। তারা যদি জানিত যে, ইহাতে সিংহাসন যাইবে, বাণিজ্য যাইবে, তবে ব্যবসায়ী জগৎ শেঠ ও মুসলমান মীরজাফর এমন কাজ করিত কি না সন্দেহ। এখানেও দেখি জীবনে সেই বস্তুতন্ত্রতার অভাব।

পলাশীর মাঠে আরও একটি পরীক্ষা হইয়াছিল।

লোকে বলে ভারতবাসী এক হইতে পারে না। কথাটা নিছক নিন্দা। এই মাঠেই একদিন হিন্দু রায়দুর্লভ, জৈন জগৎ শেঠ, মুসলমান মীরজাফর ও খৃষ্টান ক্লাইভ এক হইয়াছিল। সেই ঐক্যের ফলভোগ আজও আমরা সবাই করিতেছি। বিধাতা করুন, এমন ঐক্য আর যেন না ঘটে।

২

বাইশে জুন বুধবার ক্লাইভ সসৈন্যে ভাগীরথীর পশ্চিম তীর ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বতীরে উপস্থিত হইতে মনস্থ করিল। বিকাল চারিটার সময় ইংরাজবাহিনী নদী অতিক্রম আরম্ভ করিল! সেদিন সন্ধ্যা হইতে আষাঢ়ের বর্ষণ আরম্ভ হইল, বর্ষার নদী তীরে নীরে একাকার হইয়া গেল। মেঘাড়ম্বরে ও গর্জ্জনে, অন্ধকারে ও বৃষ্টিতে ক্লাইভের গতি নবাব-সৈন্য জানিতে পারিল না। সেনাদল পূর্ব্বতীরে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোত্তর দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। কাদায় কামানের চাকা, পদাতিকের পা পুতিয়া যাইতে লাগিল। কোন ক্রমে রাত্রি একটার সময়ে ইংরাজ সেনাপতি সসৈন্যে একটি আমবাগানের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইল। শেষ রাত্রে বাদল থামিয়া গেল, মেঘের গর্জ্জন বন্ধ হইল, শিবিরের মধ্য হইতে ক্লাইভ আর একটি শব্দ শুনিল; মেঘগর্জ্জন অপেক্ষা যা ভীষণতর বোধ হইল। ক্লাইভ কান পাতিয়া শুনিল, দূরে পূর্ব্বোত্তর দিক্ হইতে সেই শব্দ আসিতেছে। ক্লাইভ বুঝিল, তার আগেই আসিয়া নবাব শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে।

তেইশে জুন বৃহস্পতিবার। অতি প্রত্যুষে নির্ম্মল আকাশে সূর্য্যোদয় হইল। ভাগীরথী উত্তর-দক্ষিণবাহিনী। ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে বিস্তৃত প্রান্তর। এই মাঠের দক্ষিণ অংশে নদীতীরে পলাশী গ্রাম।

এই গ্রামের নামে প্রান্তরটি পরিচিত, পলাশীর মাঠ। নদীর ধারে কেহ পূর্ব্বমুখ হইয়া দাঁড়াইলে সেদিন যে দৃশ্য দেখিতে পাইত, তা বর্ণনা করিব। আজ তার কিছুই অবশিষ্ট নাই। আজ বাহিরে আছে মানচিত্র, আর অন্তরে অপমানের চিত্র।

এই মাঠের মাঝখানে, পলাশী গ্রামের উত্তরে, আমবাগান। বাগানটি দৈর্ঘ্যে আধ মাইল, প্রস্থে পোয়া মাইলেরও কম। উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে গঙ্গার দূরত্ব পঞ্চাশ গজের অধিক নয়। আমবাগানের পশ্চিম-

উত্তর কোণে ঠিক নদীর উপরে ইষ্টকনির্ম্মিত একটি উচ্চ মৃগয়ামঞ্চ। আমবাগানের আধ মাইল উত্তরে দুইটি পুষ্করিণী, একটি বড়, একটি অপেক্ষাকৃত ছোট। মৃগয়ামঞ্চ ও পুষ্করিণীদ্বয়ের মাঝখানে গোটাদুই ইটের পাঁজা। পুকুর দুটির আধমাইল উত্তরে একটি মাটির টিলা, জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এই টিলার ঠিক উত্তরেই নবাবের ছাউনি, ছাউনির সম্মুখে নদীর তীর হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত পরিখা।

অতি প্রত্যুষে দুই দলের সৈন্য-সমাবেশ আরম্ভ হইল। ইংরাজ সৈন্য আমবাগানের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া উত্তরমুখ হইয়া ব্যূহ রচনা করিল। মাঝখানে গোরা সৈন্য, সংখ্যায় এক হাজার, বামে ঠিক গঙ্গার উপরে এক হাজার দেশীয় সৈন্য, দক্ষিণে আর এক হাজার দেশীয় সৈন্য। গোরা সৈন্যের দুই পার্শ্বে তিনটি করিয়া কামান। পূর্ব্বোক্ত মৃগয়ামঞ্চ ও তিন দল সৈণ্য সমসূত্রে অবস্থিত। মৃগয়ামঞ্চের উপরে ক্লাইভ দণ্ডায়মান।

মৃগয়ামঞ্চ হইতে ক্লাইভ দেখিতে পাইল, নবাবসৈন্য পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় পরিখার ছাউনি ত্যাগ করিয়া বাহির হইতে লাগিল। তারা উত্তর-দক্ষিণে লম্বমান হইয়া বলাকামালার ন্যায় অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ব্যূহ রচনা করিল। দক্ষিণ প্রান্তে রাজা দুর্লভ রায়, মাঝখানে ইয়ার লতিফ, বাম প্রান্তে স্বয়ং মীরজাফর। ক্লাইভ দেখিল, ক্রোশব্যাপী নবাবব্যূহের বামপ্রান্ত আমবাগানের দক্ষিণ দিক্ প্রায় বেষ্টন করিয়া ধরিল। ক্লাইভ দেখিল, মাটির টিলা ও বৃহত্তর সরোবরটির মাঝের ভূখণ্ডে আর একদল পদাতিক সৈন্য, সংখ্যায় পাঁচ-সাত হাজার হইবে। সেই সৈন্যদলের সম্মুখে কয়েকটি কামান ও একদল গোলন্দাজ সৈন্য—মীরমদন ও মোহন-লালের অধীনে। বড় পুকুরটির উচ্চ পাড়ের উপরে আর একদল মুষ্টিমেয় গোলন্দাজ সৈন্য, সংখ্যায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের বেশি নয়, ফরাসী সেনাপতি সিনফ্রে তার নেতা, সৈন্যেরাও ফরাসী জাতীয়, কামানগুলিও ফরাসীদের। ক্লাইভ দেখিল, তার সম্মুখে নবাবের বিশ্বস্ত মোহনলাল,

মীরমদন, সিনফ্রের অধীনে পাঁচ-সাত হাজার সৈন্য; আর তাকে প্রায় বেষ্টন করিয়া গোপনে চুক্তিবদ্ধ মীরজাফর, ইয়ার লতিফ ও রায়দুর্লভ। তাদের সৈন্যসংখ্যা পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ চল্লিশ হাজারের মত। ক্লাইভ ভাবিল, যদি এরা গোপন চুক্তি অনুসারে না চলে! ক্লাইভ ভীত হইল।

৩

বৃহস্পতিবার সকাল আট ঘটিকার সময় সিনফ্রের গোলন্দাজ সৈন্য কামানে অগ্নি সংযোগ করিল; ফরাসীর কামানের সঙ্গে তাল রাখিয়া মীরমদনের কামান কড় কড় করিয়া ডাকিয়া উঠিল (ইংরাজের কামান প্রত্যুত্তর দিল। মুহুর্মুহু উভয় পক্ষের কামান ডাকিতে লাগিল, বিদ্যুৎ স্ফুরণ করিতে লাগিল, ধূম বিস্তার করিতে লাগিল এবং লৌহহলাহল বৃষ্টি করিতে লাগিল। মুহুর্মুহু উভয়পক্ষের সৈন্য হতাহত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ক্লাইভ মৃগয়ামঞ্চে; সিনফ্রে মীরমদন বৃহত্তর পুকুরের উচ্চ পাড়ের উপরে; মধ্যস্থ ভূখণ্ড বারুদের ধূমে আচ্ছন্ন।

আধ ঘণ্টা এই রকম চলিল। ক্লাইভ দেখিল, দশজন গোরা সৈন্য ও বিশজন কালা সিপাহি হতাহত হইয়াছে, শত্রুপক্ষের কামান এই অনুপাতে ধ্বংস সৃষ্টি করিতে থাকিলে বেশিক্ষণ যুদ্ধ করা সম্ভব হইবে না। সেনাপতির আদেশে ইংরাজ সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ ভাবে পিছু হটিয়া আমবাগানের মধ্যে আশ্রয় লইল। ইংরাজ সৈন্য পিছু হটিয়া জয় লাভ করে। সাহসের বিকার দুঃসাহস। যুদ্ধের নিয়ম ও সম্ভাব্যতা অনুসারে ক্লাইভের হারা উচিত ছিল। যত রকমে যুদ্ধজয়ের নিয়ম ভঙ্গ করা সম্ভব, ক্লাইভ তাহা করিতে ত্রুটি করে নাই। প্রবল শত্রুর সম্মুখে বিস্তৃত নদী পার হইবার মত বিপদ অল্পই আছে—ক্লাইভ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করে নাই; বিস্তৃত নদী পশ্চাতে রাখিয়া শত্রুর সম্মুখীন হওয়া সমস্ত যুদ্ধরীতির বিপরীত—ক্লাইভ তাহাতে পশ্চাদপদ হয় নাই;

ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে আমবাগানের দক্ষিণ দিয়া ফিরিবার যে-পথ ছিল মীরজাফরের সৈন্য প্রায় তাহা অধিকার করিয়াছিল; সামান্য একটু ইচ্ছা করিলে অনায়াসে অধিকার করিতে পারিত; আর তিন হাজার মাত্র পদাতিক লইয়া পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের সম্মুখে কেবল বীর্য্যের ভরসায় উপস্থিত হওয়া উচিত নয়; ক্লাইভ অবশ্য যোগ্য বিধান করিয়া রাখিয়াছিল; সৌভাগ্যের বিষয়, বিপদের গুরুত্ব অনুমান করিবার মত বুদ্ধি ইংরাজ সৈন্যের নাই; তারা চরম দুঃসাহসিকতা করে; পিছু হটে; পালানো উচিত কি না বুঝিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে; দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মরে; অবশেষে শত্রুসৈন্য বিশ্রাম করিবার জন্য শিথিল ব্যূহ হইলে ইংরাজ সৈন মহা-বিক্রমে আক্রমণ করে; এবং যুদ্ধ জয় করে; ইহাই সংক্ষেপে ইংরাজ সৈন্যের যুদ্ধ করিবার রীতি ও ইতিহাস; বড় বড় যুদ্ধের উপাদান বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে বীরত্ব ও নির্ব্বুদ্ধিতা সমান অংশে মিশ্রিত।

ক্লাইভের সৈন্য আমবাগানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বসিয়া পড়িল—কেবল গোটা দুই কামান বাহিরে থাকিয়া শত্রুসৈন্যকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিল। ইংরাজ সৈন্যের পৃষ্ঠভঙ্গে নবাবের গোলন্দাজ সৈন্য দ্বিগুণ উৎসাহে লৌহ বৃষ্টি করিতে লাগিল, কিন্তু শত্রুসৈন্যের তাহাতে বেশি ক্ষতি হইল না। নবাবের তোপমঞ্চগুলি চারি হাত উঁচু, কামানের গোলা আম বাগানের মধ্যে না পড়িয়া উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।

ক্লাইভ সামরিক সভা আহ্বান করিয়া স্থির করিল যে দিনমানটা আমবাগানে লুকাইয়া থাকা যাক। রাত্রির অন্ধকারে অনবহিত নবাব-সৈন্যকে আক্রমণ করিয়া বীরত্ব প্রদর্শন করিলেই চলিবে। তখন বেলা এগারটা। এমন সময়ে একটি ঘটনা ঘটিল, যাতে, যুদ্ধের রূপ সম্পূর্ণ বদলিয়া গেল। ইংরাজ বা নবাব পক্ষ কেহই ইহার জন্য দায়ী নয়, কিন্তু উভয় পক্ষই ইহার ফল ভোগ করিল।

হঠাৎ আষাঢ়ে আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ দেখা দিল; একঘণ্টা ধরিয়া প্রবল বর্ষণ হইল। নবাবের বারুদ ভিজিয়া গেল; ইংরাজ পক্ষের বারুদ সুরক্ষিত ছিল, ভিজিল না। সামান্য বিষয়েই অসামান্যত্ব ধরা পড়ে। নবাবের পক্ষে কাহারো তেরপলের কথা মনে পড়ে নাই; ক্লাইভের আর যে-ত্রুটিই থাক, বড় বড় সত্যকে সে তুড়ি মারিয়া লঙ্ঘন করিয়াছে, তুচ্ছ তথ্যকে কখনো অবহেলা করে নাই।

মীরমদন দেখিল বারুদ ভিজিয়া গিয়াছে, কামান চলিতেছে না, বুঝিল ইংরাজী পক্ষেরও একই দুর্দ্দশা। তখন সে একদল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আমবাগান আক্রমণ করিবার জন্য যাত্রা করিল। ইংরাজ সৈন্য বন্দুকে গুলি ভরিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। মীরমদন-চালিত অশ্বারোহী সৈন্য ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, স্পষ্টতর হইতে লাগিল, অশ্বের পদধ্বনিতে আমবাগান ধ্বনিত হইল, ক্রমে যখন অশ্বের পদধ্বনিতে আমবাগানের ভূমিখণ্ড প্রকম্পিত হইয়া উঠিল, তখন হুকুম আসিল—"বন্দুক চালাও"। সহস্র বন্দুক ধূমোদ্গীরণ করিল, সহস্র গুলি মৃত্যু নিক্ষেপ করিল; অতি নিকট হইতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মীরমদনের অশ্বারোহী ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। অশ্বের হ্রেষা, আহতের আর্ত্তনাদ, বারুদের ধোঁয়া। ধূম অপসারিত হইলে দেখা গেল, মীরমদন খাঁ ছিন্নবাহু হইয়া অশ্বের কাঁধের উপরে ঝুলিতেছে। সৈন্যেরা নিকটে গেলে মীরমদন বলিল—আমাকে ধরিয়া নবাবের শিবিরে লইয়া চল।

৪

আহত মীরমদন নবাব-শিবিরে নীত হইয়া নবাবের সম্মুখে স্থাপিত হইল। নবাব চমকিয়া উঠিল! মীরমদনের মৃত্যুতে যুদ্ধের মোড় ফিরিয়া গেল। সে সাংঘাতিকভাবে আহত না হইলে সেদিনের যুদ্ধে ক্লাইভ জয় লাভ করিতে পারিত না; মীরজাফর অস্ত্র চালনা না করিলেও ক্লাইভের পরাজয় ঘটিত। নবাব সমস্ত বুঝিল। মীরমদন নবাবকে বলিল

যে, তার আর যুদ্ধ করিবার শক্তি নাই, এবার মীরজাফরকে সৈন্য চালনা করিবার হুকুম দেওয়া হোক। নবাব মীরজাফর খাঁকে ডাকিয়া পাঠাইল।

মীরজাফর অনেক ইতস্তত করিয়া, অনেক বিলম্ব করিয়া, অতি সাবধানে পুত্র মীরণ ও পাত্রমিত্র সঙ্গে করিয়া নবাব-শিবিরে উপস্থিত হইল। নবাব তার পায়ের কাছে মাথার উষ্ণীষ রাখিয়া বলিল—জাফর আলী খাঁ, এই এই উষ্ণীষের সম্মান রক্ষা কর। মীরজাফর পাকা শিল্পী—সে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অবনতভাবে উষ্ণীষের প্রতি কুর্ণিশ করিয়া নবাবকে বলিল—সৈন্যেরা আজ বড় পরিশ্রান্ত। আজ যুদ্ধ থাকুক, কাল প্রাতে লড়াই ফতে করিয়া দিব। নবাব বলিল—এখন যুদ্ধে বিরতির হুকুম দিলে সৈন্যেরা হতাশ হইয়া পড়িবে; বিশেষ, নৈশরণে ইংরাজ শিবির অক্রমণ করিতে পারে; মীরজাফর আত্মপ্রত্যয় মিশ্রিত গর্ব্বের সহিত বলিল—তবে আমরা আছি কেন? মীরজাফর আরো বলিল—মোহনলাল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতেছে, তাকে ফিরিবার হুকুম দেওয়া হোক। নবাবের বুদ্ধির ভ্রংশ ঘটিল, মোহনলালকে নিষেধ করিয়া দূত প্রেরিত হইল।

৫

মোহনলাল মীরমদনকে আহত হইতে দেখিয়া নবাবের শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। নবাবের সঙ্গে মীরমদন খাঁর কথা শেষ হইলে শিবিরের বাহিরে একটি ছায়া-শীতল বৃক্ষের নীচে তাহাকে শায়িত করিয়া দিল। তারপরে তার সঙ্গে গোটা দুই কথা বলিয়া যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইল।

মোহনলালের রক্তে তখন জ্বালা ধরিয়াছে—মীরজাফরের প্রতি ধিক্কার নবাবের প্রতি কৃপা এবং মীরমদনের প্রতি সগর্ব্ব সমবেদনা মিলিয়া তাকে

উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। সিনফ্রের সহিত পরামর্শ স্থির হইল, ফরাসী গোলন্দাজ সৈন্য আমবাগানের উত্তর দিকে গোলাবৃষ্টি অরম্ভ করিবে এবং মোহনলাল নিজে হাজার অশ্বারোহী লইয়া আমবাগানের পূর্ব্বদিকে আক্রমণ করিবে। উভয় দিক্ হইতে আক্রান্ত হইলে ইংরাজ সৈন্যের পরাজয় নিশ্চিত।

তখন সুসজ্জিত সুদক্ষ সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্যের সুদীর্ঘ শ্রেণীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তূরীধ্বনি নিনাদিত হইল। সৈন্যদলের পশ্চাতে কড়কড় করিয়া কাড়া বাজিয়া উঠিল। অশ্বসমূহের কান খাড়া হইয়া উঠিল, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইতে লাগিল, অধীরভাবে তারা মাটিতে ক্ষুর ঠুকিতে ও মুখোস চিবাইতে আরম্ভ করিল। সৈন্যদলের মুক্তকৃপাণে হাজার বিদ্যুৎ জ্বালিয়া উঠিল, তারা সেনাপতির ইঙ্গিতের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল। সেনাদলের সম্মুখে কিঞ্চিৎ দূরে মহারাজ মোহনলাল; সেই আটচল্লিশ বর্ষীয় বীরপুরুষের সুগঠিত দেহের উষ্ণীষ হইতে পায়ের রেকাব পর্য্যন্ত অখণ্ড একটি বিদ্যুতের দীপ্তি।

এমন সময়ে নবাবের দূত গিয়া তাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার হুকুম জানাইল। এক মুহূর্ত্তের জন্য মোহনলালের মনে সংশয় আসিয়াছিল, পর মুহূর্ত্তেই সে বলিল নবাবকে গিয়া বল, এখন ফেরা আর সম্ভব নয়।

পুনরায় তূরী-ধ্বনি হইল, কাড়া বাজিয়া উঠিল। মোহনলাল মুক্ত অসির ইঙ্গিতে সৈন্যদলকে অনুসরণ করিতে আদেশ জানাইল। তখন সেই সুদীর্ঘ সুদৃঢ় অশ্বারোহী প্রাকার নড়িয়া উঠিল, কাঁপিয়া উঠিল আন্দোলিত হইল—অগ্রসর হইতে লাগিল; ধীরে ধীরে, পায়ে পায়ে, তালে তালে, তূরীধ্বনির তালে তালে, কাড়া-নাকাড়ার তালে তালে; সিনফ্রের কামান-গর্জ্জনের তালে তালে; বহু সহস্র ক্ষুরের আঘাতে পলাশীর মাঠ ক্ষতবিক্ষত করিয়া, বহু সহস্র মুক্ত তরবারিতে বিদ্যুৎ বৃষ্টি করিয়া; বহু সহস্র কণ্ঠের উল্লাসধ্বনিতে বাতাসকে মথিত করিয়া, সেই অশ্বারোহী-প্রাকার অগ্রসর হইতে লাগিল, ধীরে ধীরে, পায়ে পায়ে, তালে তালে।

মীরজাফর শিবির হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া বুঝিল, সর্ব্বনাশ। সে পুনরায় নবাবকে বলিল—মোহনলাল সব মাটি করিতে বসিয়াছে। নবাব মোহনলালকে ফিরিবার জন্য জরুরী দূত প্রেরণ করিল। বিধাতা যাকে ধ্বংস করেন, আগে তার বুদ্ধিনাশ করেন। নবাবের দূত দ্রুতগামী অশ্বে করিয়া মোহনলালকে ফিরিবার জন্য নবাবের আদেশ জ্ঞাপন করিল। মোহনলাল থামিল, অশ্ব-প্রাকার থামিল। মোহনলালের আর কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না। মোহনলাল ক্ষোভে, ক্রোধে, লজ্জায়, অপমানে ফিরিল; ফিরিয়া যেখানে মীরমদন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, সেখানে গেল। সেই অশ্ব-প্রাকারও ফিরিল, ধীরে ধীরে, পায়ে পায়ে, তালে তালে, শ্রেণীবদ্ধ ভাবে, সংযতভাবে—নবাবের শিবিরের দিকে। পলাশীর যুদ্ধের যা সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা, তাহা ঘটিতেই পারিল না।

৬

সিনফ্রের উপরেও ফিরিবার হুকুম ছিল। সুসজ্জিত কামানশ্রেণীর দিকে তাকাইয়া একবার তার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। তারপরে কামান গুলি পিছু হটাইয়া মুষ্টিমেয় সৈন্য পরিখার আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

ইংরাজ সৈন্য যখন দেখিল যে, নবাবের সৈন্য পিছু হটিতেছে, তখন মেজর কিলপ্যাট্রিক একদল সৈন্য লইয়া সদর্পে অগ্রসর হইল। ক্লাইভ অবশ্য তখন ঘুমাইতেছিল—মৃগয়ামঞ্চে উচ্চ নিরাপত্তায়। সে জাগিল, জাগিয়া দেখিল, কি সর্ব্বনাশ! বিনা হুকুমে একজন অধীন কর্ম্মচারী কর্ত্তব্য পালন করিতেছে! কিন্তু প্রকৃতিস্থ হইয়া বুঝিল যে, ইহা ছাড়া আর উপায় নাই! তখন ক্লাইভের হুকুম অনুসারে ইংরাজবাহিনী আমবাগানের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া পরিখা আক্রমন করিল। মোহনলাল ও মীরমদন খাঁর সৈন্যদল পরাজিত হয় নাই—কেন যে তারা অগ্রসর হইল, কেন যে আবার হটিয়া আসিল, কেন যে অকারণে তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া যাইতেছে—কিছুই তারা জানে

না। কিন্তু যখন তারা দেখিল শত্রুসৈন্য কামান দখল করিতেছে, পরিখা আক্রমণ করিতেছে, অথচ আক্রমন করা নিষেধ—তারা ফিরিয়া দাঁড়াইল—বিনা হুকুমে, নিষেধ সত্ত্বেও। তখন সেই পরিখার উপরে হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সঙ্গীনে সঙ্গীনে, বন্দুকে বন্দুকে ; নায়কহীন সৈন্যদলের সঙ্গে নায়কিত সৈন্যদলের ; ভগ্নব্যূহ সৈন্যদলের সঙ্গে বদ্ধব্যূহ সৈন্যদলের ; আক্রমণ-কারীদের সঙ্গে আত্মরক্ষাকারীদের ; সৈন্যদলের সঙ্গে জনতার। কিছুক্ষণের মধ্যেই গোলাগুলির বৃষ্টিতে জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। ইংরাজ সৈন্য সদর্পে অগ্রসর হইয়া নবাবের শিবির অধিকার করিয়া লইল। বেলা তখন সাড়ে পাঁচটা। নবাব কিছুপূর্ব্বে একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজধানী রক্ষার জন্য মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিয়াছে।

৭

পাঠক, এতক্ষণ সত্য কথা বলিতে বলিতে দম বন্ধ হইয়া আসিয়াছে ; এবার কিছু মিথ্যা কথা বলিব। এতক্ষন বলিয়াছি যা ঘটিয়াছিল, এবার বলিব যা ঘটা উচিৎ ছিল। ইতিহাসের পাতায় এ সব কথা নাই, এমন কত কথা ইতিহাসের খিড়কি-দ্বার দিয়া অলক্ষ্যে প্রস্থান করিয়াছে, কে ঠিকানা রাখে !

যুদ্ধজয়ের আর কোন আশা নাই দেখিয়া মোহনলাল যে-বৃক্ষতলে মীরমদন শায়িত ছিল, সেখানে অসিয়া উপস্থিত হইল ; দেখিল, মীরমদনের প্রাণ তখনো বহির্গত হয় নাই। মীরমদন নির্জ্জীবের মত পড়িয়াছিল, হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিল—জিজ্ঞাসা করিল—কে ও ? মোহনলাল পাশে বসিতে বসিতে বলিল—খাঁ সাহেব, আমি মোহনলাল। মীরমদনের ওষ্ঠাধরে যেন একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিল, বলিল—ফিরেছ ভাই, এস এস। মোহন লাল বলিল—মরবার অনেক চেষ্টা করিলাম, কিছুতেই মৃত্যু হল না।

মীরমদন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—এমন ভাবে বৃথা মরে লাভ কি! আবার না হয় চেষ্টা করা যাবে।

—তুমি শীঘ্র সেরে ওঠ।

—আমার সময় হয়ে এসেছে—আল্লা আমায় ডেকেছেন। কিন্তু, ভাই, আর কি কোন আশাই নেই?

—কিছু না, খাঁ সাহেব, একটি সৈন্যও নেই। উভয়ে কিছুক্ষন নিস্তব্ধ হইয়া থাকিল। আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে একদল বালি-হাস পাখার শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল। বহুদূর হইতে গৃহগামী গাভীদলের গলার ঘণ্টার ধ্বনি ভাসিয়া আসিতে লাগিল—ছায়া দীর্ঘতর হইয়া বাহু মেলিয়া যেন কি একটা হারাণ জিনিষ খুঁজিয়া মরিতে লাগিল।

মোহনলাল জিজ্ঞাসা করিল—কি ভাবছ, খাঁ সাহেব? মীরমদন দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ক্ষীরাই নদীর ধারে আমাদের সেই গ্রামটি—আমাদের আঙিনায় শিরীষ গাছের ছায়াটি দীর্ঘতর হতে হতে পুকুরের ঘাটে গিয়ে পড়েছে। জলের সেই আলো-ছায়ার মধ্যে আমার পোষা মাছ দুটি!

—খাঁ সাহেব!

মীরমদন স্বপ্নগ্রস্তের মত বলিয়া যাইতে লাগিল—এতক্ষণ বিল থেকে গরু সব ফিরেছে—ধুলো উড়িয়ে, ঘণ্টা বাজিয়ে, পথের দু'পাশের ঘাস পাতা খেতে খেতে।

মোহনলাল বলিল—খাঁ সাহেব, এবার সেরে উঠে দু'জনে তোমাদের সেই গ্রামে যাব।

মীরমদন ম্লানভাবে হাসিয়া বলিল—আমার আর সময় নেই। গঙ্গার ভাটার সঙ্গে আমার জীবনেরও ভাটা পড়ে আসছে। তারপরে কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তোমাদের গাঁয়ের নাম কি ভাই?

মোহনলাল উত্তর দিল—বাঁশমতি নদীর ধারে পদ্মবিলা গ্রাম।

মীরমদম যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিল—কি মধুর নাম! বাঁশমতি

নদী, পদ্মবিলা গ্রাম! হঠাৎ চমকিয়া বলিল—এ কি মোহনলাল, এত রক্ত তোমার ক্ষতস্থান থেকে পড়ছে!

মোহনলাল বলিল—ও কিছু নয়, খাঁ সাহেব। সামান্য একটা আঘাত পেয়েছিলাম। কিন্তু, তোমার ক্ষত থেকে যে রক্ত পড়ছে!

—তাই তো! দু'জনের রক্তধারায় মিশে এখানকার মাটি ভিজে গেছে! কথা বলিতে বলিতে মীরমদন উত্তেজিত হইয়া উঠিল, উঠিতে চেষ্টা করিল, মোহনলাল চাপিয়া ধরিল।

মীরমদন বলিতে লাগিল—মোহনলাল আজ থেকে দু'শতাব্দী পরে এখানে যদি কেউ এসে দাঁড়ায়!

মোহনলাল মন্ত্রমুগ্ধের মত বলিল—খাঁ সাহেব—

মীরমদন উত্তেজিত ভাবে বলিয়া চলিল—দুই শতাব্দী পরে যদি হিন্দু-মুসলমান এসে পরস্পরের প্রতি অস্ত্র শানিয়ে এখানে দাঁড়ায় সেদিন কি তারা বুঝতে পারবে, এই মাটি মোহনলাল-মীরমদনের সম্মিলিত রক্তে কোনদিন ভিজে গেছে।

মোহনলালও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল—কেবল বলিল—খাঁ সাহেব।

—আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সে দিন কেবল ভায়ে ভায়ে হানাহানি—চারিদিকে কেবল মীরজাফর আর উমিচাঁদ। কোথায় বা সেদিন মোহনলাল, কোথায় সেদিন মীরমদন।

মীরমদনের অন্তিম উৎসাহে মোহনলাল উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে বলিল —হিন্দু মুসলমান জানি না খাঁ সাহেব। এই পলাশীর মাঠে দাঁড়িয়ে যদি বাঙালীর চোখে জল না আসে—হঠাৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস না পড়ে, তবে জানব বাঙলার সেদিন দুর্দিন।

মীরমদন হতাশার সুরে বলিল—সেদিন কোথায় মোহনলাল, আর কোথায় মীরমদন!

মোহনলাল তাকে বাধা দিয়া বলিল—সে কি কথা খাঁ সাহেব! বাঙলা দেশ কখনো তোমায় ভুলতে পারবে না!

মীরমদন উত্তেজিতভাবে বলিল—আমায় ভুলুক, একশ' বার ভুলুক। শুধু যেন তারা মনে রাখে, মোহনলাল, মীরমদন কি জন্যে প্রাণ দিয়েছে! তাদের বুকের রক্ত একত্র মিলে প্রবাহিত হ'য়ে বাঙলার মাটি উর্ব্বর করে তুলেছে!

এতক্ষণের কথাবার্ত্তার উত্তেজনায় অবসন্ন হইয়া মীরমদন ঢলিয়া পড়িল—মোহনলাল তাহাকে সযত্নে শায়িত করিয়া দিল। একসঙ্গে আকাশে আলোকের ভাটা, গঙ্গার জলের ভাটা মীরমদনের প্রাণের ভাটা আরম্ভ হইল। অন্ধকার ক্রমে নিবিড় হইতে হইতে বীরদ্বয়ের মূর্ত্তি আচ্ছন্ন করিয়া দিল। কেবল অতিদূরে গ্রামের প্রান্তে বাংলার চিরন্তন বিষাদের প্রতীকের মত রাখালের বাঁশীতে ভাটীয়ালি রাগিণী করুণভাবে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

আজ সে পলাশীর মাঠ নাই—গঙ্গায় ভাঙিয়া গিয়াছে। পলাশীর স্মৃতিও বোধ করি বাঙালী ভুলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। পলাশীর-মাঠ নামে খ্যাত এক প্রান্তরের মধ্যে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নির্ম্মিত এক স্মৃতিস্তম্ভ দণ্ডায়মান। আর আছে একটি সমাধিস্তম্ভ—মুসলমান এক জমাদারের, নবাবের জন্য যে যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল। মূর্খ জমাদার! সকলে যখন পলায়ন করিতেছিল, তুমি মরিতে গেলে কেন? সকলে যখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ছিল, তুমি যুদ্ধ করিতে গেলে কেন? আর কিছুই না পার, অন্তত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিতে তো! এসব কিছুই না করিযা দাঁড়াইয়া মরিতে গেলে! দুই শতাব্দীর পার হইতে একটা প্রশ্নের উত্তর দিবে কি? তুমি কি সত্যই বাঙালী ছিলে?

সমাধিস্তম্ভের পাথর ক্ষইয়া গিয়াছে—লোকে বলে রৌদ্রবৃষ্টির প্রভাবে। আমি সত্য কথা জানি, বাঙালী হিন্দু মুসলমান ভ্রাতৃমুখী অস্ত্রে শান দিয়া ওই সমাধির পাথর ক্ষইয়া ফেলিয়াছে! রৌদ্রবৃষ্টির সাধ্য কি!

জোড়াদীঘির চৌধুরী-পরিবার

১

পলাশীর যুদ্ধের প্রায় ষাট বৎসর পরে একদিন দর্পনারায়ণ পলাশীর মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বরূপ সর্দ্দারের অস্থি গঙ্গায় দিবার জন্য সে মুর্শিদাবাদে আসিয়াছিল ; সেখানকায় গঙ্গাকৃত্য শেষ করিয়া সে পলাশীতে আসিল। গঙ্গার ঘাটে বজরা বাঁধিয়া রাখিয়া সারাদিন সে মাঠের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইল! বাল্যকালে স্বরূপ সর্দ্দারের নিকটে যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা সে বহুবার শুনিয়াছে—সমস্ত মাঠ তার কাছে অতিশয় পরিচিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

আমরা যখনকার কথা বলিতেছি, তখনো পলাশীর প্রাচীন মাঠ গঙ্গায় ভাঙিয়া যায় নাই ; যুদ্ধের সময় যেমন ছিল অবিকল তেমনি ছিল। আমবাগান, মৃগয়ামঞ্চ, পুষ্করিণী দুইটির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইটের পাঁজাটি আরো ধ্বসিয়া পড়িয়াছে ; মাটির টিলার উপরে আরো আগাছা গজাইয়াছে ; আর নবাবের শিবিরের সম্মুখে যে পরিখা খনন করা হইয়াছিল, তা অপেক্ষাকৃত অগভীর হইয়া পড়িয়াছে,—বর্ষার জল জমে, শরৎ কালে মশার আকর হয়। সেই বৃহৎপ্রান্তরের ঐতিহাসিক তাৎপর্য্যের প্রতি কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই—সারাদিন রাখাল গরু চরায়, গরু যখন চরিয়া বেড়ায়, রাখাল ছেলেরা ইতস্তত ভ্রষ্ট কামানের গোলা লইয়া গেণ্ডুয়া খেলে। লোকে ওই লৌহগোলকগুলিকে ভীমের গোলা বলে, ইতিমধ্যেই ক্লাইভ সিরাজদৌল্লা পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

দর্পনারায়ণ সেই মাঠের মধ্যে অতীতের প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়াইল, আমবাগানে প্রবেশ করিল—যেখানে ইংরাজ সৈন্য প্রাণভয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল ; মৃগয়ামঞ্চে আরোহণ করিল, যেখান হইতে ক্লাইভ নবাবসৈন্য দেখিয়া ভীত হইয়াছিল ; ইটের পাঁজার উপরে উঠিতে পারিল না, প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিল ; বড় পুকুরটির উচ্চপাড়ে উঠিল—যেখানে সিনফ্রের কামান

সন্নিবিষ্ট ছিল; সমাকীর্ণ পরিখার ধারে ধারে অনেকক্ষণ পায়চারি করিল। মাঠের মধ্যে পাঁচ-সাতটা কামানের গোলা পাইয়া লোক দিয়া বজরায় পাঠাইয়া দিল।

১০

দর্পনারায়ণ যখন বজরা হইতে নামে, তখন আলিবর্দ্দি তার সঙ্গে যাইতে উদ্যত হইয়াছিল—কিন্তু দর্পনারায়ণ নিষেধ করিয়াছিল, বলিয়াছিল, কাউকে সঙ্গে যাইতে হইবে না। কাজেই দর্পনারায়ণের ভৃত্য ও সঙ্গীদের আজ পুরোপুরি ছুটি। শরৎ পণ্ডিত ও বাণীবিজয় দাবায় বসিয়া গেল; অন্যান্য সকলে যা খুসী করিতে লাগিল, কেবল উদ্বিগ্ন আলিবর্দ্দি বজরার ছাদের উপরে পিতল-বাঁধানো পাকা লাঠিগাছা হাতের কাছে রাখিয়া মাঠের দিক্ চাহিয়া বসিয়া ছিল।

শরৎ পণ্ডিত ও বাণীবিজয় যদিও দাবার জটিল চালের মধ্যে নিমগ্ন হইতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, কারো মন বসিতেছে না। শরৎ পণ্ডিত আসিয়াছিল গঙ্গাস্নান করিতে, গঙ্গাস্নান শেষ হইয়াছে এখন সে দেশে ফিরিতে পারিলে বাঁচে, খামাকা এই মাঠের ধারে নৌকা লাগাইয়া অপেক্ষা করিবার অর্থ সে বুঝিতে পারে না। আর বাণীবিজয়কে তো একরকম জোর করিয়াই আনা হইয়াছে; সে অনৃত বাক্য প্রয়োগ করে না, তাই সে শরৎ পণ্ডিতকে বলিয়াছিল, টোল ছাড়িয়া এখানে বসিয়া থাকায় তার রসচর্চ্চার ব্যাঘাত ঘটিতেছে। শরৎ পণ্ডিৎ অবশ্য রস অর্থে কাব্যরস বুঝিয়াছিল, কিন্তু বাণীবিজয় জানে রস শব্দ একার্থক নহে।

কিছুক্ষণ খেলিবার বৃথা চেষ্টা করিবার পরে বাণীবিজয়ের পক্ষে আর বসিয়া থাকা অসম্ভব হইল—সে হঠাৎ দাবার ছক উল্টাইয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল। শরৎ পণ্ডিতও মনে মনে ইহাই চাহিতেছিল, কিন্তু নিজের হাতে খেলা নষ্ট করিয়া দিবার সাহস ছিল না। সে মনে মনে

স্বস্তি অনুভব করিয়া বলিল—আহা, বাজিটা শেষ হবার আগেই—বাণী-বিজয় বিরক্তি সহকারে বলিল—রাখ তোমার বাজি—এখন আমার গো-রসচর্চ্চার সময়। এই বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল। সত্য কথা বলিতে কি, বাণীবিজয় কিঞ্চিন্মাত্রায় অহিফেন সেবন করিয়া থাকে—কাজেই তার পক্ষে দুগ্ধ অপরিহার্য্য বিলাস। কিন্তু, এই মাঠের মধ্যে দুধ কোথায়? বাণীবিজয় সকাল বেলা একবার চারি ধার জরিপ করিয়া দেখিয়া লইয়াছে যে অদূরে একখানি গ্রাম আছে। ইহাই বিখ্যাত পলাশী গ্রাম। সে তখনি ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, বিকাল বেলা ওইখানে গিয়া দুধ সংগ্রহ করিতে হইবে। কাজেই সে শরৎ পণ্ডিতকে একাকী রাখিয়া পলাশী গ্রামের দিকে যাত্রা করিল।

১১

দর্পনারায়ণ একাকী মাঠের মধ্যে ঘুরিতে লাগিল—ক্রমে যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া সে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নদীর বাঁকে বৃহৎ বজরা দুইখানি অন্তর্হিত হইল—কেবল সন্ধ্যাকালের রক্তিম আকাশপটে শীর্ণ মাস্তুল দুটি উর্দ্ধোত্থিত তর্জ্জনীর মত দৃষ্ট হইতে লাগিল।

দর্পনারায়ণ ক্লান্ত হইয়াছিল মাঠের মধ্যে একটি আম গাছের ছায়ায় বসিয়া পড়িল। গঙ্গার বাঁকে সূর্য্য প্রতিদিন যেমন অস্ত যায়, আজিও তেমনি অস্তমান হইল। পরিশ্রান্ত দর্পনারায়ণ গাছের গুড়িতে ঠেস দিয়া স্বপ্ন ও জাগরণের গোধূলিপুলিনে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। যখন তার চৈতন্য হইল—ইতিমধ্যে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—দেখিল, সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু পূর্ণপ্রায় চন্দ্রের কিরণে পৃথিবী আলোকিত। রৌদ্র ও জ্যোৎস্নার অন্তর্নিহিত মধ্য-রেখাটী সে নিদ্রার ডুবসাঁতারে কখন যেন উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। খানিকটা বিশ্রাম করিয়া লইয়া সে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল,—রৌদ্রে তার কষ্ট হইতেছিল—জ্যোৎস্নায় বেশ প্রফুল্ল বোধ করিতে লাগিল।

চারিদিকে জ্যোৎস্না যেন গঙ্গার ধবল জলে পৃথিবী ভাসিয়া গিয়াছে; মাঝে মাঝে স্তম্ভিত ধূসরতায় আমবাগানের অস্তিত্ব; বঙ্কিম গঙ্গার স্রোত—ঐরাবতের সুদীর্ঘ বক্রদন্তের মতন। দর্পনারায়ণ থমকিয়া দাঁড়াইল—এতক্ষণে তার বজরায় ফিরিবার চৈতন্য হইয়াছে, কিন্তু কোন দিকে যে নৌকা, কতদূরে সে আসিয়াছে, রাত্রি কতক্ষণ, কিছুই ঠাহর করিতে পারিল না। অগত্যা আবার চলিতে লাগিল।

হঠাৎ যেন সে শুনিতে পাইল সেই নৈশ নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করিয়া কার আকুল আর্ত্ত-কণ্ঠ! প্রথম বার সে খেয়াল করে নাই; দ্বিতীয় বারে চকিত হইয়া উঠিল। আবার সব নীরব, সে মনে করিল—ইহা হয় স্বপ্ন, নয় মতিভ্রম। কিন্তু, তখনি আবার করুণ ভয়-ব্যাকুলতার সঙ্গে সেই ক্রন্দন ধ্বনিত হইয়া উঠিল। এবারে সে বুঝিল—ইহা অত্যন্ত কঠোর বাস্তব, এবং সে আরও বুঝিল—ঐ ক্রন্দন নারীকণ্ঠের! বিস্মিত দর্পনারায়ণ থমকিয়া দাঁড়াইল—এখানে নারীকণ্ঠ কেমন করিয়া সম্ভব! সারাদিন মাঠের মধ্যে ঘুরিয়া সে দু' চারজন রাখাল ছেলে ব্যতীত কোন জনপ্রাণীই দেখিতে পায় নাই। কিন্তু চিন্তা করিবার অবকাশ তার ছিল না; অদৃশ্য নারী কণ্ঠের সেই আর্ত্ত মিনতি অলক্ষ্য পুরুষের কাছে বারংবার ধ্বনিত হইয়া আহ্বান করিতে লাগিল। দর্পনারায়ণ শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল।

কিছুক্ষণ অগ্রসর হইতেই সে বুঝিতে পারিল শব্দ স্পষ্ট হইতেছে,—অর্থাৎ সে লক্ষ্যের দিকেই ছুটিতেছে। কিন্তু সম্মুখে তো ঘরবাড়ী নাই, বনের স্তম্ভিত ধূসরতা নাই; তবে শব্দ আসিতেছে কোথা হইতে? ক্রমে তাহার চোখে দু'একটি দীপরেখা ভাসিয়া উঠিতে লাগিল এবং সহসা সে যেন অতি অপ্রত্যাশিতভাবে সুবৃহৎ এক শুভ্র তাঁবুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁবু শুভ্র বলিয়াই জ্যোৎস্নায় তাহা মিশিয়া ছিল—দূর হইতে দৃশ্য হয় নাই। তাঁবুর সম্মুখে সে দাঁড়াইল—ভিতর হইতে বামাকণ্ঠের আকুতি পাথরের চেয়েও কঠিন, না জানি কাদের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া জ্যোৎস্নামণ্ডলকে আকীর্ণ

করিতে লাগিল। সে ঠিক করিল, ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে। কিন্তু, একেবারে নিরস্ত্র যাওয়া উচিত নয় মনে করিয়া একখানা লাঠি খুঁজিবার জন্য পিছনে ফিরিল। অমনি পিছন হইতে কে বলিয়া উঠিল—আমি আছি দাদা-বাবু, এগিয়ে চলুন। কণ্ঠস্বর আলিবর্দ্দির। হঠাৎ আলিবর্দ্দিকে সঙ্গে পাইয়া সে অত্যন্ত খুসি হইয়া বলিল তুই কখন—এলি? আলিবর্দ্দি বলিল—আমি আপনাকে খুঁজতে বেরিয়ে অনেকক্ষণ থেকে পিছে পিছে আসছি। দর্পনারায়ণ তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল—আমার সঙ্গে আয়। দু'জনে তাঁবুর দরজার কাছে অগ্রসর হইতেই দেখিল সেখানে দরজা জুড়িয়া একটা লোক বসিয়া ঝিমাইতেছে; আলিবর্দ্দি তাকে একটা ঠেলা দিল,—লোকটা চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কে? তবলা না সেতার? আলিবর্দ্দি উত্তর দিল,—তোমার যম! এই অনা-কাঙ্খণীয় ব্যক্তিটির উল্লেখেও লোকটা বিস্মিত হইল না,—যেন সে বহু দিন ধরিয়া তাহারই জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে; কেবল বলিল—তবু ভাল যে এসেছ। পরক্ষণেই পশ্চাদ্বর্ত্তী দর্পনারায়ণকে দেখিয়া বলিল—ওটা কে? তোমার মহিষ না কি? বিরক্ত আলিবর্দ্দি তার পেটে লাঠির একটি খোঁচা দিয়া বলিল—এই নে শিঙের গুঁতো! লোকটা পেটে হাত বুলাইয়া বলিল,—যেমন ভেবেছিলাম, তেমন ধারালো নয়—ভোঁতা। বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া দর্পনারায়ন জিজ্ঞাসা করিল,—ভিতরে কে আছে? লোকটা আঙুল মট্‌কাইতে আরম্ভ করিয়া বলিল,—একজোড়া তব্‌লা; দু'জন বেহলা; দু'জন সেতার; একজন তানপুরা—দর্পনারায়ণ বুঝিল, লোকটা মাতাল; এক ঠেলা দিয়া তাহাকে পাশে সরাইয়া দিয়া তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিল; পিছনে আলিবর্দ্দি আছে অনুমান করিয়া তাহার উদ্দেশ্যে আদেশ করিল—আলিবর্দ্দি, হুঁসিয়ার।

১২

তাঁবুর মধ্যে প্রশস্ত ফরাস; এক ধারে পুরু গালিচা, বড় বড় তাকিয়া, ধূমায়িত আলবোলা, সম্মুখে কয়েকটি মদের বোতল, কতক খোলা, কতক বন্ধ, কয়েকটা গেলাস। আর, গালিচার উপর তাকিয়া আশ্রয় করিয়া অর্দ্ধশায়িত একটি যুবক। তার মুখে ভ্রূপার্শ্বে ও নেত্রকোণে নৈশ অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ কালিমারেখা, শিরে তরঙ্গায়িত বাউরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ফিনফিনে কালপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিনের বানিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুণট করা উড়ানি এবং পায়ে বগলস-সমন্বিত পালিশকরা জুতা। যুবক বলিষ্ঠ, তেজস্বী, কিন্তু এক্ষণে নিস্তেজ; গালিচার নীচে ফরাসের উপর তবলচি, তানপুরাওয়ালা, বেহালাওয়ালা, সেতারী, মাঝখানে ওস্তাদ। একপাশে লোহার শিকের উপরে একজোড়া বুলবুল; মাঝখানে ঝোলান ছোট একটি ঝাড়ে আলো। তাঁবুর খোটাকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া একটি বালিকা, কৌরবসভায় দ্রৌপদী!

দর্পনারায়ণ ও আলিবর্দ্দি প্রবেশ করিতেই সকলে চকিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, কোন্ হ্যায়, কোন্ হ্যায়? যুবকটি অর্দ্ধজড়িত স্বরে বলিল—যেই হোক, বসে যাও বাবা, বেশী গোলমাল ক'রো না। দর্পনারায়ণ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বালিকার দিকে তাকাইল—বালিকা আর্ত্ত করুণ-স্বরে বলিল—আমাকে রক্ষা করুন। দর্পনারায়ণ তার দিকে অগ্রসর হইল, মোসাহেবের দল কলরব করিয়া উঠিল, আলিবর্দ্দি লাঠি তুলিল তৈলপুষ্ট উদ্যত যষ্টী দেখিয়া ওস্তাদ ও সঙ্গতওয়ালারা তব্‌লা তানপুরা, বেহালা ফেলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তাঁবু হইতে বাহির হইয়া পড়িল। দর্পনারায়ণ বালিকার নিকটে উপস্থিত হইতেই বালিকা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল; মাটিতে পড়িবার আগেই সে তাকে ধরিয়া ফেলিয়া কোলে তুলিয়া লইল। আলিবর্দ্দিকে অনুসরণ করিতে বলিয়া দর্পনারায়ণ বালিকার সংজ্ঞাহীন দেহ বহন করিয়া তাঁবু পরিত্যাগ করিল। এতক্ষণ কি হইতেছিল, যুবকটি

ভালভাবে বুঝিতে পারে নাই, সে অস্পষ্ট স্বরে শূন্য তাঁবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল —আঃ যেতে দাও মেয়েটা ভারি বেরসিক।

১৩

দর্পনারায়ণের তাঁবু ত্যাগ করিবার কিছুক্ষণ পরে তাঁবুর একদিকের কানাৎ তুলিয়া মৃদুপায়ে অতি সন্তর্পণে বাণীবিজয় তাঁবুতে প্রবেশ করিল। পাঠক বিকালবেলায় বাণীবিজয়কে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পলাশী গ্রামে যাইতে দেখিয়াছিলেন। সন্ধ্যাবেলায় বজ্‌রায় ফিরিবার চেষ্টা করিতে গিয়া সে পথ হারাইয়া ফেলিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। দর্পনারায়ণ ও আলিবর্দ্দি যখন তাঁবুতে প্রবেশ করে, তখন সে পাশেই একটি খেজুরগাছের আড়ালে লুকাইয়া ছিল। সেখান হইতে সে দেখিতে পাইল মোসাহেবের দল প্রস্থান করিতেছে, তারপরে দেখিল, আলিবর্দ্দি ও দর্পনারায়ণ একটি নারীদেহ লইয়া প্রস্থান করিতেছে। চারিদিক এতক্ষণে নিরাপদ্‌ হইয়াছে মনে করিয়া সে অত্যুগ্র কৌতূহলের বশে তাঁবুতে প্রবেশ করিল; আসিয়া দেখিল, যুবকটি চৈতন্যহীন, আর সম্মুখেই অরক্ষিত অবস্থায় একসারি বোতল। তৃষ্ণা নিবারণের এমন মহৌষধ এত অধিক পরিমাণে, এমন সুলভে অনেকদিন সে পায় নাই। গোটা তিনেক বোতল অতি সাবধানে তুলিয়া লইয়া চাদরে ঢাকা দিয়া তাঁবু ত্যাগ করিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল; বাহিরে আসিয়া সে গঙ্গা লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে চলিতেছে, এমন সময়ে পিঠের উপরে কার স্পর্শ অনুভব করিয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল, অদ্ভুতদর্শন একটি লোক।

বাণীবিজয় থামিলে লোকটা বলিল—আমাদের মোতির মা কি বলত জান? শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না, বাণীবিজয় অবাক্‌ হইয়া গেল, লোকটা বলে কি, শাকই বা কোথায় মাছই বা কই? তার বিমূঢ় ভাব দেখিয়া সে বলিল,—তা হ'লে স্বীকার কর যে আমার

কথা সত্যি! এইবার বাণীবিজয়ের কথা ফুটিল—সে বিরক্তি সহকারে বলিল,—কে হে বাপু তুমি, মাঝরাতে আর তামাসা করবার লোক পেলে না। এমন সময়ে তার চাদরের তলে ঢাকা বোতলগুলি নড়িয়া টুং টাং শব্দ করিল। লোকটা হাসিয়া বলিল,—বলি দাদা বোতল খেয়েছ? বাণীবিজয় অনৃত বাক্য প্রয়োগও করে না, বলেও না, কাজেই এমন মিথ্যা অপবাদে ক্রুদ্ধভাবে উত্তর দিল,—চোপরও মিথ্যা ব'লো না; আমি খাই নি।—তবে খাওয়ার জন্যই নিয়ে যাচ্ছ—এই বলিয়া লোকটা একটানে তার চাদর সরাইয়া দিল; চাঁদের আলোয় তিনটি বোতল চকচক করিয়া উঠিল। বাণীবিজয়ের মুখে একটা অর্দ্ধোক্ত উপদেশ এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে মধ্যপথে থামিয়া গেল। লোকটা বলিয়া উঠিল—আমাদের মোতির মা কি বলত জান?—খুব জানি, কিন্তু তুমিও তো দাদা সাধু নও, তোমার পিঠে ওই পুটলিতে কি?—বলিয়া বাণীবিজয় লোকটার চাদর টানিয়া ফেলিয়া দিল। চাদর সরিয়া যাইতেই লোকটার পিঠে একটা সুবৃহৎ কুঁজ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। বাণীবিজয় অপ্রস্তুত—কিন্তু লোকটা হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। বাণীবিজয়ের অপ্রস্তুতভাব দেখিয়া তাহার যেন আর আনন্দের সীমা নাই! সে বলিল—ঠিক ধরেছ দাদা, ঠিক! আমাদের মোতির মা বলত—ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান্ বয়। আমার এ বোঝা একেবারে খোদ ভগবানের দেওয়া—কার সাধ্য যে কেড়ে নেয়? জন্মাবার আগে ভগবানের কাছে থেকে ফাও আদায় করে' তবে এসেছি—ওটা আমার ফাও। লোকটা এমনি কত কি বলিয়া যাইতে লাগিল, আর বাণীবিজয় চাঁদের আলোয় লোকটাকে লক্ষ্য করিল। সত্যই লোকটা অদ্ভুত। একটা পাকা তরমুজকে মাঝখান দিয়া কাটিয়া ফেলিলে কি দেখা যায়! চারপাশে সরু রকম একটা শাদা জমিনের ঘের। তারপরের অংশ লাল, মাঝখানের বীচিগুলি কালো। লোকটার মুখমণ্ডলের সঙ্গে এইরূপ একটা দ্বিখণ্ডিত তরমুজের সাদৃশ্য

আছে। তার চুল শাদা, দুই গাল বাহিয়া শাদা দাড়ির একটী সূক্ষ্ম রেখা, বাকি মুখ—নাক, চোখ, গাল টক্‌টকে লাল; আর দাঁত দুই-পাটী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। পিঠের ডানদিকে একটি বৃহদাকার কুঁজ, ঘাড়ের উপর দিয়া দেখা যায়—অন্ধকারে হঠাৎ মনে হইতে পারে, পিছন হইতে কার মাথা যেন উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। কুঁজের ভারে লোকটা সম্মুখে ঈষৎ নত।

সত্য কথা বলিতে কি, লোকটাকে যতই ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল, বাণীবিজয় ততই ভয় পাইতে আরম্ভ করিল! সেই জ্যোৎস্নার অন্ধকারে! রাত্রির নির্জ্জনতায়। কুব্জ, ন্যুব্জ, খঞ্জ, অন্ধ, পঙ্গু, বিকল সাধারণ মানুষের অপেক্ষা দুর্ব্বল, কিন্তু বিকলতাই তাদের ধন তাদের ভয়াবহ করিয়া রাখিয়াছে; ইহাতেই তাদের অসাধারণত্ব। বিকলাঙ্গ ব্যক্তি প্রকৃতির বিদূষক। এদের লইয়া সময়ে সময়ে ঠাট্টা করিতে পার, কিন্তু মনে মনে সম্ভ্রম না করিয়া উপায় নাই। কারণ বিকল হইলেও ইহারা বিধাতার সৃষ্টি—বিধাতা যখন শিক্ষানবিশী ছিলেন, সেই আমলের সৃষ্টি ইহারা। হাতী, গণ্ডার, জলহস্তী, ম্যামথ, তিমি—শিক্ষানবিশী আমলে সৃষ্ট; ইহাদের মধ্যে প্রথম ঔৎসুক্যের আতিশয্য; ময়ূর, রাজহংস, অশ্ব, জেব্রা, চিত্রবর্ণ সব পাখী বিধাতার জীবনে রোমান্টিক যুগের সৃষ্টি—ইহারা প্রকৃতির রোমান্স,—অপূর্ব্ব বর্ণ-বিলাসে, বিস্ময়কর ভঙ্গীচাতুর্য্যে এবং প্রয়োজনাতীত দাক্ষিণ্যে। মানুষ বিধাতার ক্ল্যাসিকাল হাতের সৃষ্টি। এমন সামঞ্জস্য এমন সাম্য; প্রয়োজন এমন সৌন্দর্য্য দ্বারা আচ্ছন্ন; বর্ণহীন দেহে এমন সুকোমল লাবণ্য; শিরীষভঙ্গুর শরীরে এমন বজ্রোচিত কঠোরতা, এত স্বল্পাক্ষরে এমন অসাধারণ ব্যঞ্জনা, মৃত্তিকার প্রদীপে এমন অমৃতময়ী শিখা। আর উট, গাধা, জিরাফ, বেবুনের দল বোধ হয় বিধাতার বৃদ্ধ বয়সের গদ্যছন্দ—কেমন করিয়া একই শিল্পী ইহাদের সৃষ্টি করিল—এই ভাবনাতেই দর্শককে বিস্মিত করিয়া দেয়।

জোড়াদীঘির চৌধুরী-পরিবার

বাণীবিজয় যখন অবাক হইয়া তাকে দেখিতেছিল, লোকটি যেন খানিক পরিমাণে নিজ মনেই বলিয়া উঠিল, মোতির মা ঠিকই বলেছিল—আশু দর্শনধারী পাছু গুণবিচারি। কি দাদা অবাক হ'য়ে গেলে যে। বাণীবিজয়ের কাছে এই লোকটার অস্তিত্ব জটপাকানো এক বাণ্ডিল দড়ির মত মনে হইল, কেমন করিয়া যে ইহাকে খুলিবে ঠাহর করিতে না পারিয়া সাধারণ ভাবেই আরম্ভ করিল,—বাপু হে তোমার নামটি কি? প্রশ্ন শুনিয়া লোকটি বসিয়া পড়িল, বলিল—শুনবে তো ব'সো। আমার নাম বেঙা চৌকিদার, আমার বড় ভাইয়ের নাম ফেঙা, তার বড়র নাম পেঙা। আমার ছোট ভাইয়ের নাম ঠিক করা হয়েছিল ভেঙা, কিন্তু মুস্কিল হ'ল এই যে তার জন্মই হল না। তার কথা শুনিয়া বাণীবিজয় ভাবিল যে, খুব লোকের কাছে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছে। লোকটা যেন ক্রমেই জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। সে শুধু মূঢ়ের মত বলিল,—বুঝতে পারলাম না বাপু। লোকটা যেন এই উত্তর আশা করিতেছিল,—বলিল, সে আমি জানি। স্বয়ং মোতির মা বুঝতে পারে নি—তুমি আর কি এমন লোক! শোন তবে। এই বলিয়া লোকটি বেশ জমাইয়া বসিয়া আরম্ভ করিল,—আগে প, তার পরে ফ, তারপরে ব, তারপরে ও কি বল! আমিও বর্ণমালা জানি। না হয় নাই পড়লাম টোলে। বর্ণমালা অনুসারে আমাদের ভাইদের নাম রাখা হয়, তাই সবচেয়ে বড়জন পেঙা, তার পরের জন ফেঙা তারপরে আমি, আমার নাম বেঙা। আমার ছোটজনের নাম ঠিক করে-ছিলাম আমিই, কিন্তু শালা আচ্ছা ফাঁকি দিল—জন্মালই না। অজাত ভ্রাতার অকৃতজ্ঞতায় কিছুক্ষণ তার মুখে কথা ফুটিল না; তারপরে বলিল—কিন্তু আমার আরো নাম আছে বিহঙ্গম, ব্যঙ্গম, কি দাদা এ নামগুলো বড়লোকের মত কি না? এই বলিয়া বৃহৎ নামের মাহাত্ম্যে নিজেকে সে অত্যন্ত বড় বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

পাঠকের মোতির মার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ঔৎসুক্য জন্মিয়া থাকিতে

পায়ে। কিন্তু, আমরা যতদূর জানি, মোতির মা বলিয়া কেহ নাই, কখনো ছিলনা; মোতির মা সম্পূর্ণরূপে বেঙা চৌকিদারের নিজস্ব সৃষ্টি, প্রথমে সে ইহাকে কাল্পনিক বলিয়া মনে করিত, কিন্তু বহুকালের পরে এখন সে সত্যসত্যই মোতির মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। অন্যদের তো কথাই নাই, বেঙা কাজে অকাজে সদাসর্ব্বদা মোতির মার উল্লেখ এমন ভাবে করে যে, লোকে তাকে সর্ব্ববিষয়ে ভবিষ্যদদৃষ্টিশালীনি একজন খনা, লীলাবতী বলিয়া মনে করে। সঙ্গীতের সঙ্গে তব্‌লা যেমন তাল দিয়া যায়, এই মহীয়সী মহিলার উক্তিগুলিও তেমনি বেঙার কার্য্যকলাপের সঙ্গে সমর্থন জানাইতে থাকে। প্রথমে লোকে মোতির মাকে দেখিতে কেমন জিজ্ঞাসা করিত, বেঙা মনগড়া একটা বর্ণনা দিত। সেই বর্ণনা সূত্র অনুসরণ করিয়া লোকে পথে ঘাটে তার দেখা পাইতে আরম্ভ করিল। কেহ সন্ধ্যাবেলায় হাট হইতে ফিরিতে দেখিয়াছে, কেহ সকাল বেলায় ঘাটে যাইতে দেখিয়াছে, কেহ দুপুর বেলায় বড়ি শুকাইতে দেখিয়াছে, কেহ বিকাল বেলা মাঠ হইতে গরু তাড়াইয়া আনিতে দেখিয়াছে। শেষে মোতির মার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া তার বংশ-পরিচয় ঘটিতে লাগিল। লোকে মোতির দেখা পাইল, তবে কেহ বলিল মোতি ছেলে, কেহ বলিল মেয়ে, কেহ বলিল মোতি প্রৌঢ়, কেহ বলিল শিশু; কিন্তু অত সামান্য ত্রুটিতে কিছু যায় আসে না, লোকের বিশ্বাস টলিল না। শেষে একদিন সত্যসত্যই মোতির মা আসিয়া উপস্থিত, তখন বেঙারও অবিশ্বাস করিবার উপায় রহিল না। সে আসিয়া বেঙার মাসি বলিয়া পরিচয় দিল এবং জানাইল মোতি, ও রামা, মধু, যদু প্রভৃতি বেঙার ভ্রাতৃবর্গের সম্ভাবনা আসন্ন। সেই রাত্রেই বেঙা গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়া এক জমিদারের চাকুরি গ্রহণ করিল।

সে যাই হ'ক, বাণীবিজয় মোতির মার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তোলে নাই, সে বেঙাকে দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল। বেঙা আবার কথা বলিল;—বাণীবিজয়কে বোতলগুলি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি দাদা

বোতলগুলি কি শুঁকতে নিয়ে যাচ্ছ? বাণীবিজয় হাসির স্বর গ্রামের মধ্যে ই-কারের হাসি হাসিল, কিন্তু কোন কথা বলিল না। বেঙা কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া একটা বোতল টানিয়া লইয়া চট করিয়া খুলিয়া ফেলিয়া বলিল,—শুঁকবেই যদি, ছিপিটা খুলে ফেলা ভাল। উগ্র সুরার গন্ধে বাণীবিজয়ের মুখ হইতে শুধু বাহির হইল এ যে দামী মাল। বেঙা ভাল মাল খানিকটা মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিতে দিতে বলিল, হবে না কেন, কতবড় জমিদার! মদের মধ্যস্থতায় উভয়ের মিতালি জমিয়া উঠিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা বোতল নিঃশেষ হইয়া গেল। বাণীবিজয় ভাবিয়াছিল বেঙার সব পরিচয় পাইয়াছে, কিন্তু তার আচরণ দেখিয়া বুঝিল, বেঙার চরিত্র সমুদ্রবিশেষ, পারগামিতা প্রায় অসম্ভব। বেঙা খালি বোতলটার মুখ মাটির মধ্যে পুঁতিয়া তাহার উপরে উঠিয়া দাঁড়াইল। লোকটা ঘোর মাতাল হইয়াছে মনে করিয়া বাণী সরিয়া দাঁড়াইল, তার মনের ভাব বুঝিয়া বেঙা বলিল,—মাতাল ভাবছ—ছোঃ। এই বলিয়া সে দেখাইতে লাগিল—এই দেখ আমার ডান হাত, এই দেখ বাঁ হাত, এই দেখ ডান পা এই দেখ বাঁ পা! হাঃ। দাও দেখি ভাই ওই বোতলটা! বাণীবিজয় একটা বোতল আগাইয়া দিতেই সে আধেয় বস্তু সবটা মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া খালি বোতলটা নীচের বোতলের উপর স্থাপন করিয়া তার উপরে উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল। বাণী এবার শঙ্কিত হইয়া বলিল,—আরে চৌকিদার নাম, নাম—পড়ে যাবে। তার কথা শুনিয়া বেঙা ধিক্কারের সুরে বলিল,—ছিঃ তুমি একেবারে ছটাকি মাতাল। নতুন লোক মদে মাতাল হয়। আমি যে বনেদী মদখোর। বাণী বলিল—তাই না হয় হল। কিন্তু, বোতলের উপর থেকে নাম না। সে অর্দ্ধপথে তাকে থামাইয়া আরম্ভ করিল—নামব? কেবল দুই ধাপ উঠেছি স্বর্গের দিকে, এর মধ্যেই নামব? তার পরে নৈরাশ্যের সুরে বলিল,— দুঃখের কথা কি বলব দাদা, পয়সা নেই; থাকত আমার মনিবের মত টাকা, এতদিনে খালি বোতল দিয়ে সিঁড়ি গড়ে গড়ে স্বর্গে গিয়ে ঠেকতাম।

বাণীবিজয় মদ্যপান করিয়া অনেক সময় স্বর্গসুখ অনুভব করিয়াছে, কিন্তু খালি বোতলের সাহায্যে যে সশরীরে এমন ভাবে স্বর্গে ওঠা যায়, ইহা তার স্বপ্নেরও আগোচর ছিল। যাই হোক, বোতলের সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়াতে বেঙা স্বর্গের দিকে বেশি দূর উঠিতে পারিল না; নানা রকম খেদোক্তি করিতে করিতে নামিয়া আসিল। তখন দুইজনে বসিয়া পড়িয়া অবশিষ্ট বোতলটা শেষ করিয়া পরস্পরের পরিচয় লইতে আরম্ভ করিল। বেঙা বাণীবিজয়ের ও তার জমিদারের পরিচয় লইল; বাণীবিজয় বেঙার পরিচয় লইয়া জানিল—সে জমিদারের খানসামা; জমিদারের নাম পরন্তপ রায়, মুর্শিদাবাদ জেলায় তেমাথা গ্রামে তার বাস। জমিদারি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এখন সে প্রায়ই বজরায় করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, আর আজ তাঁবুর মধ্যে যে ব্যাপার ঘটিতেছিল, তাহা প্রায় নিত্যকার ঘটনা হইয়া উঠিয়াছে। বেঙা আরও জানাইল —এমন বেরসিক, শক্ত ও একগুঁয়ে মেয়ে সে দেখে নাই। পরন্তপ রায় নেশার ঝোঁকে বিরক্ত হইয়া তাকে ছাড়িয়া দিল বটে, কিন্তু উদ্ধারকর্তাকে সহজে নিষ্কৃতি দিবে না।

পরিচয়ের পালা শেষ হইলে রাত্রি অনেক দেখিয়া তারা উঠিয়া পড়িল এবং নিজের নিজের বজরায় যাইতেছে বলিয়া দুইপথে যাত্রা করিল। কিন্তু, কিছুক্ষণ পরে পলাশী গ্রামের প্রান্তে দুই জনের হঠাৎ সাক্ষাৎ। উভয়ে বিস্মিত হইয়া উভয়কে প্রশ্ন করিল, এখানে কেন? নানা প্রশ্নের পরে পরস্পরে জানিল উভয়ে পলাশী-গ্রামস্থা তারা-নাম্নী এক গোয়ালিনীর প্রেমে পরিয়াছে। (বাণীবিজয় অবশ্য গ্রামে একবার আসিয়াছে, কিন্তু তার পক্ষে একবারই যথেষ্ট বিশেষ যদি সে গোয়ালের মেয়ে হয়। পাঠকের বোধ হয় পুটির কথা মনে আছে)। পাঠক কল্পনা করুন, এখানে ক্রুদ্ধ প্রেমিকদ্বয় কি কাণ্ডই না করিয়া বসিত, কিন্তু ইহারা কেহই সাধারণ লোক নয়, কাজেই যা হওয়া উচিত, তাহা হইল না, বরঞ্চ উভয়ের রুচি যে

এক পথগামী, ইহা স্মরণ করিয়া তারা পুলকিত হইয়া উঠিল। বেঙা আনন্দের আতিশয্যে গান ধরিল—'এক ফুলে দুই ভোমরা এল রে।' আর, বাণীবিজয় দুটি বোতল বাজাইয়া তাল দিতে লাগিল। ওদিকে যে অভিসারিণী তারা গোয়ালঘরের পাশে মশার কামড়ের মধ্যে নিশা জাগরণ করিতেছে, সে কথা উভয়ে ভুলিয়া গেল। বাণীবিজয় বলিতেছিল,—বাঃ দাদা—বেশ গলা। বেঙা তারিফ দিতেছিল,—বাঃ দাদা, বেশ সঙ্গত। তখন বাণী বলিয়া উঠিল,—দাদা আমি আর না নেচে পারছি না। মদ্যপানে সে এমন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল যে, সত্যই তার আর না নাচিয়া উপায় ছিল না। অতএব, ওদিকে অভাগিনী তারা মশা মারিতে লাগিল, এদিকে যুগলপ্রেমিক সেই গ্রামের প্রান্তে মাঠের মধ্যে নিশীথরাত্রে সঙ্গীত চালাইতে লাগিল—"এক ফুলে দুই ভোমরা এল রে,...এক ফুলে...দুই ভোমরা...এল রে...।'

১৪

দর্পনারায়ণের বজরার শয়নপ্রকোষ্ঠ। পাটাতনের উপর পুরু করিয়া গালিচা পাতা; কাঠের দেয়াল নানা বর্ণে চিত্রিত, কাঠের ছাদে সোনালি, রূপালি নানা রঙের ছবি; একদিকে দুটি বাতিদানের উপরে পীতাভ রঙের দীর্ঘ দুইটি মোমের মোমবাতি; দুইটি শিখায় জ্বলিতেছে; মোম গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে; দুই পাশে দুটি জানালা, খড়খড় বন্ধ, পর্দা টানিয়া দেওয়া, দরজাটি-বন্ধ, সেখানেও একটি রেশমী পর্দা ঝুলিতেছে। কক্ষের এক পার্শ্বে স্বল্প-উচ্চ একখানি মেহগিনির পালঙ্ক; শিয়রে ও পাদদেশে কাঠের উপরে হাতীর দাঁতের কারুকার্য্য, পালঙ্কে সমুদ্রফেনার ন্যায় সুকোমল সুগভীর শয্যা; সেই শয্যায় একটী যুবতী শয়ন করিয়া আছে, যুবতী নিদ্রামগ্না। পালঙ্কের নীচে গালিচার উপরে দেয়াল ঠেস দিয়া দর্পনারায়ণ—তাও চোখ নিদ্রাকুল।

দর্পনারায়ণ একবার যুবতীকে দেখিতেছে—আবার তখনি তার চোখ ঘুমে বন্ধ হইয়া আসিতেছে। এই রকম অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিতেছে। রাত্রি প্রায় শেষ প্রহর, মাঝ রাতে যুবতীকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া শয্যায় স্থাপন করা হইয়াছে। তাঁবুর মধ্যে সেই যে সে মূর্চ্ছিতা হইয়াছিল—এখনো জ্ঞান হয় নাই, তবে এখন আর মূর্চ্ছা নয় নিদ্রা। যুবতীকে আনিয়া যখন শয্যায় স্থাপন করা হইল—মোমের আলোকে দর্পনারায়ণ লক্ষ্য করিল, তার সীমন্তে সিন্দুর নাই। ব্যাকুল প্রণয়ী রাত্রে বারংবার জাগিয়া পূর্ব্বদিগন্ত লক্ষ্য করে, সেখানে রক্তরেখা না দেখিলে তার মনে যেমন স্বস্তির পুলক জাগে, দর্পনারায়ণের তেমনি ভাব হইল। প্রথম বাধা পার হইবার পর হইতে সে কেবলি যুবতীর বয়স অনুমান করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু, তার অনভিজ্ঞতা এই সমস্যার কোন সমাধান করিতে পারিতেছে না। মহুয়া যেমন ফুল হইয়াও ফলের মত, এই যুবতীও খানিকটা সেই রকম। মনটা ইহার ফুল, দেহটা ফল; একধারে এ বালিকা ও যুবতী। দেহের দিকে তাকাইলে তাকে যুবতী বলিয়া মনে হয়, মুখের দিকে তাকাইলে বালিকা। যৌবনের জোয়ার দেহে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনো যেন মুখ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছায় নাই।

দর্পনারায়ণ দেখিতেছিল—অবলীলার ভরে সুকোমল তনুলতা শয্যার উপরে বিলুণ্ঠিত; ডুরেশাড়ি তরঙ্গমালার মায়া বিস্তার করিয়া সমস্ত শরীর আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, মুষ্টিমেয় ক্ষুদ্র রক্তাভ পা দুখানি এক জোড়া পদ্মের কুঁড়ির মত নিস্তব্ধ; সোমলতার মত বাহুযুগলের একখানি বুকের উপরে ন্যস্ত; আর একখানি অলসভাবে শয্যাতলে বিন্যস্ত; মৃণালোপম, মসৃণ গ্রীবা হইতে আলো বিচ্ছুরিত হইতেছে; রক্তগোলাপসম্পুট অধরোষ্ঠ ঈষৎ ফাঁক, কুন্দকুঁড়ির মত একটি দন্তমুকুল অর্দ্ধপ্রকশিত, চক্ষু নিমীলিত; বিস্রস্ত কেশের অজস্র প্রাচুর্য্য পালঙ্ক ছাড়িয়া গালিচার উপরে লুটাইতেছে। শরীরে কোন অলঙ্কার নাই।

দর্পনারায়ণ দেখিতেছিল—ভাবিতেছিল—কি, দেখিতেছিল, কি ভাবিতে-ছিল আমরা জানি না, বোধ করি সেও ভাল করিয়া জানে না। সে দেখিতেছিল, যুবতীর দেহলতা গীতিস্তব্ধ একখানি রমণীয় বীণার ন্যায় পড়িয়া আছে, মাঝে মাঝে তার ঠোঁট নড়িতেছে। সে ভাবিতেছিল, যুবতী কি ভাবিতেছে! সে ভাবিতেছিল—স্বপ্নে কি ভাবা যায়! যুবতীর নাসিকা হইতে সুরভিত নিঃশ্বাস পুষ্পসৌরভের মাধুর্য্যে কক্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছে; যেন সুগন্ধ ধূপদানি হইতে সুধাসৌগন্ধে কোন্ অলক্ষ্য দেবতার বন্দনার মত উত্থিত হইতেছে; সমস্ত দেহখানি যেন অলৌকিক একগাছা মন্দার মালার ন্যায় কোন্ দেবতার পদপ্রান্তে লুটাইতেছে। তার মনে কি রকম বিস্ময় ও মোহের ভাব উপস্থিত হইল; মন্দিরের মধ্যে মানুষ অকারণে যেমন ভক্তির ভাব অনুভব করে, তার সেই অনুভূতি হইতে লাগিল। দর্পনারায়ণ নিজের অজ্ঞাতসারে, না বুঝিয়া, না ভাবিয়া কার উদ্দেশ্যে একটি প্রণতি নিবেদন করিল।

এই রকম ভাবিতে ভাবিতে দর্পনারায়ণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখিল। একটি বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে সে আসিয়া পড়িয়াছে; মঠে কোন ঘরবাড়ী, গাছপালা নাই, দিগ দিগন্ত বুঝিবার উপায় নাই। সে নিরুপায় হইয়া যেদিকে খুসি চলিতে লাগিল। একস্থানে আসিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল—এই তরুবিরল মাঠের মধ্যে একটি গাছ কোথা হইতে আসিল। একটি কচি তমাল গাছ সরল গতিতে উর্দ্ধে উঠিয়াছে, তার কৃষ্ণাভ পাতায় পাতায় মাণিক্যের দ্যুতি, অলৌকিক বাতাসে সমগ্র গাছটি তালে তালে দোদুল্যমান! এমন ললিত-সুষ্ঠু গাছ সে জীবনে দেখে নাই! পিছনে ফিরিয়া সে ততোধিক বিস্মিত হইয়া গেল—একটি অপূর্ব্ব লতা কোথা হইতে আসিল—করুণা বেহাগের তানের মত, লতাটি বিতত হইয়া গিয়াছে, গাঁটে গাঁটে তার ফুল; ফুলে ফুলে তার ভ্রমর, বাতাসে আন্দোলিত হইতেই অপূর্ব্ব ঝঙ্কার উঠিতেছে, গায়কের বীণা হইতে

যেমন ওঠে, কবির ছন্দ হইতে যেমন ওঠে, প্রেমিকের চিত্ত হইতে যেমন ওঠে। সে আগ্রহের সঙ্গে গাছ ও লতাটি দেখিতে আরম্ভ করিল—কিন্তু একি! এ তরুটি যেন তার চেনা—যতই ভাল করিয়া দেখে, ততই বেশী পরিচিত। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে গাছটি একটি নারীমূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল—রক্তদহের ইন্দ্রাণী! লতাটির দিকে ফিরিয়া তাকাইতে তার মধ্যেও যেন কোন এক পরিচিত নারীর আভাস ফুটিয়া উঠিতে লাগিল—একটু —আরো একটু এও কি সম্ভব—লতাটি তাঁবু হইতে আনীত যুবতীতে পরিণত হইল! দর্পনারায়ণের বিস্ময়ের আর সীমা নাই। একদিকে তার ইন্দ্রাণী, একদিকে সেই যুবতী—উভয়ের মাঝে সে হতবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দর্পনারায়ণ জাগিয়া উঠিল—চাহিয়া দেখিল, যুবতী তখনো নিদ্রিত। তার মন কেমন অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে ভরিয়া গেল। যদি কেহ জাগিয়া উঠিয়া দুর্লভ স্বপ্নকে সত্য বলিয়া দেখে, তার মনে যেমন আনন্দ হয়, তার মন সেই জাতীয় আনন্দে ভরিয়া গেল। পাছে সমস্তটাই স্বপ্ন হইয়া দাঁড়ায়, তাই বেশীক্ষণ তার যুবতীর দিকে তাকাইতে সাহস হইতেছিল না। রাত্রিটা কাটিলে যেন সে বাঁচে—স্বপ্নের অধিকারের সীমানা পার হইয়া যায়। তাই সে বজরার জানালা খুলিয়া বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। দেখিল—পূর্ব্বাশার পালঙ্কে দিগ্বধূর নিদ্রা ভঙ্গ হইতেছে। পূর্ব্বদিগন্ত মৌক্তিক রসে ভিজিয়া উঠিয়াছে—দিগন্তের সীমায় অতিসূক্ষ্ম অতিশুভ্র একটি মাত্র রজতরেখার আভাস। ঘন অন্ধকার দিগ্বধূর পর্য্যাপ্ত কেশরাশির মত মুহ্যমান, রজতরেখায় তার অর্দ্ধসুপ্ত হাসিটি; নলের রাজহংসের মত বৃহৎ চন্দ্র স্থগিত পক্ষে ধীরে ধীরে দময়ন্তীর প্রাসাদ বাটিকায় আরোহণ করিতেছে; পৃথিবীতে আর সব অন্ধকার। গঙ্গার উপরে রাত্রিশেষের শীতল বাতাস উঠিয়াছে; তাতে নবজাগ্রত তরঙ্গমালার মৃদু মর্ম্মর।

দর্পনারায়ণ মুগ্ধভাবে তাকাইয়া রহিল—এমন ভাবে সে কখনো দেখে

নাই। এতদিন সে চোখ দিয়া দেখিয়াছে মাত্র, এতদিনে চোখের সঙ্গে তার হৃদয়ের যোগ হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব দিগন্তের রজত-রেখা স্ফুটতর, দীর্ঘতর, বিস্তৃততর হইতে লাগিল এবং সেই রজতরেখার নিম্নতম প্রান্তে একটি সূক্ষ্ম ঘোর রক্তবর্ণ রেখা দেখা দিল। দিগ্বধূর সীমান্তের সিন্দুরের মত সেই রক্তরাগ ক্রমে গাঢ় ও বিস্তৃত হইতে লাগিল —প্রকৃতির মধ্যে চঞ্চলতা জাগিল;—দিগ্বধূর এবার ঘুম ভাঙিয়াছে। আবার সব নিস্তব্ধ, আবার বুঝি তার দেহ এলাইয়া পড়িল; পরক্ষণেই আবার জাগরণের লক্ষণ। প্রকৃতির অধিকার লইয়া আকাশের শতরঞ্চ খানিতে শতরঞ্চ খেলা চলিতে লাগিল, কখনো নিদ্রার জয়, কখনো জাগ-রণের। এবার দিগ্বধূ পালঙ্কের উপর উঠিয়া বসিল; উদয়াচলের শিখরে বিন্যস্ত রক্তবাগের অসংবৃত অঞ্চলখানি তাড়াতাড়ি বুকের উপরে তুলিয়া দিল; এবং পালঙ্ক হইতে নামিয়া বনের শ্যামল অন্ধকারের মধ্য দিয়া পাখীদের চঞ্চল করিয়া, পুষ্পরাশিকে চকিত করিয়া, শিশিরকণাকে ঝরাইয়া ধীরপদে কোথায় অন্তর্হিত হইল। প্রকৃতি এবারে জাগিয়াছে, পাখীর গানে, ফুলের সৌরভে, শিশিরের স্পর্শে! পূর্ব্বদিগন্তে তখনো মুহুর্মুহু রক্তরাগ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, যেন উদয়াচলের কালো নিকষ পাথরে শচীর অলঙ্কারের জন্য কোন্ স্বর্গীয় স্বর্ণকার নানাবিধ স্বর্ণের পরীক্ষা করিতেছে। দর্পনারায়ণ কতক্ষণ ধরিয়া এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিতে-ছিল, বুঝিতে পারিল না; কক্ষের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিল সেখানেও এক আশ্চর্য্য রহস্যের পট-পরিবর্ত্তন চলিতেছে, যুবতী জাগি-তেছে। তার ঘুমের ঘোর ছুটিয়া আসিয়াছে, অথচ ঘুম তখনো ছোটে নাই; দেহে জাগরণ আসিয়াছে, অথচ দেহ তখনো জাগে নাই; চোখ মেলিতেছে, অথচ সে চোখে তখনো দৃষ্টি সঞ্চারিত হয় নাই। একবার সে চোখ মেলিল পরক্ষণেই আবার নিদ্রিত। অধরে একটা রজতরেখা চমকিয়া গেল—পরক্ষণেই আবার নিস্তব্ধ; কিছুক্ষণ আবার সব নীরব নিস্তব্ধ। দর্পনারায়ণ বিস্ময়-বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল।

তার চিন্তা তখন আদিম মনোবৃত্তির গহন অরণ্যের মধ্যে উধাও হইয়া গিয়াছে। বাঁধা পথ এখানে নাই, প্রতি পদক্ষেপে নূতন পথ রচনা করিয়া চলিতে হইতেছে, তাতে আরাম নাই—কিন্তু, আনন্দ আছে। বুদ্ধি এখানে নির্বোধ, হৃদয় যেন ঘাসে লুপ্ত পথচিহ্নকে কিছু কিছু অনুমান করিতে পারিতেছে। মনোবৃত্তির এই আদিম অরণ্যতলে একদিন পুরূরবা, পার্থ, চন্দ্রাপীড়, নন্দী প্রভৃতির পুরুষচিত্ত উৎসুক পদের পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছে। বর্ষার শাদ্বল তাকে আচ্ছন্ন করে, হেমন্তের শিশির তাকে সিঞ্চিত করে, বসন্তের ফুলদল তার উপরে অলৌকিক পত্রাবলী রচনা করিয়া দেয়। দর্পনারায়ণের মত আজ সেই চিরন্তন নবতন মনোরথের পথরেখার যাত্রী।

আদিম দম্পতি আদিম বনভূমিতে যে-লীলা করিয়াছিল, প্রত্যেক নর-নারীর মধ্যে আজিও সেই লীলা চলিতেছে, মানুষের অগ্রগতি আদিম মনোবৃত্তির সেই শিলাস্তম্ভের সঙ্গে বদ্ধ; যতই আধুনিক হক না কেন, সকলকেই নূতন করিয়া সেই আদিম সীমানা হইতে যাত্রা আরম্ভ করিতে হয়; তাই পুরূরবার সঙ্গে দর্পনারায়ণের ঐক্য; আদিম দম্পতির সঙ্গে আধুনিক দম্পতির অনৈক্য নাই।

দর্পনারায়ণের যখন চমক ভাঙ্গিল, দেখিল, যুবতী শয্যার উপরে উঠিয়া বসিয়াছে। সে তার দিকে চাহিতেই যুবতী হাসিল। মধ্যরাত্রিতে নূতন দেশে আসিয়া পড়িলে অন্ধকারে সব অপরিচিত লাগে! কিন্তু দিগন্তে উষার প্রথম বিকাশের সঙ্গেই সমস্ত চিরপরিচিত বলিয়া ধরা পড়িয়া যায়—সেই পৃথিবী, সেই আকাশ, সেই প্রকৃতি। যুবতীর হাসিতে দর্পনারায়ণের মনের খট্‌কা বস্তুতঃ অপসারিত হইয়া গেল, যুবতীকে বুঝিল—যদিও তার পরিচয় পাইল না। দর্পনারায়ণ কি ভাবে কথা আরম্ভ করিবে ভাবিয়া না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তোমার নাম কি?

যুবতী মৃদুস্বরে উত্তর দিল—বনমালা।

১৫

বনমালা হাসিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তার মুখ ম্লান হইয়া গেল; একে একে গত রাত্রির সব কথা মনে পড়িতে লাগিল। নিদারুণ দুঃখের অভিজ্ঞতার প্রকৃতিই এই যে, মানুষের মনকে তা এমন অসাড় করিয়া দেয় যে, তার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে কিছু সময় লাগে। দারুণতম দুঃখের ঠিক পর মুহূর্ত্তেই হয়ত হাসি পায়, কিন্তু যতই সময় যাইতে থাকে হাসি ততই ম্লান হইয়া আসে। বনমালা সেই যে মুখ নত করিয়া বসিয়া রহিল, দর্পনারায়ণ তাকে দিয়া কিছুতেই কথা বলাইতে পারিল না। সে কথা বলিল না বটে, কিন্তু এই মলিন মূর্ত্তি তার মন্দ লাগিতেছিল না, যে হীরকখণ্ড রৌদ্রে ঝলমল করিতে থাকে, সন্ধ্যার অন্ধকারে বোধ করি তাকে এমনই দেখায়—উজ্জল নয়, ঈষৎ মলিন, তাই বলিয়া কম সুন্দর নয়। সুন্দর পদার্থ সব অবস্থাতেই মনোহর।

অনেকক্ষণ সাধাসাধির পর দর্পনারায়ণ জানিতে পারিল, বনমালার বাড়ী নিকটস্থ পলাশী গ্রামে—সেখানে গেলেই সকল বিষয় জানা যাইবে। দর্পনারায়ণ তিনখানা বজরা পলাশী গ্রামের ঘাটে লাগাইতে আলিবর্দ্দীকে হুকুম করিল। বজরা পলাশীর ঘাটে ভিড়িলে আলিবর্দ্দী ও বাণীবিজয়কে সঙ্গে দিয়া দর্পনারায়ণ বনমালাকে বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল। বনমালা চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে তার বৃদ্ধ পিতা কাঁদিতে কাঁদিতে তার পায়ের উপর আসিয়া পড়িল; সে শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধকে শান্ত করিয়া বসাইয়া তার মুখ হইতে সে সমস্ত কাহিনী অবগত হইল।

বৃদ্ধের নাম রামকান্ত রায়, জাতিতে ব্রাহ্মণ, অবস্থা দরিদ্র, নিবাস পলাশী গ্রামে। সংসারে তার একমাত্র সন্তান ঐ বনমালা; দরিদ্র বলিয়া

এবং কুলীন বলিয়াও বটে, বয়স্থা হইলেও তাকে বিবাহ দিতে পারে নাই। গতকল্য বনমালা গঙ্গায় জল আনিতে গিয়াছিল, আর ফেরে নাই। ব্রাহ্মণ নানাস্থানে সন্ধান করিয়াছে, আজ দর্পনারায়ণের কৃপায় তাকে ফিরিয়া পাইল। তখন দর্পনারায়ণ যতটুকু জানিতে ও যা দেখিয়াছে সব খুলিয়া বলিল; ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিল, আপনার কন্যা নিষ্কলঙ্কা, যদি সাক্ষীর প্রয়োজন হয় বলিবেন, আমি সাক্ষ্য দিব। তারপরে কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনার কন্যার বিবাহের কি করিতেছেন? ব্রাহ্মণ কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না—দর্পনারায়ণ কি বলিবে বোধ হয় আগেই ভাবিয়া রাখিয়াছিল, বলিল—আমি তাকে বিবাহ করিব। জোড়াদীঘির চৌধুরীদের নাম সে অঞ্চলে একেবারে অজ্ঞাত ছিল না, ব্রাহ্মণ তার প্রস্তাব শুনিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দর্পনারায়ণ তাকে শান্ত করিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিল।

দর্পনারায়ণের প্রস্তাব যখন অনুচরদের মারফৎ বজরায় রাষ্ট্র হইল তখন শরৎ পণ্ডিত ও বাণী বিজয় দাবাখেলায় মগ্ন। আসন্ন কিস্তির আশঙ্কায় বাণীবিজয় চিন্তিত ও শরৎ পণ্ডিত উল্লসিত, এমন সময়ে বিবাহের কথা শুনিয়া দুই পক্ষই সমান চিন্তিত হইয়া উঠিল। শরৎ পণ্ডিত পিল চক্র ছাড়িয়া অদৃষ্টচক্রের কথা স্মরণ করিয়া প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল—মসৃণ টাকের উপরে কি একটা জিনিষ যেন খুঁজিতে খুঁজিতে বলিল—ঠাকুর, বুড়ো বয়সে গঙ্গাস্নান করিতে এসে কি ফেরেই না পড়লাম। বাণীবিজয়ও কম বিস্মিত হয় নাই, সে বলিল—আর একটা বছর টোলে থাকতে পারলেই আমার কাব্য শেষ হত, কিন্তু বুঝি আর তা হয় না। বাণীবিজয়ের স্বার্থপরতায় ক্রুদ্ধ হইয়া শরৎ পণ্ডিত বলিল—তোমার কি ভায়া! গ্রাম ছাড়লেই তোমার মিট্‌ল, আমার যে না মলে নিস্তার নেই।

বাণীবিজয় মনের ভাব চাপিয়া রাখিয়া বলিল—দাদাবাবু যদি বিয়ে

করে, আমাদের কি দোষ? কি দোষ! শরৎ পণ্ডিত গর্জন করিয়া উঠিল, কর্ত্তা দাদাবাবুকে আর কি বলবে! দু'দশ দিন, না হয় দু'বছর মুখ দেখাদেখি বন্ধ হবে! কিন্তু তাকে যে শাস্তিটা দিতে পারল না; সেটা পড়বে আমাদের ঘাড়ে! এই পর্য্যন্ত বলিয়া গলার স্বর কিছু মৃদু করিয়া বলিল—আর তাও বলি, দাদাবাবুর কাজটা ভাল হচ্ছে না। অত বড় জমিদারের মেয়ে, সব ঠিকঠাক, ফিরে গিয়েই অঘ্রাণে বিয়ে এর মধ্যে এ কি কাণ্ড! আবার কিছুক্ষণ থামিয়া আরম্ভ করিল—এ কোথা কার কে? কুল নাই, শীল নাই, যাকে তাকে বিয়ে করলেই হ'ল! বাণীবিজয় বলিল—কিন্তু মেয়েটি সুন্দরী। এই কথাতে পণ্ডিত অত্যন্ত রাগিয়া উঠিল। পণ্ডিতের স্ত্রী অত্যন্ত বিসদৃশ কুৎসিত; কেহ কোন মেয়ের রূপের উল্লেখ করিলে পণ্ডিত ভাবে তার স্ত্রীকে বিদ্রূপ করা হইতেছে—কাজেই এবার এই পত্নীব্রত স্বামীর মুখ খুলিয়া গেল—রং ফর্সা হইলেই সুন্দর হয় না; নাক মুখ চোখের গড়ন দিয়ে কি মানুষ বোঝা যায়! মানুষ হয় মনে, মানুষ হয় ধনে! কি আছে ঐ মেয়েটার? আর কিই বা শ্রী। মাথা গিয়ে ঠেকেছে সেই আকাশে! মেয়েমানুষ কি অত ঢ্যাঙ্গা হলে চলে—না বাপু, অকালে গঙ্গাস্নান করতে এসেই মারা গেলাম। বাণীবিজয় তাকে লইয়া কৌতুক করিবার অভিপ্রায়ে বলিল—বুড়ো বয়সে কতটা পুণ্য হ'ল, সে খোঁজ রাখ? পণ্ডিত কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না যে, বাণীবিজয় অন্য গ্রামের লোক, ইচ্ছা করিলেই জোড়াদীঘি ত্যাগ করিতে পারে। তাই সে আপন মনে যেন বকিয়া যাইতে লাগিল—তোমার কি ভায়া, গ্রাম ছাড়লেই তুমি পর, তোমাকে আর কে কি বলবে। আমাকে যে চাল কেটে গাঁ থেকে তুলে দেবে। বাণীবিজয় বলিল—তা করলে নেহাৎ অনুচিত হবে না, দাদাবাবুকে তুমি কি শিক্ষাই দিয়েছিলে! শরৎ পণ্ডিত দেখিল, যুক্তির বেড়াজাল চারি দিকে ঘিরিয়া আসিতেছে—

কাজেই নিজেকে বাঁচাইবার জন্য একবার শেষ চেষ্টা করিল—আরে আমি শিখিয়েছি ধারাপাত, শুভঙ্করী, নামতা, তাতে কি পীরিতের কথা আছে নাকি? পড় নি তুমি? বাণী আগ্রহসহকারে বলিল—পড়েছি বলেই তো শিখেছি!

কি শিখেছ?

পীরিত করতে।

পণ্ডিত দেখিল ক্রমে তার পরাজয় ঘটিতেছে—পাণ্টা আক্রমণ না করিলে সুনিশ্চিত পরাজয়, কাজেই তাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া বলিল—ও সব তোমার দোষ,—তোমার ওই সংস্কৃত কাব্যের। ছিঃ ছিঃ; ওই সব পড়ে, না পড়ায়? পড়েছিলাম বটে খানিক—(পণ্ডিতের সংস্কৃতপাঠ চাণক্য শ্লোক পর্য্যন্ত)—কিন্তু ওই সব কাণ্ড দেখেই আর এগোই নি। (ইচ্ছায় নয়, শক্তির অভাবে) বাণীবিজয় বলিল—দেখ পণ্ডিত, আমাদের কাব্যে ও সব কাণ্ড আছে বটে, কিন্তু ও সব করত কারা, বড় বড় রাজা মহারাজারা; যেমন বীর দুষ্মন্ত। তুমি কি বল দাদাবাবু দুষ্মন্তের আদর্শ গ্রহণ না করে' তোমার আমার করবেন। বড় লোক বড় লোকের মত হবে। আর ছোট লোক তোমরা গোল্লায় যাও, চাল কেটে গাঁ থেকে উঠিয়ে দিক্—এই বলিয়া শরৎ পণ্ডিত লাফাইয়া আসন পরিত্যাগ করিল এবং বাহিরে যাইবার সময় বলিতে লাগিল—তোমার কি দাদা—ভিন গাঁয়ের লোক, গাঁ ছাড়লেই পর—আমার একেবারে সর্ব্বনাশ।

এইরূপ আলোচনা ও বিতর্ক কেবল যে ইহাদের মাঝে হইতেছিল, তা নয়। দর্পনারায়ণের সঙ্গে যারা আসিয়াছিল, সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে; পাচক, ঠাকুর, পাইক-পেয়াদা সকলেরই মুখ শুকাইয়া গিয়াছে; সমব্যথায় ব্যথিত বলিয়া সবাই একত্র হইয়া পরামর্শ করিল। অনেকক্ষণ আলোচনার পরে স্থির হইল—এই আসন্ন বিপদ হইতে কেহ

যদি উদ্ধার করিতে পারে, তবে সে আলিবর্দ্দী সর্দ্দার। একবার সর্দ্দারকে গিয়া ধরিতে হইবে। সকলে সর্দ্দারের কাছে যাইবে, এমন সময়ে হাসিমুখে আলিবর্দ্দী নিজেই আসিল। বলিল—যাক্ সব মিটে গেল। সকলে ভাবিল. দর্পনারায়ণের সুবুদ্ধি হইয়াছে। এমন সময়ে সর্দ্দার বাণীবিজয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিল—ঠাকুরমশাই—বড়ই দুঃখ হচ্ছে যে, বামুন হয়ে জন্মাইনি—নইলে এ বিয়েতে পুরুতগিরি নিশ্চয় পেতাম। কথাটা এমন গুরুতর বিপদের আভাসে পূর্ণ যে, বাণীবিজয় প্রথমবার শুনিয়া তা বিশ্বাস করিতেই পারিল না; সে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। তখন সর্দ্দার কথাটা সকলের বোধগম্য ভাবে পরিষ্কার করিয়া বলিল—দাদাবাবুর সঙ্গে রামকান্ত রায়ের মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে, এখানে আর পুরুত কই? সেই নিয়েই একটু মুস্কিল বেধেছিল; আমি বললুম, কেন—বাণীবিজয় ঠাকুর আছে, টোলে পড়া পণ্ডিত; দাদাবাবু শুনে বললেন—ঠিক হয়েছে, বাণীবিজয় বিয়ে দেবে। কেমন ঠাকুর সংবাদটা শুভ কি না? যে সংবাদে লোকের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হয়, চক্ষু উর্দ্ধে উঠে, নাসা বিস্ফারিত হইতে থাকে, তাহাকে কেমন করিয়া শুভসংবাদ বলা যায়! একমুহূর্ত্ত এই ভাবে থাকিয়া বাণীবিজয় গোঁ গোঁ শব্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, কেহ তাহার মাথায় জল দিতে, কেহ বাতাস দিতে আরম্ভ করিল -কিন্তু বাণীবিজয়ের মূর্চ্ছা-ভঙ্গের কোন লক্ষণ দেখা গেল না, কেবল শরৎ পণ্ডিতের মুখে একটা চাপা হাসির রেখা দেখা গেল। তার মনে হইল, ভগবান্ আছেন। নতুবা যে বাণীবিজয় এতক্ষণ তাকে বিদ্রুপ করিয়া আসিতেছে, তার উপরেই দণ্ডের খড়্গাঘাত এমন করিয়া আসিয়া পড়িবে কেন? সে পার্শ্বস্থ ব্যক্তিকে বলিল—কোন ভয় নেই, এখন এ মূর্চ্ছা ভাঙ্গবে না, এ যে নারায়ণের কপট নিদ্রা! তারপরে সে যেন নিজের মনেই বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেল—এইবার বোঝ বাপধন! পুরুতগিরি না করলে মারবে নাতি, করলে মারবে

কর্ত্তা! এখন কোন্ দিকে যাবে যাও! গ্রাম ছেড়ে গেলেও তেড়ে মারবে! এ বাবা ভীমরুলের রাগ, সাত তাল জলের মধ্যে গিয়ে কামড়াবে।

১৬

বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল, এমন কি বাণীবিজয়ের মূর্চ্ছাও বাধা জন্মাইতে পারিল না। দর্পনারায়ণ মূর্চ্ছার কথা শুনিয়া মাথায় ঠাণ্ডা জল দিতে বলিল, পৌষের গঙ্গার জল মাথায় পড়িতেই বাণীবিজয় লাফাইয়া উঠিল। সকলে তাকে ধরিয়া দর্পনারায়ণের কাছে লইয়া গেল, দর্পনারায়ণ বলিল, বিবাহ দিতে হইবে। আপত্তির প্রথম কথা তার মুখে বাহির হইতেই দর্পনারায়ণ হুকুম দিল, পণ্ডিতকে নদীতে ফেলিয়া দাও। কাজেই তাকে রাজী হইতে হইল। সে বাণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "পণ্ডিত তুমি আনন্দিত হও নাই?" বাণী স্বীকার করিল হইয়াছে; সে আনন্দে কাঁপিতে কাঁপিতে বিবাহের মন্ত্র পড়াইল।

এই বিবাহে দর্পনারায়ণের জীবনে কত বড় একটা গ্রন্থি পড়িয়া গেল, সে কি বুঝিতে পারিল? এই পলাশীর মাঠে ইংরাজে বাঙ্গালীতে যেদিন পলাশীর যুদ্ধ নামে, রাজনৈতিক হা-ডু-ডু খেলা হইয়াছিল, তার ফল যে কি হইবে, সে দিন কি কেহ বুঝিতে পারিয়াছিল? এমনই হয়। ছোট জিনিষ কাছে প্রকাণ্ড দেখায়, যতই দূরে যায় তার আকার ছোট হইয়া অবশেষে মিলাইয়া যায়; বড় জিনিষের বৃহত্ব নিকট হইতে উপলব্ধি হয় না, দূরে যাইতে যাইতে বড় হইয়া দেখা দেয়, ক্রমে তাহা আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। নিকটে দাঁড়াইলে হিমালয় শিলাস্তূপ মাত্র--দূর হইতে পৃথিবীর মানদণ্ড; পলাশীর যুদ্ধ সেদিন ছিল সিরাজের দণ্ড—আজ ভারতবর্ষ সেই দণ্ডে দণ্ডিত। দর্পনারায়ণের বিবাহকে যুবকের খেয়াল বলিয়া মনে হইয়াছিল, কিন্তু পাঠক দেখিতে পাইবেন, এই ঘটনায় গল্পের মোড় ফিরিয়া গেল।

এই বিবাহের শানাইএর করুণ সুরে জোড়াদীঘির চৌধুরীদের একটা পর্ব্বের সমাপ্তির আভাস ধ্বনিত হইয়া উঠিল। কে শুনিয়াছিল! তখন কেহ শুনিতে পায় নাই—আজ আমরা শুনিতেছি! তখন শোনা যায় নাই বলিয়াই আজ শুনিতেছি, কারণ এ সঙ্গীত মহাসঙ্গীত!

রোরুদ্যমান নববধূকে লইয়া দর্পনারায়ণের নৌ-বহর স্বদেশ যাত্রা করিল। প্রথমে গঙ্গা ধরিয়া উজানে, তারপর পদ্মার স্রোতের টানে ভাটিতে। গঙ্গা অতিক্রম করিতে কিছু বিলম্ব হইল বটে, কিন্তু পদ্মায় পড়িতেই নৌ-বহর নক্ষত্রপুঞ্জের মত ছুটিয়া চলিল। চারঘাটের নিকটে বড়ল নদের মুখে নৌকা বাঁধা হইল, রন্ধন হইলে আহারাদি সমাপ্ত হইল, নৌ-বহর পুনরায় যাত্রা করিল। সেদিনের বড়ল নদ পদ্মার যোগ্য সহচরী ছিল, পদ্মার উদ্দাম স্রোত তার নাড়িতে প্রবাহিত হইত; বাংলার প্রান্তরে পদ্মার কালীমূর্ত্তি যে শতাধিক ডাকিনী নদী-সহচরী সহ নৃত্য করিত—বড়ল ছিল তাদের অন্যতম। আজিকার বড়ল সেদিনের নৌবাহ্য নদীর প্যারডি মাত্র; তার আজিকার কলধ্বনি সেদিনের রুদ্রসঙ্গীতের ব্যঙ্গধ্বনির মত শ্রুত হয়। আজিকার বড়ল দেখিয়া সেদিনের নদীকে কল্পনা করিতে চেষ্টা করিও না, ভুল করিবে।

যতই জোড়াদীঘির নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, দর্পনারায়ণের মনে ততই কেমন যেন ভয় করিতে আরম্ভ করিল। উদয় নারায়ণের বিরাট মূর্ত্তি আকাশের প্রান্ত হইতে কালবৈশাখীর মুষ্টিমেয় মেঘের মত দেখা দিল, ক্রমেই সে মেঘ প্রলয়ের আকৃতি ধারণ করিতে থাকিল—ক্রমে সমগ্র আকাশ তার কলার ছায়ায় যেন অন্ধকার হইয়া গেল। প্রথমে দর্পনারায়ণের মুখের হাসি মিলাইল; তারপরে মুখ গম্ভীর হইল; অবশেষে মুখ ভয়ে পাংশুবর্ণ হইল। শরৎ পণ্ডিত নৌকায় উঠিয়া পর্য্যন্ত হুঁকার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ করে নাই; বাণীবিজয় সমস্ত পথ আনন্দে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়াছে।

অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলা নৌবহর আসিয়া জোড়াদীঘির ঘাটে পৌঁছিল। আগে সংবাদ পায় নাই বলিয়া অভ্যর্থনার জন্য কেহ আসে নাই। দর্পনারায়ণ একাকী হইলে সোজা চলিয়া যাইত, কিন্তু নববধূকে এখন তো লওয়া যায় না। আগে সংবাদ দেওয়া দরকার। কিন্তু কে এই দুঃসাহসিক কাজের ভার লইবে? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাণী-বিজয় যাচিয়া এই সংবাদ দিবার ভার লইল। দর্পনারায়ণের অনুমতি লইয়া সে আনন্দে কাঁপিতে কাঁপিতে পোটলা-পুটলী লইয়া দ্রুতপদে নৌকা ত্যাগ করিল।

বাণীবিজয় অনেক ভাবিয়া স্থির করিয়াছিল যে, যত শীঘ্র দুর্জ্জনের সংসর্গ ত্যাগ করা যায়, ততই ভাল। কাজেই সে এই উপলক্ষ্য করিয়া নৌকা হইতে বিদায় লইল, কিন্তু চৌধুরী-বাড়ীর দিকে না গিয়া সদর-পথ ছাড়িয়া সোজা টোলের দিকে যাত্রা করিল। সকলে কিছুক্ষণ বাণী-বিজয়ের জন্য অপেক্ষা করিল—না ফিরিল সে, না আসিল অন্য লোক।

দুঃসংবাদ কেহই দিল না—তবু যথাস্থানে গিয়া পৌঁছিল। উদয়নারায়ণ তখন বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন। সংবাদ অনুমান করিয়া লইয়া তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"এই কে আছিস, দেউড়ী বন্ধ করে দে।" কিন্তু দেউড়ী কে বন্ধ করিবে? সকলেই উদয়নারায়ণকে ভয় করে, তবু দর্পনারায়ণের পথ রুদ্ধ করিয়া দেউড়ী বন্ধ করিবার সাহস কারও নাই। দেউড়ী বন্ধ হইল না দেখিয়া বৃদ্ধ উঠিয়া পড়িলেন; দেউড়ীর কাছে গিয়া দেখিলেন, লোকজন কেহ নাই, তখন বৃদ্ধ স্বয়ং ভীমের বুকের পাটার মত সেই বিশাল ফটক ধীরে ধীরে বন্ধ করিয়া দিলেন—অর্গল রুদ্ধ করিয়া দিলেন। দরজা বন্ধ হইলে বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন। পাশের কক্ষ হইতে বৃদ্ধের খাস-খানসামা লক্ষ্য করিল—বৃদ্ধ হাঁপাইতেছেন।

এই খবর দর্পনারায়ণের কাণে গেল। আলিবর্দ্দীকে বজরা খুলিয়া দিতে বলিল,—দাদাবাবু, তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না। আমি দেউড়ী ভাঙব।

দর্পনারায়ণ বলিল—তার দরকার নেই—বরঞ্চ আমার বজরা খুলে দে। আর তুই যদি চাস তো সঙ্গে আসতে পারিস, আর কারো যাবার প্রয়োজন নেই। উপায়ও ছিল না, কারণ ইতিমধ্যে অন্য নৌকায় সকলে যে যার মত সরিয়া পড়িয়াছে। আলিবর্দ্দী বৃথা ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে বজরায় উঠিয়া মাঝিদের নৌকা খুলিয়া দিতে আদেশ করিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে দর্পনারায়ণের বজরা স্রোতের টানে আপন মনে উদ্দেশ্যহীন ভাবেই যেন ভাসিয়া চলিল।

দর্পনারায়ণ নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া শুনিতে পাইল—প্রথম প্রহরের শিয়াল ডাকিয়া উঠিল; প্রথমে অতি নিকটে, নদীপারের ঝাউঝাড়ের মধ্যে, তার পরে আরও একটু দূরে আমবাগানের মধ্যে, তারপরে আরও দূরে, ক্রমে গ্রাম-গ্রামান্তরের সম্মিলিত শিবাধ্বনি দিগন্ত ব্যাপিয়া যেন শব্দের বেড়াজাল নিক্ষেপ করিল। শিবারব থামিয়া যাইতে নদীর কলধ্বনি শ্রুত হইল; দর্পনারায়ণ অনুভব করিল, স্রোতের বেগে নৌকার পাটাতন কাঁপিতেছে, দুলিতেছে, টলমল করিতেছে। দর্পনারায়ণ শুনিতে লাগিল, দূরে ঢেঁকিতে ধান কুটিবার শব্দ; বেনেবৌর ঠক্ ঠক্ আওয়াজ, হুতুমের ঘুৎকার, আর কচিৎ বিলম্বিত নৌকার শঙ্কিত দাঁড় ফেলিবার ধ্বনি। ক্রমে রাত্রি গভীর হইল; বিনা সম্ভাষণে, বিনা অভ্যর্থনায় দর্পনারায়ণ মাতৃহীন গ্রাম ত্যাগ করিয়া নববধূ সহ গভীরতর রাত্রির দিকে ভাসিয়া চলিল।

ইন্দ্রাণী

১

সেদিন সকাল বেলা রক্তদহের জমিদার-বাড়ীর একটি কক্ষে দুই জন ব্যক্তি কথা বলিতেছিল। একজন বৃদ্ধ; সে তক্তপোষের উপরে বসিয়া ছিল, আর একজন কিশোরী, সে বৃদ্ধের ঠিক পিছনেই দাঁড়াইয়া ছিল। বৃদ্ধ সম্মুখের দেয়ালের একটা বিশেষ ভগ্ন-চিহ্নের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মৃদু মৃদু দুলিতে দুলিতে বলিতেছিল—ভালই হয়েছে মা! ভগবান রক্ষা করে দিয়েছেন। আমি বুড়োকে জানি কি না!—

কিশোরী এবার একটু আপত্তি করিল—না, না, তাঁর দোষ কি?

বৃদ্ধ তার কথা শেষ না হইতেই আরম্ভ করিল—তাঁর দোষ কি! তা বটে, তুমি ছেলেমানুষ, তুমি জানবে কি করে! আমি ওর তিন পুরুষের ইতিহাস জানি! আমার অজানা কিছু নেই! আমাদের চিনিডাঙ্গার বিলটার জন্যে ওর কি আজ থেকে লোভ! কতবার কত রকম চেষ্টা করেছে। ওর পক্ষে ছিল সেই দুষ্‌মন, বেটা মরেছে, সেই স্বরূপ সর্দ্দার, বেটা কতবার লাঠিয়াল নিয়ে পড়ে জবর দখলের চেষ্টা করেছে। নেহাৎ পড়েছিল আমার পাল্লায়, পেরে ওঠেনি।—ডান পায়ের তলদেশে বামহস্ত বুলাইতে বুলাইতে, বৃদ্ধ এই সব পুরাতন ইতিহাস বলিতেছিল; শরীর অগ্র-পশ্চাতে মৃদু মৃদু দুলিতেছে—আর চক্ষু সেই ভগ্নচিহ্নটার প্রতি নিবদ্ধ!

—আর আমাদের ধূলো-উড়ির কুঠিটার কথা তো জান! জান না, আচ্ছা তবে শোন।—কিশোরীর উত্তরটা নিজেই ভাবিয়া লইয়া বৃদ্ধ বলিতে লাগিল—তখন তোমার বাবা ছিলেন বেঁচে। বুড়ো প্রস্তাব পাঠালে কুঠিটা কিনতে চায়। আমরা রাজি হলাম না দেখে বুড়োর সে কি রাগ! সেবার পৌষমাসে লাট দাখিল করিতে আমি গিয়েছি সদরে, এর মধ্যে বুড়ো করছে কি (বৃদ্ধের দৃষ্টি যেন ওই ভগ্ন চিহ্নটা হইতে পরিবারের এই ভগ্ন ইতিহাস সংগ্রহ করিতেছিল) লোকজন নিয়ে গিয়ে পড়েছে কুঠির উপরে! বুঝলে মা, সেবার লাঠালাঠি করে আমাদের পাঁচ হাজার টাকা বের হয়ে গেল! এই বলিয়া বৃদ্ধ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—এবার বুড়ো ভেবে ভেবে আচ্ছা বুদ্ধি বের করেছিল, এবার আর লাঠালাঠি নয়, মামলা মোকর্দ্দমা নয়, বিনা পরিশ্রমে অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা! আর অর্দ্ধেক-ই বা কেন? পুরো রাজত্ব নেবার মতলব বের করেছিল। নাতির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে জোড়াদীঘি আর রক্তদ' একাকার করে নেবে! বুড়োর আগ্রহ দেখে আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বৃদ্ধ একটু থামিল, তারপরে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কষ্ট পেয়েছ মা!

কিশোরী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—কষ্ট পাব কেন? বৃদ্ধ যেন এই উত্তরই আশা করিতেছিল, কাজেই বলিয়া উঠিল—আমিও তাই বলি, কষ্ট পাবে কেন? নসরৎপুরের লাহিড়ীদের ছোট ছেলের জন্য কতদিন ধরে ওরা সাধাসাধি করেছে, বুড়োর জন্যেই তাদের কথা দিতে পারিনি!

কিশোরী ইহার কোন উত্তর দিল না। কিন্তু, হঠাৎ মুখ তুলিতেই তার দৃষ্টি সম্মুখের আরশিতে গিয়া পড়িল; কিশোরী নিজেকে যেন চিনিতে না পারিয়া চমকিয়া উঠিল! এ কি! একরাত্রিতে মানুষের এমন পরিবর্ত্তন কি করিয়া সম্ভব হয়। কাল সন্ধ্যাবেলাতে সে

দর্পনারায়ণের বিবাহ সংবাদ পাইয়াছে; সারারাত্রি ঘুমাইতে পারে নাই সত্য; কিন্তু এমন যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা ত' সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। কাশ্মীরের উপত্যকায় বসন্তের প্রারম্ভে জাফরাণের ফুল ফুটিয়া ওঠে; রাত্রিবেলায় প্রকৃতির কি খেয়াল হয়, তুষার পড়ে; ভোরবেলা ক্ষেতের মালিকরা জাগিয়া দেখে শুভ্র তুষার-প্রলেপে পুষ্পিত ক্ষেত মুহ্যমান। কিশোরীর লাবণ্য-মুকুলিত মুখশ্রীতে এক রাত্রির মধ্যে সেইরূপ দুঃসংবাদের তুষার-পাত ঘটিয়াছে। কিশোরী চমকিয়া উঠিল, কিন্তু কোনরূপ শব্দে বা ভাবে তা প্রকাশ করিল না।

বৃদ্ধ তখনও বলিয়া চলিয়াছে—বুঝলে মা এই যে বিয়েটা করলে নিশ্চয় খুব মোটা হাতে মেরেছে। নইলে বুড়ো অমনি একমাত্র নাতিন বিয়ে দেয় নি!

বিবাহের সংবাদ ইন্দ্রাণী ও তাহার দেওয়ান-জ্যেঠা শুনিয়াছে বটে, কিন্তু কোথাকার মেয়ে, কি নাম, কেমন দেখিতে, কত টাকা পাইল, কিছুই শোনে নাই। তবে উভয়েই অনুমান করিয়া লইয়াছে, ভালরকম না পাইলে অমনি বিবাহ হয় নাই।

বৃদ্ধ বলিতে লাগিল আমাদের চেয়ে জমিদারি অনেক বড় আছে, টাকা-ওয়ালা লোকও কম নেই, কিন্তু আমার মার মত সুন্দরী ত' চোখে পড়েনি। সে বিষয়ে বুড়ো জিততে পারে নি।

দেওয়ান ইন্দ্রাণীর রূপের প্রশংসা করিল বটে, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই যদি তাকে দেখিত, তবে চমকিয়া উঠিত। ইন্দ্রাণীর মুখ এত বিবর্ণ ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল।

বেলা হইয়াছে দেখিয়া বৃদ্ধ উঠিল, খড়মের শব্দ তুলিয়া দরজা পর্য্যন্ত গেল, আবার কি ভাবিয়া যেন ফিরিয়া আসিল, বলিল আচ্ছা মা, নসরৎপুরের লাহিড়ীদের কি একটা খবর দেব?

ইন্দ্রাণী অতি সংক্ষিপ্ত এবং সেই জন্যই অতি অমোঘ একটা 'না' শব্দের দ্বারা বৃদ্ধকে অর্দ্ধপথে নিরস্ত করিল।

বৃদ্ধ বলিল—কিন্তু মা, তোমার বিয়ের বয়স হয়েছে। ইন্দ্রাণী বলিল—কুলীনের মেয়ের আবার বিয়ের বয়স আছে না কি, দেওয়ান-জ্যেঠা ?"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল—কিন্তু কুলিনের ছেলের ত' বয়স হয়। আমি যে এ ভার আর বইতে পারি না। এত বড় জমিদারি দেখা কি এই বুড়োর কর্ম্ম !

ইন্দ্রাণী শান্ত ভাবে বলিল—বেশ ত, এবার থেকে আমি আপনাকে সাহায্য করব।

এই অপ্রত্যাশিত উত্তরে বৃদ্ধ বিশেষ কিছু বলিতে পারিল না। কিন্তু এ ভার যে কত গুরুতর তাহা স্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্যই যেন প্রকাণ্ড একটা চাবির তোড়া ইন্দ্রাণীর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল—তা' হলে তোমার জিনিষের ভার তুমিই নাও। ইন্দ্রাণী নত হইয়া চাবির তোড়া তুলিয়া আঁচলে বাঁধিল। বৃদ্ধ এতটা আশা করে নাই। কোন কথা না বলিয়া সে দাঁড়াইয়া থাকিল—কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল, দেয়ালে সেই ভগ্ন চিহ্নটাকে তার দৃষ্টি অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল, সেইটার মধ্যেই যেন এই সমস্যার সমাধান লিখিত আছে। কিন্তু, সেটা খুঁজিয়া না পাইয়া বৃদ্ধ ক্ষুণ্ণমনে বাহির হইয়া গেল। বৃদ্ধ চলিয়া গেলে ইন্দ্রাণী অন্য দ্বারে দিয়া কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

যতক্ষণ ইহারা ঘরেয় মধ্যে কথাবার্ত্তা বলিতেছিল পাশের ঘর হইতে একটি রমণী আড়ি পাতিয়া সব শুনিতেছিল। এখন সে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। এতক্ষণ ভয়ে ভয়ে সে হাসিতেছিল ; হাসিতে দম আটকাইয়া যাইতেছিল, তবু জোরে হাসিবার উপায় ছিল না। এইবার হাসিতে হাসিতে সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িবার উপক্রম করিল। বসন্তের অকারণ বাতাসে কম্পিত মাধবীলতা হইতে যেমন রাশি রাশি মাধবী-মঞ্জরী খসিয়া খসিয়া পড়ে, তেমন তার সারা অঙ্গ হইতে হাসি-রাশি উচ্ছ্বলিত হইয়া ঘরময় বিকীর্ণ হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে হাসি থামিল—রমণী ঋজু হইয়া দাঁড়াইল, রমণী যুবতী, নাম চাঁপা।

চাঁপার একটু ইতিহাস আছে। অল্প বয়সে চাঁপার বিবাহের সম্বন্ধ হয় কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পূর্ব্বে সম্বন্ধ ভাঙিয়া যায়। অনুসন্ধানে জানা গেল বরপক্ষ ইন্দ্রাণীর পিতার নিকট হইতে জানিতে পারে যে চাঁপা এক জমিদারের রক্ষিতার কন্যা। বিবাহ ভাঙিয়া যাওয়ার কিছুদিন পরে চাঁপার মাতার মৃত্যু হয়; চাঁপা নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িল। ইন্দ্রাণীর পিতা দয়া করিয়া তাকে গৃহে স্থান দিলেন। সেই হইতে সে জমিদারবাড়ীর পরিবার-ভুক্ত। বয়স হইলে সে জন্মের ও বিবাহবিভ্রাটের ইতিহাস অবগত হইল। তার নারী-মনের সমস্ত ক্রোধ ইন্দ্রাণীর পিতার উপরে পড়িল। তাঁর মৃত্যু হইলে উত্তরাধিকারসূত্রে ইন্দ্রাণী তার ক্রোধের পাত্র হইল। চাঁপার আর বিবাহ হইল না; জানিয়া শুনিয়া কে আর বিবাহ করিবে; তারও বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। জমিদার পরিবারে সে এখন ইন্দ্রাণীর সঙ্গী, সহচরী ও খানিক পরিমাণে অভিভাবক। তার মনের কথা কেহ জানিত না, কাজেই কেহ চাঁপার আন্তরিকতায় সন্দেহ করিত না।

চাঁপা ইন্দ্রাণীর অপেক্ষা বয়সে বড়—তবে তার বয়স ঠিক কত তা অনুমান করা সহজ নয়। সে চেষ্টাও কেহ করিত না। মুখ দেখিলে তার বয়স হইয়াছে মনে হয়, আচরণে তার বয়স ধরা পড়ে, কিন্তু তার শরীর বলিয়া দেয় মুখের সাক্ষ্য নিতান্তই মৌখিক। মুখে তার শারদীয় প্রৌঢ়তা, দেহে তার বাসন্তিক লাবণ্য। তার শরীরে যৌবনের জোয়ারের জলরেখা উচ্চতম সীমায় পৌঁছিয়াছে, কিন্তু এখনও কমিতে আরম্ভ করে নাই। তার সৌন্দর্য্যের পরম পরিণামের মধ্যে কান পাতিয়া শুনিলে বিদায়ের রাগিণীর ক্ষীণ পূর্ব্বাভাস শ্রুত হয়।

চাঁপাকে দেখিতে দীর্ঘ নয় বরঞ্চ একটু খর্ব্ব বলিয়াই মনে হয়। মুখখানি গোল, হাত-পা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিটোল, মাংসল। একদল মেয়ে আছে যাদের সমস্ত শরীরের মধ্যে কায়িক ভাবটাই অশোভন রকম উগ্র, চাঁপা সেই দলের। তাকে দেখিলেই তার শরীরটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রূপ ইহার

কারণ নয়। এক শ্রেণীর রূপ আছে, যা দর্শককে আত্মবিস্মৃত করিয়া দেয়, সে রূপ মুগ্ধকর। আর এক জাতীয় রূপ আছে, দর্শককে যা অকস্মাৎ সচেতন করিয়া তোলে, সে রূপ লুব্ধকর; চাঁপার রূপ সেই জাতীয়। প্রথম জাতীয় রূপ অমূল্য, তার দর করিবার কথা মনে হয় না চাঁপার রূপ মূল্যবান্, স্বভাবতই দরের কথা মনে ওঠে, তার রূপ একধারে অস্ত্র ও শস্ত্র। আত্মরক্ষা করা চলে, আবার আবশ্যক হইলে নিক্ষেপ করিয়া আততায়ীকে আঘাত করাও অসম্ভব নয়।

দর্পনারায়ণের সঙ্গে ইন্দ্রাণীর বিবাহের কথা শুনিয়া চাঁপা মর্ম্মাহত হইয়াছিল। সে ভাবিল তার জীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে; যার প্ররোচনায় তার বিবাহ ভঙ্গ হইয়াছে, তার কন্যার যে এমন সহজে এমন বহু-বাঞ্ছিতা ঘরে বিবাহ হইবে, ইহা তার পক্ষে কল্পনা করাও ক্লেশদায়ক; চোখের উপরে সহ্য করা ত' অসম্ভব। কিন্তু এ বিবাহ ভাঙ্গিয়া দেওয়া তার সাধ্যাতীত। চাঁপা ভাবিল, ইন্দ্রাণীর বিবাহ যদি সত্যই হইয়া যায়; তবে সে অন্য কোথাও গিয়া সুবিধামত বিবাহ করিয়া জীবন-যাপন করিবে। কয়েক মাস তার বড়ই দুশ্চিন্তায় কাটিল।

আজ সকাল বেলা সে পাশের ঘরে কাজ করিতেছিল, এমন সময়ে শুনিতে পাইল, দেওয়ানজী ও ইন্দ্রাণীতে গোপনে কি আলাপ হইতেছে। চাঁপা আড়ি পাতিল এবং যে-সংবাদ সর্ব্বাপেক্ষা তার কাম্য অথচ যা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল—সেই সংবাদই শুনিতে পাইল। চাঁপা শুনিল, দর্পনারায়ণ অন্যত্র বিবাহ করিয়াছে। তার হাতের কাজ পড়িয়া রহিল—রুদ্ধ হাসির আবেগে ফাটিয়া পড়িতে লাগিল; দেওয়ানজী ও ইন্দ্রাণী পাশের ঘর হইতে চলিয়া যাইতেই সে সগর্ব্বে সানন্দে বিজয়ীর মত শত্রুর পরিত্যক্ত রণক্ষেত্রে হাসির আবেগে লুটাইয়া পড়িল।

২

ইন্দ্রাণী ঘরে ফিরিয়া গিয়া শয্যা গ্রহণ করিল। এই সংবাদ শুনিবার পর হইতে সে ঘর হইতে বাহির হয় নাই, খাদ্য গ্রহণ করে নাই, লোকের সঙ্গে কথা বলে নাই, নীরবে একাকী পড়িয়া আছে। এক রাত্রে তার চোখের কোনে কালি পড়িয়াছে, কপোল পাণ্ডুরাভ হইয়াছে, অধরের লালিত্য শুকাইয়া গিয়াছে—দীর্ঘ কেশদাম আজ অবিন্যস্ত। তবু যে তার সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র ম্লান হইয়াছে এমন মনে হয় না; সোনা যদি বিশুদ্ধ হয়, তবে তাকে যতই ঘস না কেন, আগুনে পোড়াও, অনাদরে ফেলিয়া রাখ, তা আরো সুন্দর হইয়া ওঠে। দুঃখ সুন্দরকে সুন্দরতর করিয়া তোলে।

ইন্দ্রাণীর মত সুন্দরী ক্বচিৎ দেখা যায়—তার মানে ইহা নয় যে বাঙ্গলা দেশে সুন্দরী মেয়ে নাই। বাঙ্গালী নারীর সৌন্দর্য্যে লালিত্যের ভাগ কিছু বেশি। এই নদীমাতৃক দেশের মেয়েরা নদীর মতই ললিত-তরল; ইন্দ্রাণী পাষাণ-সুন্দরী। বিধাতা যে ছাঁচে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, সুভদ্রাকে গড়িয়াছেন, তারই একখণ্ড পাথর যেন তাঁর শিল্প শালার এক কোণে অলক্ষ্যে পড়িয়াছিল; সেই পৌরাণিক পাষাণ-খণ্ড নিয়া বিধাতা ইন্দ্রাণীকে গড়িয়াছেন; সেদিক দিয়া বিচার করিলে ইন্দ্রাণী বাঙ্গালী নয়, পৌরাণিকী।

তার সুঠাম উন্নত সরল দেহ বাঙ্গালী মেয়ের তুলনায় কিছু দীর্ঘ; তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এমন একটি অনুপাতের সামঞ্জস্য আছে যে তার দিকে তাকাইলেই একদৃষ্টিতে সমগ্র মূর্ত্তিটি চোখে পড়ে। সাধারণতঃ এমনটি হয় না; অধিকাংশ মেয়ের মূর্ত্তি একসঙ্গে দেখা যায় না; কারো

চোখে পড়ে মুখ, কারো অধরোষ্ঠ, কারো চোখ দুটি, কারো গ্রীবাভঙ্গী, কারো বাহুলতা, কারো গতিচ্ছন্দ। ইন্দ্রাণীর চন্দ্রকান্ত ললাটের নিম্নে ভ্রূ-রেখা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে হইতে কোথায় যে শেষ হইয়া গিয়াছে ঠিক বোঝা যায় না; সেই ভ্রূর নীচে চোখ দুটি ভাসমান পদ্মের মত বিগলিত মাধুর্য্যপূর্ণ নয়; স্থির মহিমায় অচঞ্চল; গোলাপের দলের মত পাতলা অধরোষ্ঠ, যেন অনায়াস-দৃঢ়তায় অন্তরের রহস্যকে চাপিয়া রাখিয়াছে; শুক্তিপাণ্ডু দুই কপোলে লাবণ্যের পুষ্পমঞ্জরী রজনীগন্ধার বৃন্তকে লাঞ্ছিত-করা সরল গ্রীবাতটে তিনটি মাত্র রেখা; মর্ম্মর-ধবল নিটোল বাহু যুগলের শেষপ্রান্তে তপ্ত রক্ত দুইখানি করপদ্ম পাঁচটি করিয়া ক্রমসূক্ষ্মায়মান কোমল সুগোল অঙ্গুলিতে পর্য্যবসিত। যখন সে চুল খুলিয়া দেয়, সেই সুদীর্ঘ সরল সুপ্রচুর চিক্কণ কেশরাশিতে কশাহত আলো চঞ্চল হইয়া ওঠে।

বাঙ্গালী মেয়েদের মুখ যেন স্বচ্ছ কাচে নির্ম্মিত। সে দিকে চাহিলেই এক মুহূর্ত্তে ভিরের সব রহস্য চোখে পড়ে, এক মুহূর্ত্তে তা দেখা শেষ হইয়া যায়। ইন্দ্রাণীকে অত সহজে বুঝিবার উপায় নাই, তার মুখ যেন দর্পণের কাচে রচিত, স্বচ্ছ নির্ম্মল তাকে দেখা যায়, তার অন্তরের রহস্যকে নয়; দর্শক সেই দর্পণোপম মুখে নিজেকেই দেখিতে পায়, ইন্দ্রাণীকে নয়; দর্পণের প্রতিফলিত আলোকে তাকে ভাল করিয়া চোখে পড়িতে চায় না, ইন্দ্রাণী দূর-গগনের নক্ষত্রের মত নিজের আলোর আড়ালে নিজে অবগুণ্ঠিত। যে খুব বেশি তাকে দেখিতে পায়, সেও তাকে কিছুতেই বুঝিতে পারিবে না।

এই জাতীয় আত্মসমাহিত নারীরা দুঃখের টীকা লইয়াই জন্মগ্রহণ করে; সীতাকে দেখ দময়ন্তীকে দেখ, সাবিত্রীকে দেখ, দ্রৌপদীকে দেখ। ইহারা অসাধারণ বলিয়াই সাধারণের উপেক্ষার পাত্র। সংসারের হাটে বাজারে চাল, ডাল, নুন, তেল মাপিবার তুলাদণ্ড যথেষ্ট, কিন্তু এমন আলৌকিক সোণা মাপিবার নিক্তি কয়টি আছে; তেমন জহুরীই বা কোথায়। ইহারা

সুখী হইতে পারে না, বিধাতাও ইহা জানেন; সেই জন্য সুখের পরিবর্ত্তে ইহাদিগকে দিয়াছেন মহাকাব্যের অমরতা। ইন্দ্রাণীর দুরদৃষ্ট যে সে ব্যাস বাল্মীকির হাতে পড়িল না।—

ইন্দ্রাণী গুরুতর আঘাত পাইয়াছে; মনের কথা কাউকে বলা তার স্বভাব নয়, সেই জন্য চাপা দুঃখের আগুনে তার হৃদয়ে পুটপাক চলিতেছে। দর্পনারায়ণকে সে ভালবাসিয়াছিল, দর্পনারায়ণ অন্যত্র বিবাহ করিল। কিন্তু, শুধু কি ইহাই? আঘাত আরও গভীর মর্ম্মস্থলে! আঘাত লাগিয়াছে ইন্দ্রাণীর আত্মবিশ্বাসে, অহঙ্কারে। এই জাতীয় মেয়েরা সংসারের প্রাত্যহিক অবজ্ঞাকে, সাধারণের উপেক্ষাকে সহ্য করিয়া জীবনের পথে চলিতে পারে, অহঙ্কারই তার কারণ। এই অহঙ্কারই মেরুদণ্ডের মত তাদের অস্তিত্বকে ঋজু করিয়া রাখে; সেই মেরুদণ্ডে যখন আঘাত পড়ে, তখন তারা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছিল তাতে রামায়ণ শেষ না হইয়া গিয়া আরও চারিটি কাণ্ডের সৃষ্টির কারণ হইয়াছিল; কিন্তু রাবণ যদি সীতাদেবীকে অসহায় দেখিয়াও হরণ না করিত, তবে রামায়ণ ঐখানেই শেষ হইয়া যাইত, সীতাদেবীর অহঙ্কারে যে আঘাত লাগিত তাতে তিনি পম্পাসরোবরে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। ছদ্ম নলদের মধ্য হইতে দময়ন্তী প্রকৃত নলকে বরমাল্য দান করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু দেবতাদের ছলনাতে তিনি মনে মনে খুসী হন নাই—এমন কথা জোর করিয়া কে কথা বলিতে পারে?

ইন্দ্রাণী মনটাকে মানচিত্রের মত সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে—ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। দেহের চলনশীল ব্যথার মত ইহা যেন মনের মধ্যে চলিয়া বেড়াইতেছে, কখনো এখানে, কখনো সেখানে, কখনো প্রেমে, কখনো অহঙ্কারে। ইন্দ্রাণী দর্পনারায়ণকে সত্যই ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু তার মূলেও অহঙ্কার,

ইন্দ্রাণী দর্পনারায়ণের মধ্যে নিজেকেই ভালবাসিয়াছিল; আমরা যাকে যতটা ভালবাসি তার মধ্যে তত পরিমাণে নিজকে উপলব্ধি করি।

ইন্দ্রাণী স্থির করিল, বিবাহ আর করিবে না। কিন্তু, এই সঙ্কল্পে মনে শান্তি পাইল না, সে বিবাহ না করিয়া সারাজীবন শাস্তি পাইবে আর যে প্রকৃত দোষী তার বেকসুর খালাস। না? তার মনের সমস্ত আক্রোশ পড়িল দর্পনারায়ণের উপর। দর্পনারায়ণকে দণ্ড দিতে হইবে; দণ্ড দিয়া স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, ইন্দ্রাণী তাকে ভালাবাসে। ক্রোধ প্রেমের বিকার, লৌহনিগড় বাহুলতার রূপান্তর মাত্র। শত্রুও পর নয়, কারণ তার সঙ্গে সন্ধি হইতে পারে; যার প্রতি মানুষ অন্যমনস্ক সে-ই প্রকৃত পর।

কিন্তু, ইন্দ্রাণী একাকী অসহায়, দুর্ব্বল দর্পনারায়ণকে দণ্ড দিবে কি প্রকারে? তার কোন উপায় সে খুজিয়া পাইতেছে না।

পাঠক, তুমি ভাবিতেছ এ আবার কি? ইন্দ্রাণী এত চিন্তা করিবে কি প্রকারে? এত মনোবিশ্লেষণ তার পক্ষে কি সম্ভব? কারণ যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ত' সাইকোলজিকাল নভেলের সৃষ্টি হয় নাই; যেন সাইকোলজিকাল নভেলের পর হইতেই মানুষ চিন্তা করিতে শিখিয়াছে।

বিধাতা দিয়াছেন মন, আর মন বিশ্লেষণ করিবার অভ্যাস শয়তানের দান! মনোরথের সরল রাজপথে স্বয়ং বিধাতার সৃষ্টি—সেই পথ গিয়া থামিয়াছে তাঁর স্বর্ণসিংহাসনের সোপানের প্রান্তে, আর মনোবিশ্লেষণের সর্পিল বঙ্কিম অলিগলিতে আদিম সর্পের, শয়তানের পদচিহ্ন; সে পথের কোন লক্ষ্য নাই, তা সাপের মত নিজেকে নিজে জড়াইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া আছে। সে পথে পদার্পণ করিলে আর রক্ষা নাই; কেবল ঘুরিতে হইবে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া মরিতে হইবে; সে পথ সাইকোলজিকাল নভেলের নায়ক নায়িকার কঙ্কালে

চিহ্নিত। আমি দম্পতি নন্দনের সরল রাজপথ ত্যাগ করিয়া শয়তানের প্ররোচনায় সর্পিল গলিপথে প্রথমে পদক্ষেপ করিয়াছিলাম, আর আজিও আমরা, তাদের অধস্তন পুরুষেরা সেই আদিম পাপের বোঝা মাথায় বহিয়া সেই বঙ্কিম পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছি। পৃথিবীতে যদি কোথাও নরক থাকে, তবে তাহা আত্মকেন্দ্র-শৃঙ্খলিত বিশৃঙ্খল অন্তহীন অলিগলির নাগপাশের মধ্যেই।

৩

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কয়েকদিন পরে রক্তদহের নদীর ঘাটে স্নানের ভিড় জমিয়াছে। গরমের দিনে অতি প্রত্যূষ হইতে স্নান আরম্ভ হয়, ছেলে বুড়ো সবাই সাঁতার কাটে, তীড়ে বড় ভীড় জমিতে পারে না। শীতের অনেকটা বেলা হইলে তবে লোক আসিতে আরম্ভ করে, সবাই জলে নামিতে ইতস্ততঃ করে, ফলে তীরে ভীড় জমিয়া ওঠে। স্নানের ঘাটই বাংলাদেশের সামাজিক পার্লামেণ্ট।

দুই একজন দুঃসাহসিক স্নান-রসিক ব্যক্তি এই পৌষের শীতেও সাঁতার কাটিতেছিল—অন্য সকলে তীরে দাঁড়াইয়া তাদের লক্ষ্য করিতেছে, এমন সময়ে নদীর বাঁকের আড়াল হইতে একখানা বৃহৎ বাঁশের ভেলা আসিয়া পড়িল। ভেলাওয়ালা সাঁতারুকে লক্ষ্য করে নাই; এক্ষণে লক্ষ্য করিয়া ভেলা সামলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল—কিন্তু স্রোতের প্রবল টানে ভেলা লোকটার দিকেই যেন ছুটিয়া যাইতে লাগিল। তীরের জনতা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; বিপন্ন সাতারু আসন্ন প্রায় ভেলা লক্ষ্য করিয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া একবার শেষ চেষ্টা করিল; দীর্ঘ এক ডুব সাঁতারে পাশ কাটাইয়া আত্মরক্ষা করিল। সে যাত্রা লোকটা বাঁচিয়া গেল কিন্তু ভেলাওয়ালা বাঁচিল না। লোকটা যদি

মরিত, তবে ভেলাওয়ালা বাঁচিত। কিন্তু লোকটার কিছু না হওয়ায় সকলের নিস্ফল ব্যস্ততা নিরীহ ভেলাওয়ালার উপরে গিয়া পড়িল।

একজন বলিল, বেটার আক্কেল দেখেছ! আক্কেলের মধ্যে দ্রষ্টব্য কি ছিল তাহা জানিনা—কিন্তু তখন যেন সকলেই তা হঠাৎ দেখিতে পাইল। তখন জলে-স্থলে এক বাকযুদ্ধ বাধিয়া গেল। ভেলাওয়ালা একা হইলেও কলহে কম নয়—সে একাই একশ'-জনের মোহাড়া লইতে লাগিল। এমন সময়ে তীরের একজন লোক ভেলাওয়ালাকে চিনিয়া ফেলিল সে বলিল, লোকটার জোড়াদীঘিতে বাড়ী। লোকটা জোড়া-দীঘির শুনিয়া জনতা সত্য সত্যই ক্ষেপিয়া উঠিল। সকলে বুঝিল, জোড়াদিঘীর পক্ষে কোন দুষ্কর্ম্মই অসম্ভব নহে। তাকে ভেলা থামাইতে আদেশ করিল। কিন্তু স্রোতের টানেই হোক, আর ইচ্ছাই হোক, ভেলা দ্রুততর চলিতে লাগিল। তখন কয়েক জন উদ্যোগী যুবক নৌকা লইয়া ভেলার উদ্দেশ্যে চলিল; কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকায় ও ভেলায় হাতাহাতি বাধিয়া গেল। অবশেষে ক্লান্ত ভেলাওয়ালাকে সকলে টানিয়া নৌকায় তুলিল—নৌকা তীরের দিকে আসিতে লাগিল—শূন্য ভেলা স্রোতের টানে অপর এক বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল!

নৌকা ভিড়িবামাত্র সবাই ভেলার মালিককে টানিয়া মাটিতে নামাইল এবং এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তার উপর পড়িয়া যে যাহা পারিল থানা-পুলিশ-দারোগার কাজ করিল। মৃতপ্রায় লোকটা অসাড় হইয়া পড়িলে বিচারকের কাজ আরম্ভ হইল। পাঠক বিস্মিত হইও না; এমনই হয়; বিচার মানেই প্রবলের আত্মপক্ষ সমর্থন; অধিকাংশ সময়েই তা দুষ্কর্ম্মের সাফাই।

লোকটা বলিল—বাপু আমার দোষটা কিসের?

এ পক্ষের একজন জিজ্ঞাসা করিল—বেটা তোর বাড়ী জোড়াদীঘি বটে কি না?

লোকটা বলিল—তাতে দোষটা কিসের ?

বাস্তবিক তাতে দোষের যে কি আছে তাহা না জানায় অনেকেই চুপ করিয়া থাকিল।

একটা মহৎ কার্য্যে আকস্মিক বাধা আসিয়া পড়ে দেখিয়া একজন বৃদ্ধ বলিল, দোষটা কি ? আচ্ছা আমি বল্‌ছি। তোদের জমিদারপুত্ত্র আমাদের দিদিমণিকে বিয়ে করবেন বলেছিলেন কি না ?

লোকটা ঘটনা জানিত, বলিল, হাঁ।

—আচ্ছা, এখন সে বিয়ে করেছে আর একজনকে! সত্যি কি না ?

লোকটা ইহাও জানিত, অতএব বলিল হাঁ। কিন্তু সে দোষে আমি কেমন ক'রে দোষী ? আমি কি ঘটকালি করেছিলাম ? এই রসিকতার চেষ্টার ফলে একটা প্রবল গুঁতা আসিয়া তার পাঁজরে পড়িল। তখন সেই পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধটি বলিল বেটা তুই জমিদারের জমি খাস নে ? তার বাড়ীতে দরকার হলে খাটিস নে ? তাকে খাজনা দিস নে ? তবে আবার তোর দোষ নয় কিসের ?

লোকটা চুপ করিয়া রহিল ; বোধ হয় সত্য সত্যই নিজেকে দোষী ভাবিতে আরম্ভ বরিল। আবার প্রশ্ন-বাণ বর্ষিত হইল। বল বেটা বিয়ে হলে তুই খুসি হ'তিস কি না ? লুচি সন্দেশ খেতিস কি না ? তা যদি হয়, তবে বিয়ে না হওয়ার জন্য তুই দায়ী কি না ? গুঁতো খাবি না কেন ?

বিবাহ না হইবার জন্য সেই যে দায়ী, ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়া গেল। বৃদ্ধ সগর্ব্বে বলিয়া দিল—আমাদের জমিদারের যে-অপমান তাদের জমিদার করিয়াছে, তা রক্তদহের লোক কথনও ভুলিবে না। তাদের বিচারে জোড়াদীঘির জমিদার হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের কুকুরটা পর্য্যন্ত এই জন্য দায়ী। রক্তদহের লোক দিন গুণিতেছে, সুবিধা পাইলেই ইহার শোধ দিবে।

কিন্তু তার যখন বিলম্ব আছে, এই লোকটাকে লইয়া কি করা যায়! একজন বলিল—একেবারে নিকেশ করে দেওয়া যাক! এই প্রস্তাবে অপর একজন বাধা দিয়া বলিল—না, না, ওটাকে মেরে ফেললে জোড়াদীঘিতে গিয়ে খবর দেবে কে? সকলেই এই উক্তির যথার্থতা বুঝিল। তখন সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল—লোকটাকে জলে ভাসাইয়া দাও। লোকটা বিচারের ফল শুনিয়া মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। মানুষের স্পর্শের অপেক্ষা শীতের শীতল নদীর কোলকে সে অনেক গুণে বরণীয় মনে করিল। সকলে বিকট আনন্দধ্বনি করিয়া লোকটাকে নদীর মধ্যে নিক্ষেপ করিল।

যেখানে এই ঘটনা ঘটিতেছিল, তার নিকটে একখানি প্রকাণ্ড বজরা বাঁধা ছিল। মাঝি-মাল্লা কেহ নাই, বোধ হয় কার্য্যান্তরে গিয়াছে, কেবল ছাদের উপরে একঠি অদ্ভুত লোক গুটি মারিয়া বসিয়া রোদ পোহাইতে ছিল। লোকটিকে দূর হইতে দেখিলে মানুষরূপী একটি পুঁটুলি বলিয়া মনে হয়।

জনতার গোলমাল শুনিয়া বজরার কামরা হইতে এক যুবক বাহির হইয়া আসিল। যুবকের দেহ দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, মাংস-পেশল; মাথার চুল ঘন এবং কুঞ্চিত, পোষাকপরিচ্ছদ দেখিয়া ধনবান বলিয়া মনে হয়। যুবক ছাদের উপরে আসিতেই নররূপী পুঁটুলি-টি একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিয়া সম্ভ্রম জানাইল। যুবক বলিল বেঙা এক কাজ করতে হবে। পাঠকের বোধ হয় এ নাম মনে থাকতে পারে। ইহারা আর কেউ নয়, পলাশীর মাঠের বেঙা চৌকিদার এবং এই যুবক তাঁবুতে দৃষ্ট তার মনিব পরন্তপ রায়।

বেঙা বলিল—আমাদের মোতির মা বল্‌ত—পরন্তপ হাসিয়া তাকে বাধা দিয়া বলিল আচ্ছা তোর মোতির মা'র কথা পরে শুনব, এখন এক কাজ কর। ওই যে বুড়ো লোকটা দেখ ছিস—এই বলিয়া

সে জনতার মধ্যস্থিত সেই বৃদ্ধ লোকটিকে দেখাইয়া দিল—ওকে একবার চট্ করে গিয়ে ডেকে আন।

বেঙা উঠিয়া দাঁড়াইল কি যেন বলিতে চেষ্টা করিতেই পরন্তপ ব্যস্ত ভাবে বলিল—এখন নয় পরে শুনব। তোর মোতির মার কথা তো?

বেঙা রুষ্ট ভাবে বলিল—না তোমাকে আর বলতে হবে না; দেখা হলে আমি বেটিকে একবার আচ্ছা করে শাসিয়ে দি! সব তাতেই তার এত কথা বলবার দরকার কি?

পরন্তপ বলিল—আচ্ছা তা দিস। যা চট করে কাজটা কর। এই বলিয়া সে নীচে নামিয়া গেল। বেঙা বজরা হইতে নামিল।

বৃদ্ধ লোকটী আসিলে পরন্তপ তাকে সমাদর করিয়া বসাইল, পরিচয় লইল, কুশল জিজ্ঞাসা করিল। বৃদ্ধের নাম মাধব কর্ম্মকার; রক্তদহে তার বহু পুরুষ হইতে বাস। মাধবের প্রশ্নের উত্তরে নিজের পরিচয় পরন্তপ স্পষ্ট ভাবে দিল না, কথাটা কোন রকমে এড়াইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে মাধব বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

পরন্তপ তাকে প্রশ্ন করিয়া অনেক কৌশলে যা জানিল, তার সার মর্ম্ম এইরূপ। জোড়াদিঘীর জমিদার দর্পনারায়ণের সঙ্গে ইন্দ্রাণীর বিবাহ প্রায় একরকম স্থির, এমন সময়ে দর্পনারায়ণ অন্যত্র বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার অপমান রক্তদহের অধিবাসীরা ভাগ করিয়া লইয়াছে। মাধব বর্ম্মকার সগর্ব্বে বলিয়াছিল—বুঝলেন বাবু, আমরা সহজে ছাড়ব না। জোড়াদিঘীর ঠাকুর থেকে কুকুর পর্য্যন্ত সবাই আমাদের শত্রু। আজ যদি আমাদের কর্ত্তা বেঁচে থাকতেন, তবে দেখতেন মজা। এরই মধ্যে লড়াই বেধে যেত। মাধবের মুখে সে জোড়াদিঘী ও রক্তদহের বহু পুরুষের শত্রুতা ও বাদ-বিসংবাদের কাহিনী অবগত হইল। মাধব বলিয়াছিল—আজ আমি বুড়ো হয়ে পড়েছি,

কিন্তু আবার যদি লড়াই বাধে, আমিই রওনা হ'ব সবার আগে। আমার যখন বয়স অল্প ছিল, দু'বার জোড়াদীঘির জমিদারী লুঠ করতে গিয়াছি। হায় কর্ত্তাও নাই, সে দিনও নাই।

মাধবের কথা হইতে পরন্তপ বুঝিল যে, ইন্দ্রানী বিবাহ করিবে না বলিয়া স্থির করিয়াছে, আর স্থির করিয়াছে—যেমন করিয়াই হ'ক জোড়াদীঘির জমিদারকে জব্দ করিতে হইবে। অবশ্য ইন্দ্রানীর এই পনের টিকা স্বরূপ মাধব নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছিল। সে বলিয়াছিল—ইন্দ্রানী মা আমার ভারী একরোখা, তার কথার বড় নড় চড় হয় না। কিন্তু এ কথা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, তেমন বীরপুরুষ যদি জোটে, তবে সে নিশ্চয় বিয়ে করবে—যাকে দিয়ে জোড়াদীঘির জমিদার জব্দ করা চলবে। মার আমার যেমন সাহস তেমনি বুদ্ধি, তবু তো মেয়েমানুষ বই নয়। আমার বয়স হয়েছে, কিন্তু এও জানি জোড়াদীঘিকে জব্দ হ'তে না দেখে মরব না, মরে' শান্তি পাব না। আছি আশায়, মার আমার বিয়ে হবে বীরপুরুষের সঙ্গে, তারপরে দেখে নেব কত আস্পর্দ্ধা চৌধুরীদের।

পরন্তপ মাধবের নিকট হইতে জানিল যে, এ সমস্ত কথা সে জমিদার-বাড়ীর চাঁপা ঠাকুরাণীর মুখ হইতে শুনিয়াছে, কাজেই ইহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। সে অনেক কথাই জানিতে পারিল বটে, কিন্তু বুঝিতে পারিল না যে, দর্পনারায়ণের বধু বনমালা। না জানিবার কারণ এ কথা তখন কেহই জানিত না; দ্বিতীয়তঃ শুনলেও তার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত হইত; তৃতীয়তঃ বনমালা নামটি তার কাছে নিরর্থক। পলাশীর তাঁবুর সেই মেয়েটির নাম কি তা সে জানিত না। সেই মেয়েটীকে সে ভুলিয়া গিয়াছিল—যেমন-গিয়াছে ওইরূপ আরও অসংখ্য মেয়েকে। কিন্তু দর্পনারায়ণকে ভোলে নাই! পরন্তপ স্থির করিল একবার চাঁপা ঠাকুরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইবে। বেগুকে ডাকিয়া

হুকুম করিল—যেমন করিয়াই হ'ক, সেই দিন সন্ধ্যায় একবার চাঁপা ঠাকুরাণীকে তার বজরায় আনিয়া হাজির করিতে হইবে।

৪

মুখের গ্রাস ছুটিয়া গেলে হিংস্র সাপ যেমন হিংসাকে পোষণ করিয়া দেশে দেশে শত্রুকে খুঁজিয়া বেড়ায়, তেমন করিয়া সেই দিনের পর হইতে পরন্তপ শত্রুকে জব্দ করিবার উপায় অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছিল। দর্পনারায়ণ যখন বনমালাকে তাঁবু হইতে লইয়া গেল, পরন্তপ তখন সুরাতে অজ্ঞান, নতুবা সেইখানেই একটা রক্তারক্তি হইত। বহুক্ষণ পরে তার জ্ঞান হইলে, মেয়েটি কোথায় জিজ্ঞাসা করিল; শুনিল একজন লোক আসিয়া তাকে জোর করিয়া লইয়া গিয়াছে। শুনিয়া তখনই চাবুক বাহির করিয়া একধার হইতে মোসাহেব ও চাকর-বাকর-দের পিটিয়া গেল। তারা এ-রকম ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল, ক্ষতনাশক একটা মলম সর্ব্বদা তারা সঙ্গে রাখিত। ক্ষতস্থানে মলম লাগাইয়া তারা যথারীতি শুইতে গেল। কেবল আহত সিংহের ন্যায় পরন্তপ সারারাত্রি তাঁবুর মধ্যে 'পায়চারি করিয়া ফিরিতে লাগিল। শেষরাত্রে স্বর্গারোহণ পালা শেষ করিয়া বেঙা আসিয়া তাঁবুর মধ্যে উঁকি মারিয়া প্রভুকে তদাবস্থায় দেখিয়া এক মুহূর্ত্তে সব ব্যাপার বুঝিয়া লইল। বাহিরে গিয়া সে নিজের কাপড় ছিঁড়িল, চুল এলোমেলো করিয়া দিল গায়ে ধূলা বালি লাগাইল, এমন কি নিজের বাহুতে কামড়াইয়া কয়েকটা দাগ করিয়া লইল, তারপরে হাতে একখানা বাঁশের লাঠি লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাঁবুর মধ্যে প্রভুর সম্মুখে গিয়া সটান পড়িয়া গেল, যেন পা' আর চলেনা। পরন্তপ তাকে তুলিয়া ধরিল, সুস্থ করিল, জিজ্ঞাসা করিল ব্যাপার কি? বেঙা হাঁপাইতে হাঁপাইতে কখনও ক্রোধে, কখনও লজ্জায়, কখনও চোখের জলে সম্পূর্ণ কাল্পনিক

একটা ব্যাপার বর্ণনা করিয়া গেল। সে বলিল,—যখন সেই দুষ্মণ দুটা মেয়েটাকে লইয়া যাইতেছিল, সে গিয়া পিছন হইতে তাদের আক্রমণ করে; কিন্তু তারা দুইজন সে একা; তবু সে ছাড়ে নাই, একজনের মাথা ফাটাইয়াছে, অপর একজন পলাতক; কাজেই কিছুই করিতে পারে নাই; আর একজন তার সঙ্গে থাকলেই সে লড়াই ফতে করিয়া দিত! তারপরে সে বলিল, যদিও সেই লোক দুটাকে আনতে পারে নাই, তবু তাদের পরিচয় আনিয়াছে একজন জোড়াদীঘির জমিদার, অন্যজন তার সর্দ্দার। পাঠকের মনে থাকিতে পারে ইহা বাণীবিজয়ের মুখ হইতে সংগৃহীত।

পরন্তপ তার সাহসে, বিশেষ পরিচয় সংগ্রহে এত খুসী হইল যে, তখনই তাকে এক আশরফি বক্শিস করিল এবং তখনই তাঁবু গুটাইয়া বজরা ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিল। তারপর সে হইতে ক্রমাগত নদীপথে ভ্রমণ করিয়াছে, আর ভাবিয়াছে—কি উপায়ে দর্পনারায়ণকে দণ্ড দেওয়া সম্ভব! সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—দর্পনারায়ণকে দণ্ড না দিয়া সে সুরা ও নারী স্পর্শ করিবেন না। দেবতার পণ অপেক্ষা দৈত্যের পণ অনেক ভীষণ! মিথ্যাবাদী যখন সত্য কথা বলে, সে সত্যের এক চুল এদিক ওদিক হইবার উপায় থাকে না।

নদীপথে ভ্রমণ করিতে করিতে আজ সকাল বেলা সে রক্তদহের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে! সকাল বেলাতে সে একাকী বসিয়া প্রতিজ্ঞায় শান দিতেছিল, এমন সময় বাহিরে ওই লোকটাকে লইয়া গোলমাল বাধিয়া উঠিল। তখনই তার মনে একটা আশার বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। তারপরে মাধবের কথাবার্ত্তা শুনিয়া ক্রমে সেই চলবিদ্যুৎ স্থির-বিদ্যুতে পরিণত হইল। সে স্থির করিল এই ইন্দ্রাণীকে বিবাহ করিতে হইবে। উভয়েরই ক্রোধের লক্ষ্য দর্পনারায়ণ। বিবাহে সামাজিক বাধাও নাই—কাজেই বাহিরের দিক্ হইতে এ বিবাহে আপত্তি হইবে

না। কিন্তু মাধবের কথায় বুঝিয়াছিল, ইন্দ্রাণীর মধ্যে অসামান্যত্ব আছে, অতএব তার সঙ্গে বুঝিয়া শুনিয়া ব্যবহার না করিলে সব ব্যর্থ হইবে। মাধবের নিকট শুনিয়াছিল যে, চাপা ঠাকুরাণীর প্রবল প্রতিপত্তি, ইন্দ্রাণী না কি তার কথা মানিয়া চলে! কাজেই এই চাঁপা ঠাকুরাণীকেই তার একমাত্র সহায় বলিয়া মনে হইল, এবং সেই জন্যই বেঙাকে হুকুম করিল, যেমন করিয়া হ'ক চাঁপা ঠাকুরাণীকে সন্ধ্যাবেলায় বজরায় হাজির করিতে হইবে। অন্যের পক্ষে যাহা অসম্ভব, বেঙার পক্ষে তাহা যে শুধু সম্ভব তাই নয়, সেই সব কাজ করতেই বেঙার বুদ্ধি যেন খোলে! পরন্তপ সঙ্কল্প করিল, এই বিবাহ করিতেই হইবে; ইন্দ্রাণীকে সে চেনে না, প্রয়োজনও নাই, কিন্তু ইন্দ্রাণীকে নহিলে দর্পনারায়ণকে প্রতিশোধ দেওয়া চলিবে না।

৫

সন্ধ্যাবেলায় চাঁপা ঠাকুরাণী বজরায় আসিল। পরন্তপ তার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিল। চাঁপা ঠাকুরাণী কি প্রকৃতির লোক মুখ দেখিয়া তাহা বোঝা যায় কিনা, জানিবার জন্য শেজের মোমবাতিটি এমন ভাবে রাখা ছিল, যাহাতে আলোটা নিজের মুখে না পড়িয়া চাঁপার মুখে পড়ে। পরন্তপ নিজে ধরা না দিয়া চাঁপাকে বুঝিয়া লইবে ইচ্ছা করিয়াছিল। কিন্তু চাঁপা আসিয়াই চোখে আলো সহ্য করিতে পারে না ওজুহাতে মোমবাতিটি এমন ভাবে স্থাপন করিল, যাতে সবটা আলো পরন্তপের মুখে পড়ে। চাঁপা ঠাকুরাণী পরন্তপকে দেখিল; পরন্তপ তাকে সূক্ষ্মভাবে দেখিতে পাইল না বটে, তবে বুঝিল, চাঁপা সামান্য মেয়ে নয়, অতিশয় বুদ্ধিমতি; তার সঙ্গে বিবেচনা করিয়া চলিতে হইবে।

পরন্তপ নিজের পরিচয় দিল—কিছু বাড়াইয়াই দিল এবং অবশেষে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তার বিবাহ ঘটাইয়া দিবার জন্য চাঁপার সাহায্য প্রার্থনা করিল; পরন্তপ বলিল—ইন্দ্রাণী দেবীর শত্রু দর্পনারায়ণ; দর্পনারায়ণ আমারও শত্রু। ইন্দ্রাণীও তাকে জব্দ করিবার উপায় খুঁজিতেছেন, আমিও তাই চাই। ইন্দ্রাণী বুদ্ধিমতী হইলেও নারী, আমার সাহায্য পাইলে তার অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব হইবে না। পরন্তপ চাঁপাকে নিজের সহিত দর্পনারায়ণের শত্রুতার প্রকৃত কারণ বলিল না, বানাইয়া বলিল।

চাঁপা ঠাকুরাণী বলিল—ইন্দ্রাণী আর বিবাহ করিবে না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। তাকে সে প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত করা কারও সাধ্য নয়। তবে দর্পনারায়ণকে জব্দ করা সম্ভব জানিলে, বিবাহ করিতেও পারে। কিন্তু সে কথা এমন সোজাসুজি বলিলে হিতে বিপরীত ঘটিতে পারে; কাজেই অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

যে-চাঁপা ইন্দ্রাণীর সৌভাগ্য খর্ব্ব করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব, দর্পনারায়ণের সঙ্গে বিবাহভঙ্গে যে পরম সন্তুষ্ট হইয়াছিল, সে কেন যে পরন্তপকে সাহায্য করিতে স্বীকার করিল, তাহা জানি না! তবে চাঁপা ইন্দ্রাণীকে জানে। তাকে সে শত্রু মনে করে বলিয়া জানে। শত্রুকে আমরা মিত্রের চেয়ে বেশী করিয়া জানি, আর মিত্রকে শত্রুর মত অত্যন্ত অধিক জানিতাম, তবে তাকেও শত্রু বলিয়াই মনে হইত। বিধাতা পুরুষ দয়াময়, অজ্ঞতার সূক্ষ্ম আবরণের দ্বারা প্রেমকে তিনি রক্ষা করেন।

চাঁপা ঠাকুরাণী বলিল, আগামী কাল বিকাল বেলায় জমিদার বাড়ীর সম্মুখের মাঠে অশ্বপরীক্ষা হইবে; ইন্দ্রাণী ছাদের উপর হইতে তাহা দেখিবে, সেই সময় পরন্তপ যদি সেখানে উপস্থিত থাকেন, তবে চাঁপা স্বয়ং ইন্দ্রাণীর দৃষ্টি তার প্রতি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিবে এবং পরে কৌশলে তার মনের ভাব জানিয়া পরন্তপকে জানাইবে! পরন্তপ চাঁপাকে এই সাহায্যের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইল! রাত্রি অধিক

হইয়াছে দেখিয়া চাঁপা বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। পরন্তপ এই অভাবনীয় সাহায্যে এতই আনন্দিত হইয়াছিল যে, চাঁপাকে বুঝিতে পারিল না, কিন্তু ধীর সতর্ক চাঁপা পরন্তপের মর্ম্ম পর্য্যন্ত দেখিয়া লইল। হয় তো সে বুঝিল যে, পরন্তপকে দিয়াই তার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে—ইন্দ্রাণীর অহঙ্কার চূর্ণ করিবার সাহায্য হইবে।

৬

ইন্দ্রাণীর পিতার ঘোড়ার সখ ছিল। নূতন ঘোড়া পাইলেই তিনি কিনিতেন। নিজে তিনি ওস্তাদ সোয়ার ছিলেন, কিন্তু সে জন্যও নয়, ঘোড়া প্রাণীটাই যেন তাঁর প্রিয় ছিল। প্রত্যেকবার শীতকালে পশ্চিম হইতে ব্যবসায়ীরা নূতন ঘোড়া লইয়া রক্তদহে উপস্থিত হইত কেহই প্রায় ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইত না। প্রতিবৎসর তাঁকে আস্তাবল একটু করিয়া বৃহত্তর করিতে হইত। তার মৃত্যুর পরে ইন্দ্রাণী ঘোড়াগুলি বিক্রয় করিয়া দিতে সম্মত হইল না। একবার হঠাৎ কিছু বেশী পরিমাণ নগদ টাকার দরকার হইল—দেওয়ানজী বলিলেন, ঘোড়াগুলি বিক্রয় করিয়া দেওয়া যাক্, গ্রাহক উপস্থিত; ইন্দ্রাণী কোন উত্তর না দিয়া সিন্দুক হইতে নিজের কতকগুলি অলঙ্কার বাহির করিয়া দিল। বলা বাহুল্য, ঘোড়া ও অলঙ্কার সে যাত্রা উভয়ই বাঁচিয়া গেল শুধু তা-ই নয়, ঘোড়া বিক্রয় করিতে যে সে সে রাজী হইল না, তাহা নয়, নূতন ঘোড়া পাইলেই কিনিত। কাজেই শীতকালে ব্যবসায়ীরা নূতন নূতন ঘোড়া আনিয়া হাজির করিত, ইন্দ্রাণী ক্রয় করিত।

ইন্দ্রাণী ঘোড়ায় চাপিত না, চাপিতে জানিত না, চাপিবার কথা বোধ করি স্বপ্নেও ভাবিত না। তবে তার এ অকারণ সখ কেন! হয়তো পিতার আদরের প্রাণীগুলির প্রতি মমত্ববোধে, কিংবা এই

তেজস্বী প্রাণীদের অবাধ বিহারের মধ্যে সে নিজের ব্যাহত তেজস্বিতার চরিতার্থতা দেখিতে পাইত।

প্রতিবারের মত এবারেও কয়েকজন ব্যবসায়ী নূতন ঘোড়া লইয়া আসিয়াছিল, দর-দস্তুর মিটিতেছে, পাঁচ-সাতটি ঘোড়া লওয়া হইবে। মধু গায়েন নামে একটা লোক ইন্দ্রাণীর আস্তাবলের সহিসদের সর্দ্দার; লোকটা ভাল সোয়ার, সে রকম নাকি সে দেশে আর নাই। নূতন ঘোড়া কিনিবার পূর্ব্বে সে একবার ঘোড়া যাচাই করিয়া লইত। যে ঘোড়ায় সে চাপিতে পারিত না- তাহা কেনা হইত না; কারণ আর কেহ তাহাতে চাপিতে পারিবে না। আজ বিকালে জমীদারবাড়ীর পশ্চিমের মাঠে ঘোড়া যাচাই করিয়া লওয়া হইবে; ইন্দ্রাণী ছাদের উপরে উঠিয়া দেখিবে, সঙ্গে চাঁপাও থাকিবে। এই স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য পরন্তপকে চাঁপা বলিয়াছিল।

দুপুর হইতে পশ্চিমের মাঠে লোক জমিতে আরম্ভ করিল; ছেলে বুড়ো, যুবক; যুবকের ভাগই বেশী। ঘোড়া-চড়ায় যারা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিত, ইন্দ্রাণী তাদের বকশিস্ দিত; কাজেই যুবকদের ভিড়ই কিছু বেশী। তিনটা বাজিবার আগেই মাঠের অর্দ্ধেক জনতায় ভরিয়া গেল। পাগড়ি-বাধা পশ্চিমা ব্যবসায়ীর দল তেজস্বী ঘোড়ার দল লইয়া উপস্থিত হইল; দেওয়ানজীকে পুরোভাগে করিয়া কর্ম্মচারীর দল আসিল; লাঠিধারী বরকন্দাজের দল জনতাকে শান্ত করিতে লাগিল; হঠাৎ জনতা একজনবৎ মাথা তুলিয়া দেখিল, ছাদের উপর ইন্দ্রাণী ও চাঁপাঠাকুরাণী আবির্ভূত হইয়াছেন।

জনতার একান্তে পরন্তপ ও বেঙা-চৌকিদার আসিয়া দাঁড়াইল; দেওয়ান-জীর ইঙ্গিতে এক একটি করিয়া ঘোড়া আনিত হইতে লাগিল এবং মধু গায়েন অতি অনায়াসে তাতে চাপিয়া খানিকটা করিয়া পাক খাইয়া আসিল। এই ভাবে চারিটি ঘোড়া রক্ষিত হইল; কিন্তু পঞ্চম ঘোড়াটিকে লইয়া বিপদ

বাঁধিল। ঘোড়াটির রং কালো, সতেজ, পেশল গা দিয়ে যেন তেল গড়াই-তেছে, কপালের উপর নাতিদীর্ঘ একটা শ্বেতচিহ্ন। মধু গায়েন চাপিতে গিয়া আছাড় খাইল; তার জেদ চড়িয়া উঠিল, ঘোড়ারও যেন জেদ চাপিল; ঘোড়াও উঠিতে দেবে না, মধুও ছাড়িবে না। জনতা যদি মধুকে না জানিত হয়তো তার এই দুর্দ্দশায় হাসি-তামাসা করিত, কিন্তু জনতার কাছে মধু সুপরিচিত, বহুবার তারা মধুর অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়াছে অনেক দুর্দ্দম ঘোড়াকে বশ করিতে দেখিয়াছে, কাজেই মধুর অসামর্থ্য দেখিয়া তারা বিস্মিত হইয়া গেল, কেহই একটু শব্দ পর্য্যন্ত করিল না।

ইতিমধ্যে তিন চার বার আছাড় খাইয়া আবার যেমন চাপিতে যাইবে ঘোড়াটা এমন ভাবে লাফাইয়া উঠিল, মধু সটান মাটিতে পড়িয়া গিয়া অজ্ঞান হইয়া গেল। জনতা হায় হায় করিয়া উঠিল। তাকে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইল। দেওয়ানজী ঘোড়ার মালিককে বলিয়া দিলেন, এ ঘোড়া লওয়া হইবে না। এমন সময়ে ইন্দ্রাণীর খাস দাসী আসিয়া দেওয়ানজীকে জানাইল, দিদিমণির একান্ত আগ্রহ এ ঘোড়া রাখিতেই হইবে। ইন্দ্রাণী ছাদের উপর হইতে সমস্তই দেখিয়াছে। মধুর সঙ্গে সঙ্গে তারও জেদ বাড়িয়াছে; মধু অজ্ঞান হইলেও তার জ্ঞান হয় নাই। দাসী ইন্দ্রাণীর নাম করিয়া বলিল, এ ঘোড়া লইতেই হইবে; মধু চাপিতে পারিল না বটে, জনতার মধ্যে যদি কেহ চাপিতে পারে, তবে ইন্দ্রাণী তাকে পুরস্কৃত করিবেন। দেখিতে দেখিতে কথাটা জনতার মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, কিন্তু মধু গায়েনের মত ওস্তাদের দুর্দ্দশা চোখের উপরে দেখিয়া পুরস্কারের লোভেও কেহ অগ্রসর হইল না। কিছুক্ষণ সবই নিস্তব্ধ নিশ্চল। এমন সময়ে জনতার একধারে চঞ্চলতা দেখা গেল; একজন লোক যেন অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, সে এতই লম্বা যে জনতার মস্তক-সমুদ্রের উর্দ্ধে তার মুখ দেখা যাইতেছে। লোকটা দেওয়ানজীর কাছে আসিয়া ঘোড়ায় চাপিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। তার দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ বীরবপু দেখিয়া সকলেরই ধারণা হইল; এই

অসম্ভব কাজ ইহার দ্বারা সম্ভব হইলেও হইতে পারে। দেওয়ানজী অনুমতি দিলেন।

তখন পরন্তপ ঘোড়াটির কাছে গেল। সে অনেকক্ষণ হইতে লক্ষ্য করিতেছিল, ঘোড়াটিকে পূবমুখ করিয়া দাঁড় করানোতে নিজের ছায়া দেখিয়া বারংবার ভয় পাইয়া সে লাফাইয়া উঠিতেছিল। পরন্তপ তাকে পশ্চিমমুখ করিয়া দাঁড় করাইল, ঘোড়া অনেকটা শান্ত হইল। জনতা নিঃশ্বাস রোধ করিয়া রহিল। পরন্তপ তার গ্রীবাতে কয়েকটা চাপড় মারিয়া একলাফে পিঠে উঠিয়া বসিল। ঘোড়াটা চমকিয়া উঠিয়া একবার পিছনের পায়ের উপর খাড়া হইয়া উঠিল; পরন্তপ টলিল না; ঘোড়াটা তারপরে সম্মুখের পায়ের উপর ভর দিয়া পিঠের সোয়ারকে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিল; পরন্তপ টলিল না। সে স্থির হইতেই এবার পরন্তপ তাহার পেটে পা দিয়া বিষম আঘাত করিল; আহত ঘোড়া একবার গগনভেদী হ্রেষা-ধ্বনি করিয়া; কাণ দুটি খাড়া করিয়া তুলিয়া চক্ষুর তারকা আবর্ত্তিত করিয়া, নাসিকা স্ফীত করিয়া, আগা-গোড়া কাঁপিয়া উঠিল; তার পরেই মসৃণকৃষ্ণ বর্ণের উপর রৌদ্রকে চমকিত করিয়া ঝড়ের মত ছুটিতে আরম্ভ করিল। ভীত জনতা তাড়াতাড়ি পথ ছাড়িয়া দিল। এতক্ষণ তারা নীরবে ছিল, কিন্তু এখনে এই অপরিচিত যুবকের কৃতিত্বে আনন্দিত হইয়া উল্লাস-ধ্বনি করিয়া উঠিল। ঘোড়া ও সোয়ার ক্রমে দূরবর্ত্তী হইতে মাঠের অপর প্রান্তে বিন্দুমাত্রসার হইয়া গেল। ইন্দ্রাণীর খাস-দাসী দেওয়ানজীকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই ব্যক্তি কে এবং সে কি পুরস্কার প্রার্থনা করে, জনতা দেখিল—দূরস্থ সেই কৃষ্ণবিন্দু ক্রমে বৃহত্তর, স্পষ্টতর হইতেছে, ঘোড়া ও সোয়ার ফিরিতেছে। জনতা ভয়ে, বিস্ময়ে আনন্দে পথ ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, ঘোড়াটা হাঁপাইতেছে, মুখ দিয়া তার ফেনা ঝরিতেছে, সোয়ার সম্মুখের দিকে ঈষৎ একটু ঝুকিয়া স্থির ভাবে উপবিষ্ট।

এমন সময়ে হঠাৎ এক বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল। একটা কর্ত্তিত গাছের গুঁড়িতে হোঁচট খাইয়া প্রবল বেগের উপরে একদিকে ঘোড়া অপরদিকে সোয়ার ছিট্‌কাইয়া পড়িল। জনতা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। দেওয়ানজী ও অন্যান্য কর্ম্মচারী যখন যুবকের কাছে গেল, তখন সে অজ্ঞান হইয়া নিস্পন্দ ভাবে শায়িত। তাকে ধরাধরি করিয়া জমিদার বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল; সঙ্গে তার ভৃত্যটিও চলিল।

৭

এই দুর্ঘটনার জন্য ইন্দ্রাণী নিজেকেই দায়ী করিল। সে এইভাবে পুরস্কার ঘোষণা না করিলে, ভদ্রলোকের এই বিপদ ঘটিত না। কাজেই তাকে যে শুধু বাড়ীতে আশ্রয় দিয়া যতদূর সাধ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করিল তাহা নয়, দিনরাত্রি সে তার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া কাটাইতে আরম্ভ করিল। ক্রমে দয়ার পরিবর্ত্তে সমবেদনার ভাব আসিয়া তার হৃদয় অধিকার করিল; কিন্তু এখানেই শেষ নয়; ধীরে ধীরে তার মনে যে ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল, তাহা অত্যন্ত অজ্ঞতসারে হইতেছিল বলিয়াই রক্ষা, নতুবা ইন্দ্রাণী লজ্জায় মরিয়া যাইত।

চাঁপা পরন্তপের শুশ্রূষার জন্য নিযুক্ত হইল; তার প্রতি আদেশ ছিল, দিনের মধ্যে তিন চার বার আসিয়া রোগীর অবস্থা বর্ণনা করিতে হইবে। চাঁপা নিয়মিত ভাবে রোগীর অবস্থা শুনাইয়া যাইত; এ বিষয়ে মোটেই তার ঔদাসীন্য ছিল না।

পরন্তপ আজ তিন দিন ধরিয়া অচৈতন্য; কোনরূপ জ্ঞান নাই, নড়া-চড়া নাই, কথা-বার্ত্তা নাই। তবে বৈদ্য নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছে, রোগী জীবিত আছে। কক্ষটি নিস্তব্ধ অন্ধকার, লোক-বিরল; মাঝে মাঝে চাঁপা আসিয়া সংবাদ লইয়া যায়, আর বেঙা সর্ব্বদা তার হৃতজ্ঞান প্রভুর পার্শ্বে উপবিষ্ট; সে আজ তিন দিনের মধ্যে একবারও খোতির মার নাম উল্লেখ করে নাই।

ইন্দ্রাণী নিজের শয়নকক্ষে বসিয়া ভাবিতেছিল। সে অতীত জীবনের মানচিত্রখানা পাঠ করিতে চেষ্টা করিতেছিল; চেষ্টা মাত্র, তেমন সফল হইতে পাইতেছিল না; কারণ, মানচিত্রের রেখাগুলি স্পষ্ট নহে, তার উপরে সেগুলি আবার নিয়মিত চঞ্চল; মানচিত্রের অপেক্ষা সমুদ্রের লীলার সঙ্গেই তার মিল বেশী। মানুষের মন নিয়ত চঞ্চল, পরিবর্ত্তনশীল এবং বোধ হয় তলহীন বলিয়াই তাকে সরোবর বলা হয়, মানস সরোবর, কিন্তু সত্য কথা বলিলে—বলিতে হয় মানস-সমুদ্র।

কিন্তু ইহারা বোধ হয় অভিন্ন, অন্ততঃ সগোত্র যে, তাতে আর সন্দেহ নাই। মানস-সরোবরও তলহীন, সমুদ্রও অতল, মানস আপাত-অপার, সমুদ্রেরও পার নাই; সমুদ্র নীল, মানস নীলাভ, সমুদ্র ও মানস উভয়েই নিয়ত চঞ্চল এবং পরিবর্ত্তনশীল। আমার মনে হয়, মানস-সরসী সমুদ্রের কন্যা; নাগাধিরাজ তাকে হরণ করিয়া আনিয়া শৈলদুর্গের অন্তরালে বিশাল সব গিরী-প্রহরির জিম্মায় বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছে। সমুদ্র দুর্দ্দম আগ্রহে পর্ব্বতের পাদপীঠে তরঙ্গ-বাহিনী লইয়া আক্রমণ করিতেছে, আর মানসের তীরে কাণ পাতিয়া শুনিলে তার করুণ কল্লোল সুদূর সমুদ্রের ভাষায় প্রতিধ্বনি যেন শ্রুত হয়।

ইন্দ্রাণীর কানে আজ সেই করুণ কলধ্বনি আসিতেছিল, মানস যে সমুদ্রের সগোত্র সেই কথা আজ তার কাছে যেন ধরা পড়িয়াছে।

সে দেখিল—একটি বীরমূর্ত্তি পদ্ম-বিকশিত বিলের ধারে শিকার করিয়া বেড়াইতেছে; সে মুখ বহুদিনের ধ্যানের। আবার চোখে পড়ে আর এক বীরমূর্ত্তি, অপরিজ্ঞাত, দিগন্তের অভিমুখে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেল। সে মুখ অনুধ্যানের। তার ঘোড়ার ক্ষুরের ধুলায় আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল; সূর্য্যাস্তের মেঘে আকাশ যেমন আচ্ছন্ন হইয়া যায়; সূর্য্যাস্তের না সূর্য্যোদয়ের! শয়নকক্ষে জানালার ধারে বসিয়া পশ্চিমের প্রান্তরের দিকে চাহিয়া ইন্দ্রাণী এই স্বপ্ন বুনিতেছে; যুগল বীরের

কাল্পনীর টানা-পোড়েনে সে স্বপ্নের কিংখাব রচনা করিয়া চলিয়াছে; কে বলিল; মানুষ বস্তুবাদী, আমি বলিতেছি—মানুষ স্বপ্ন-শিল্পী।

রূপকথার-শোনা সেই রাজার মত মানুষের দুই রাণী; একজন বস্তু একজন স্বপ্ন; বস্তুতে তার ঐশ্বর্য্য, স্বপ্নে তার আনন্দ; বস্তুতে তার সুখ, স্বপ্নে তার স্বস্তি; বস্তুতে তার শক্তি, স্বপ্নে তার শান্তি; বস্তু প্রথমে স্বপ্নকে আক্রমণ করে, তারপরে করে স্বয়ং রাজাকে। তারপরে এক দিন কোথায় কি ঘটে, ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া বস্তু রাক্ষসী-মূর্ত্তি ধরিয়া রাজপুরি চাপিয়া পড়ে; বস্তুমুগ্ধ রাজা আবার স্বপ্নের কোলে ফিরিয়া আসিয়া আত্মস্থ হয়। মানুষ বস্তুমুগ্ধ কিন্তু স্বপ্নপ্রাণ।

৮

এমন সময় চাঁপা আসিয়া খবর দিল, রোগীর জ্ঞান হইয়াছে; সংবাদ শুনিয়া ইন্দ্রাণীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; অতর্কিত এই পুলক ঢাকিবার জন্য যতই চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই সেই উজ্জ্বলতার ভিতর দিয়া একটা রক্তিমাভা যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতে লাগিল; শেষে এই বর্ণের বাক্যহীন বাচালতার হাত হইতে বাঁচিবার জন্য সে কথা বলিল; আজ সব দিকেই তার বিপদ; কথা বলিতে গিয়া এ কি বেফাস কথা সে বলিয়া ফেলিল। সে বলিল—একবার তাঁকে গিয়ে দেখে এলে হয় না! নিজের অদ্ভুত প্রস্তাবে সে নিজেই চমকিয়া উঠিল, কিন্তু চাঁপা চমকিত হইল না; সে স্বাভাবিক ভাবে বলিল—আমার তো মনে হয় তোমার একবার যাওয়া ভাল; জমিদারের ছেলে তোমার বাড়ীতে এসে অচৈতন্য; একবার না দেখলে দেশে ফিরে গিয়ে বল্‌বে কি? রক্তদহের দুর্নাম।—কিন্তু এত যুক্তি সত্ত্বেও ইন্দ্রাণী টলিল না; সে যাইবার প্রস্তাব না করিলে হয় তো যাইত; কিন্তু অসতর্ক মুহূর্ত্তে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে, তাকে ঢাকিবার জন্য সে অস্বাভাবিক দৃঢ়তা প্রকাশ করিতে লাগিল।

চাঁপা ঠাকুরাণী পাকা মাঝি! বাতাস বুঝিয়া পাল তুলিয়া দিতে তার সমকক্ষ নাই; সে ইন্দ্রাণীর মনের ভাব বুঝিয়া অনুরোধ করা বন্ধ করিল; বরঞ্চ বলিল,—সে তো ভালই; বিশেষ অসুখের মধ্যে যে-সব কথাবার্ত্তা সে বলত, তা শুনলে তোমার কষ্ট হতে পারে!

উৎসুক ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করিল—কি কথা চাঁপা?

চাঁপা বলিল—ওসব কথা কাণে তুলতে নেই, বিশেষ বিকারের ঘোরে মানুষ কত কথাই বলে, তাই বলে কি সব সত্যি মনে করতে হবে।

ইন্দ্রাণীর ঔৎসুক্য ক্রমেই বাড়িতে লাগিল—সে বলিল—কিন্তু কথাটা কি?

চাঁপা বলিল—কিছু না, কিছু না, নাও এখন স্নান করবে তো ওঠ, তেল মাখিয়ে দি!

ইন্দ্রাণী কথাটা আদায় করিবার জন্য তেল মাখিতে রাজি হইল! চাঁপা তেল মাখাইয়া দিতেছে, ইন্দ্রাণী অন্যদিন তেল মাখিতে আপত্তি করে, বেশী মাখিতে চায় না, বেশীক্ষণ ধরিয়া মাখিতে চায় না; আজ ইন্দ্রাণী বড় নরম! কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি এত নরম হইবার আবশ্যক ছিল না; চাঁপাও কথা বলিতে চায়, কিছু অতিরঞ্জিত করিয়াই বলিতে চায়। ইন্দ্রাণী কথাটা পুনরায় শুনিতে চাহিলে চাঁপা বলিল—রায় মশায় (সেকালে নাম ধরিয়া বাবু বলিবার অপেক্ষা এইরূপ ভাবে উল্লেখ করিবার রীতিই বেশী ছিল; ইহাই ছিল সেকালের আদব-কায়দা) অসুখের মধ্যে জোড়াদীঘির খোকাবাবুর নাম করতেন (তিন পুরুষের একসঙ্গে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হইলে, কর্ত্তাবাবু ও খোকাবাবু এইরূপ ভাবে বলা হইত)।

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করিল—রায় মশায় বুঝি তাঁর বন্ধু!

চাঁপা কোন উত্তর দিল না।

ইন্দ্রাণী আবার জিজ্ঞাসা করিল—বন্ধু না কি?

চাঁপা নিতান্ত অবজ্ঞার সঙ্গে বলিল—কি জানি বাপু? তোমার সঙ্গে পারি না। ওই জন্যেই তো বল্‌তে চাইনি! বন্ধু কি কুটুম তা কি আমি বলেছি, না তিনিই আমাকে শুনিয়েছেন।

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করিল—তবে বল্‌তেন কি?

চাঁপা—নানারকম গালাগালি দিতেন; শুনলে মনে হয় দু'জনের মধ্যে খুব রেষারেষি আছে!

ইন্দ্রাণী প্রসঙ্গটাকে থামিতে না দিয়া বলিল—ব্যাপারটা কি ভাল করে জান্‌লে হ'ত।

তাহার দীর্ঘ-চুলের জট ছাড়াইবার জন্য অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে চাঁপা বলিল—জান্‌ব কি করে? আর আমার অত জানবার দরকারই বা কি? যা শুন্‌লাম, বললাম; তুমিও শুন্‌লে, চুপ করে থাক।

ইন্দ্রাণী বলিল—রোগীকে না হয় জিজ্ঞাসা করা যায় না, কিন্তু তার চাকরকে জিজ্ঞাসা করতে ক্ষতি কি? সে নিশ্চয় জানে!

চাঁপা একটু নরম হইয়া বলিল—তা হয় তো জানে! হয় তো কেন নিশ্চয়ই জানে; ওই যে বেঙা, রায় মহাশয়ের চাকরের নাম বেঙা, সর্ব্বদাই রায় মশায়ের সঙ্গে থাকে।

ইন্দ্রাণী বলিল—ওকে ডেকে শুন্‌লে হয় না?

চাঁপা—বেশ তো শোন না; যদি দরকার থাকে।

—দরকার আবার কি? একটু গল্প করা বই তো নয়! দুপুর বেলা খাওয়ার পরে একবার ডেকে এন না।

স্থির হইল—দুপুর বেলা বেঙাকে লইয়া চাঁপা ইন্দ্রাণীর কাছে আসিবে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই বেঙা ও তার মধ্যে স্থির হইয়াছিল, ইন্দ্রাণীর সঙ্গে দেখা হইলে বেঙা সম্পূর্ণ কাল্পনিক একটা কাহিনী বলিবে; কি ভাবে দর্পনারায়ণ ও পরন্তপ রায়ের মধ্যে বিবাদ বাঁধিল। দুইজনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, গল্পটা এমন ভাবে বলিতে হইবে, যাতে ইন্দ্রাণীর মন পরন্তপকে আশ্রয়রূপে

গ্রহণ করিতে পারে; তাকে অস্ত্ররূপে গণ্য করিতে পারে; যে অস্ত্র তার নিক্ষেপ কবিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু অসহায় বলিয়া শক্তি নাই। ইন্দ্রাণী যদি বুঝিতে পারে, দর্পনারায়ণ পরন্তপের শত্রু। তবে খুব সম্ভব সে আর অধিক বিবেচনা না করিয়া তাকে বিবাহ করিয়া ফেলিবে। বেঙাকে প্রস্তুত হইতে বলিবার জন্য চাঁপা তাড়াতাড়ি তার কাছে গেল।

৯

দুপুর বেলা ছাদের উপরে ইন্দ্রাণী রোদে পিঠ দিয়া বসিয়া চুল শুকাইতেছে; আর বেঙা চৌকিদার গল্প করিয়া যাইতেছে। বেঙা বলিতেছে—বুঝলে বা মা'ঠান, আমাদের মোতির মা বলত, অনভ্যাসের ফোঁটা, কপাল ফোঁটা, কপাল চড় চড় করে! আমার এসব হইবে কেন! আমার একখানা ধুতি আর গামছা হলেই ভাল! কিন্তু যখন হলাম বাবুর খানসামা, তেমন পোষাক না হলে যে বাবুর মুখ থাকে না; পরলাম ইহা পাগ; বাবুর অন্য বরকন্দাজের হাতে থাকত ঢাল আর তরোয়াল; কিন্তু আমি যে খান-সামা আমার হাতে হল বন্ধুক! আর হাতেরই বা কি তাক্! ওই যে বক উড়ে যাচ্ছে মা'ঠান—এই বলিয়া বহু দূরে উড্ডীয়মান বকের ক্ষুদ্র বিন্দুটাকে দেখাইল—বুঝলে মা'ঠান, ওরকম কত চিড়িয়া আমি হেঁ—। এই খানেই সে থামিল; বেঙা গল্প বলিতে জানে বটে; সে জানে স্পষ্ট করিয়া বলার চেয়ে আভাসে আনন্দ জমিয়া উঠে বেশী; বিশ্বাসযোগ্যতাও তার বেশী হয়। একটু থামিয়া আবার সে আরম্ভ করিল—আঃ থাক্‌ত এখন একটা বন্দুক। ইন্দ্রাণী বলিল না হয় তুই বড় শিকারী, তাই বলে নিরীহ পাখীটাকে মারবি কেন। বেঙা বলিল মা'ঠান তুমি যে কি বল! থাকত মোতির মা দিত এর উত্তর। আমাকে যদি শিকারী বল্‌লে তবে মারতে বারণ কর কেন! নিরীহ পশুপাখী ছাড়া আর তেমন পশু-পাখী পাব কোথায়? বাঘও তো

নিরীহ আমাকে যতক্ষণ না আক্রমণ করছে, ততক্ষণ তার দোষ কি? কিন্তু আক্রমণ করলে কি আর মারবার সময় থাকে! কি যে বল মা'ঠান—এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। হাসিবার সময় বেঙার চোখের শাদা অংশ ঘন ঘন পাক খাইত, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইত; দধিবর্ণের চুল-দাড়ি কাঁপিতে থাকিত, দেখিয়া মনে হইত, কে যেন অদৃশ্য দণ্ড দিয়া তার মুখে দধি মন্থন করিতেছে; আর সেই আবর্ত্তনে শুভ্র হাস্য অবিরাম উত্থিত করিতেছে।

ইন্দ্রাণী বলিল, আচ্ছা সেই গল্পটা বল, কি করে তোদের জোড়াদীঘির বাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল।

বেঙা বলিল—সেই কথাই তো বলচি মা'ঠান! তুমি যা বল মা'ঠান আমাদের বাবু মস্ত শিকারী। আমাদের গাঁয়ের পাশে মস্ত এক বন ছিল, তাতে ছিল বাঘ, ভালুক, গণ্ডার, (যদিচ বাংলাদেশে ভালুক ও গণ্ডার থাকিবার কথা নয়, কিন্তু তাতে কি আসে যায়; বেঙা কবি না হইলেও নিরঙ্কুশ) বাবুর প্রতিজ্ঞা ছিল একটা করে' জানোয়ার শেষ হয়ে গেল! তখন—প্রতিজ্ঞার কি হয়? কি হ'ল বল তো মা'ঠান—এই বলিয়া সে ইন্দ্রাণীকে প্রশ্ন করিল।

ইন্দ্রাণী হাসিয়া বলিল—তা আমি কেমন করে জানব! বেঙা যেন এই উত্তরই আশা করিতেছিল, কাজেই বলিল, তবেই দেখ কি বিপদ! আমরাও কেউ জানতাম না! তখন পড়ল ডাক পুরুত ঠাকুরের। তিনি এসে বললেন, এ আর এমন কি সমিস্যে! ওরে আন্ তো রে মহা—মহা—মহা—কি পুঁথি মা'ঠান? মা'ঠান বলিল—মহাভারত নাকি?

—হাঁ হাঁ, দেখ আমার কি মনে থাকে! তার উপরে আবার পাঠশালায় পণ্ডিতের দিয়েছিলাম পা ভেঙে! পুরুত ঠাকুর মহাভারত ঘেটে বলে দিলেন—ভাতের পরিবর্ত্তে লুচি খেতে পার, খিচুড়ি খেতে

পার। দেখ মা'ঠান—এই জন্যই তো শাস্তরের দরকার। তারপর থেকে বাবুর দুবেলা লুচি খাওয়া সুরু হ'ল। কিন্তু জমিদার হলে কি হয় ভগবান সকলের পেটেই তো সমান করে' গড়েছেন। ক্রমাগত লুচি খেতে খেতে অজীর্ণ দাঁড়াল, তখন সে আর এক বিপদ। ডাক পড়লো বদ্যি মশায়ের, তিনি বললেন, লুচি ছাড়। কাছেই ছিল পুরুত বসে; দুজনে তর্ক, হাতাহাতি, মারামারি। একজনের টিকি ছিঁড়ল, একজনের চাদর। কিন্তু সমিস্যে তেম্‌নি রইল। এমন সময়ে এল মতির মা; সে সব ব্যাপার শুনে হেসেই খুন; হাসি থামলে বল্লে অতি দর্পে হত লঙ্কা; তোমাদের এত বিদ্যে আর এর উপায় ভেবে পেলে না। বাবুর কথা ছিল বাড়ীর ভাত খাবে না। তা না-ই খেলে; বাড়ী ছেড়ে দেশভ্রমণে বের হও; সেখানে বেশ আরামে খাও। এদিকে পাঁচ সাত বছরে বন-টা আবার জানোয়ারে ভ'রে যাবে এসে শিকার আরম্ভ ক'রো। দেখলে মা, মোতির মা'র কেমন বুদ্ধি।

বেঙা বলিয়াই চলিল—অমনি সাজল বজরা, অমনি সাজল পান্‌সি, অমনি সাজল পাইক পেয়াদা; বরকন্দাজ খানসামা; বাবু আর বাবুর খাস গোলাম এই বেঙা। নৌকা চলেছেত চলেইছে, অনেক দিন পরে বিদেশের ভাত খেয়ে বাবুর মনে বড় ফুর্ত্তি। সেদিন আমরা নামলাম পলাশীর মাঠে! শিকার করতে হবে; অত বড় মাঠ আর ওদিকে নাই! বাবুর হাতের কি তাক মা'ঠান; চিড়িয়া আর জানোয়ার যে কত মারা পড়ল তার ঠিক নেই—বাবু চলেছে আগে আগে, আমি চলেছি পিছনে; সন্ধ্যা হয়ে এসেছে; এমন সময়ে শুনলাম এক চীৎকার। এগিয়ে দেখি এক তাঁবু, ঢুকলাম আমরা তাঁবুতে, দেখি আমাদের কচুবনের কালাচাঁদ এক মেয়েকে নিয়ে রাসলীলা আরম্ভ করেছে। বাবুকে দেখে মেয়েটার সে কি কাকুতি-মিনতি। তখন লাগল দুইজনে লড়াই, আমাদের বাবুতে আর সেই জোড়াদীঘির সেই বাবুতে—সে কি যুদ্ধ।

একবার নার' উপর গাড়ী, একবার গাড়ীর উপর না। একবার বাবু জেতে, একবার সে। কিন্তু বাবুর সঙ্গে পারবে কেন? বাবু মেয়েটাকে নিয়ে বাইরে এলেন; তারপরে তারে পৌঁছে দিলেন তার বাড়ীতে। হাতাহাতীর সময়ে জোড়াদীঘির লোকটা বাবুকে মেরেছিল এক ঘা, এখনো দেখো তার কপালে আছে এক দাগ। পরে আমরা শুনলাম লোকটা জোড়াদীঘির জমিদার। জোড়াদীঘির আবার জমিদার! নামে তালপুকুর ঘটি ডোবে না।—এই বলিয়া সে মুখমণ্ডলে হাসির দধি-মন্থনের অভিনয় করিতে লাগিল।

বেণ্ডা লক্ষ্য করিল কি না বলিতে পারি না, ঘটনা শুনিয়া ইন্দ্রাণীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল; নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইতে আরম্ভ করিল; সে উঠিয়া পড়িয়া দ্রুত নিজের ঘরে প্রস্থান করিল।

১০

ইন্দ্রাণীর যখন আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া আসিল, রাত্রি তখন গভীর। সে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল, ঘুম হইতে নয়; নিদ্রা জাগরণের মধ্যবর্ত্তী নিয়ত-চঞ্চল অশান্ত স্বপ্নের সীমান্ত প্রদেশ হইতে; বিদেশী পুরাণে শোনা সেই গোলকধাঁধায় সে যেন প্রবেশ করিয়াছিল, যার অন্তরতম স্থানে নরভুক্ এক দানব বসিয়া আছে; কতজন স্বপ্নের সূত্র ধরিয়া সেখানে প্রবেশ করে; কিছু দূর যাইবার পরে সূত্র ছিঁড়িয়া যায়, তারা আর ফিরিয়া আসে না। লোকে ভাবে দানবের উদরে তারা গিয়াছে। কিন্তু বাস্তবের অন্য রকম; তারা ক্লান্ত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পথে পড়িয়া মরে; দানবের উদরে কেহ যায় না, কারণ ভিতরে বহুশ্রুত দানব-টা কোথাও নাই; সে স্থানটা সুগভীর অন্ধকারময়; সে অন্ধকার

নিকষের মত নিরেট ও শীতল; কিন্তু কয়জন দুঃসাহসীর প্রাণে সত্যকারের সোনা আছে, হার পরখ সেখানে হইতে পারে।

ইন্দ্রাণী সেই গহ্বর হইতে ফিরিয়া আসিল; গোলক ধাঁধায় প্রবেশ এই তার প্রথম নয়; দর্পনারায়ণের বিশ্বাসঘাতকার পর হইতে অনেক বার সে সেখানে প্রবেশ করিয়াছে, অনেক বার ফিরিয়া আসিয়াছে; অন্যথা চিহ্নহীন এই পথ তার নিজের যাতায়াতে চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে; তাহা দেখিয়া সে প্রবেশ করে, আবার বাহিরে আসে; সকলে এমন পারে না, কিন্তু সবাই ত' ইন্দ্রাণী নয়।

চৈতন্য ফিরিয়া আসিলেই যে বাস্তবকে তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করা যায় এমন নয়, কিছুক্ষণ সময় লাগে; স্বপ্নলোকের রেশ পদে পদে তখনও তাকে ব্যাহত করিতেছিল। সে জানালার কাছে দাঁড়াইল;—দেখিল দূরে নদীতীরে একটি চিতা জ্বলিতেছিল; সেই চিতাগ্নির দীপ্তময় পটে লক্ষ্যগোচর হইল গোটা দুই মনুষ্য-মূর্ত্তি। এতক্ষণে তার স্বপ্নালোকের নেশা কাটিয়া গেল; মৃত্যুর বর্ত্তিকায় জীবনকে আবার চিনিতে পারিল।

ইন্দ্রাণী ঘর হইতে ছাদে আসিয়া দাঁড়াইল। নিষ্কলঙ্ক আকাশে যেন তারার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তার মনে হইল আকাশটা একখানা সুবৃহৎ নিকষপ্রস্তর; কত লক্ষ বৎসর ধরিয়া কত রকমের সোনা উহাতে দাগা হইয়াছে, তারি চিহ্ন তারায় তারায়; হঠাৎ একটা উল্কা আকাশ গাত্রে হুস করিয়া একটা দাগ টানিয়া চলিয়া গেল; তার মনে বলিয়া উঠিল এখনও সোনার পরখ চলিতেছে।

আর একখানা নিকষপ্রস্তর আছে, বৃহৎ নয়, খুব মূল্যবান, মানুষের মনে। ইন্দ্রাণী সেদিকে দৃষ্টিপাত করিল; দেখিল সেখানে দুটি রেখা, একটি উজ্জ্বল, একটি ম্লান। কোনটি কার?

সে ঘরে ফিরিয়া আসিল। অশান্তভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল। কি সে ভাবিতেছে। কার কথা? আসল কথা,

সে ভাল করিয়া নিজের মনকে বুঝিতে চায়। মানুষের নিজের মনের পুঁথিখানা এতই কাছে যে, অতি-নিকটবর্ত্তিতার জন্য অক্ষরগুলি চোখে পড়িতে চায় না—কেমন যেন জড়াইয়া যায়; আবার অপরের মন বুঝিতে পারে না, কারণ তাহা অতি দূরবর্ত্তী। কিন্তু সেটা যখন আবার প্রণয়ের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়ে, তাঁর মন পড়া যায়; ভালবাসা সেই ফোকাস্ যার আলোতে জীবন উজ্জ্বল ভাবে বোধগম্য হইয়া উঠে; তার এদিকেও অন্ধকার—ওদিকেও অন্ধকার, মানুষমাত্রেই এক একটি গবাক্ষ-লণ্ঠন জ্বালাইয়া লইয়া পথ চলিতেছে; জীবনের যে অংশটুকু তাতে ধরা পড়িয়াছে, তার পক্ষে সেইটুকু সত্য। সকলের লণ্ঠনের শক্তি ও ফোকাস্ সমান নয়। ইন্দ্রাণীর দীপরশ্মি জীবনের উপর পড়িয়াছে; দুইজন ব্যক্তি তাতে দেখা গিয়াছিল; একজন ক্রমে ম্লান হইয়া আসিতেছে, আর একজন উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে।

অশান্তভাবে অনেক পায়চারি করিবার পরে ইন্দ্রাণী কক্ষের প্রদীপটি লইয়া বাহিরে আসিল। কেন আসিল তাহা ভাল করিয়া সে জানে না। ধীর পদে তেতালা হইতে নামিল। সুবৃহৎ বাড়ী নিস্তব্ধ, নির্জ্জন, চারিদিকে অন্ধকার। সে কেবল একাকী দীপ লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে দোতালা হইতে অবতরণ করিল; চলিতে লাগিল। তার কি জ্ঞান ছিল? একেবারে ছিলনা বলিবার উপায় নাই, কারণ যে পথে লোকের সাক্ষাৎ মিলিতে পারে সে পথত্যাগ করিয়া নিরিবিলি পথ ধরিয়া চলিতে 'লাগিল। পুরাতন বিশাল চণ্ডী-মণ্ডপের খিলানের মধ্যে প্রবেশ করিল, ছাদে একদল চামচিকা ঝুলিতেছিল, আলো পাইয়া তারা ফরফর করিয়া চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল; অব্যবহৃত গৃহের সিক্ত ঘ্রাণ ইন্দ্রাণীর নাসায় প্রবেশ করিল; সে পা টিপিয়া শীতল পিচ্ছল চণ্ডি-মণ্ডপ অতিক্রম করিয়া বাহির-বাড়ীর কাছে আসিল; কিন্তু সদর দরজায় না ঢুকিয়া একটা খিড়কি দিয়া প্রবেশ করিয়া যে ঘরে পরন্তপ শয়ন

করিত সেখানে উপস্থিত হইল। দরজার সম্মুখে সে থমকিয়া দাঁড়াইল। দরজায় হাত দিতে সাহস হইল না। একবার ভাবিল দরজা বন্ধ থাকিলে বাঁচিয়া যায়। তবে কেন সে দরজা পরীক্ষা করিয়া দেখে না! পাছে দরজা বন্ধ থাকে সেই আশঙ্কা সে করিতেছিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে স্থির করিল দরজা বন্ধ, কাজেই ফিরিয়া যাওয়া যাক। সে দুই পা পিছনে হটিল। আবার ফিরিয়া আসিয়া ভাবিল, একবার দেখিয়া যাই। দরজায় হাত দিল; দরজা ভেজান ছিল মাত্র, দরজা খুলিয়া গেল। তার বুকের মধ্যে রক্তের তাণ্ডব দ্রুততর হইয়া উঠিল!

নিজের অনিচ্ছাতেও যেন সে ভিতরে প্রবেশ করিল! দেখিল নির্ব্বাণ-দীপ কক্ষে পালঙ্কের উপরে পরন্তপ নিদ্রিত! সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। নিদ্রিত পরন্তপকে বড় সুকুমার দেখাইতেছিল।

পরন্তপ দেখিতে সুপুরুষ এবং সুন্দর; কিন্তু তার জীবনযাপনের যে প্রণালী তাতে তার মুখে একটা উৎকট উগ্রতার ছাপ প্রায় স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই ব্যধির প্রকোপে বহুদিন নিয়মিত জীবন যাপন করিবার ফলে সে উগ্রতা দূর হইয়া গিয়াছিল, তাই ইন্দ্রাণী দীপালোকে তাকে সুপুরুষ ও সুন্দর বলিয়াই মনে করিল! রোগ-শয্যায় মানুষের শৈশব ফিরিয়া আসে; পরন্তপকে শিশুর মত সরল, সুকুমার ও অসহায় বলিয়া মনে হইল। ইন্দ্রাণী দেখিতে লাগিল, তার চুলগুলি তৈলাভাবে অবিন্যস্ত, ওষ্ঠাধর ঈষৎ ফাঁক, কপোলে কৃশতা; চক্ষু মুদ্রিত দেহের বাকি অংশ আস্তরণে আবৃত। হঠাৎ সে লক্ষ্য করিল তার কপালে একটা দাগ, মনে পড়িল, বেঙা গল্প করিয়াছিল ইহা দর্পনারায়ণের আঘাতের ফল; দর্পনারায়ণের কথা মনে হইতেই তার হাত কাঁপিয়া উঠিল; প্রদীপ মাটিতে পড়িয়া নিভিয়া গেল; ঘর অন্ধকার হইল!

ইন্দ্রাণীর মনে দর্পনারায়ণের বীরমূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, ইন্দ্রাণী

বিস্মিত হইল; তার ধারণা হইয়াছিল সে দর্পনারায়ণকে ভুলিয়াছে; কিন্তু এ কি! সুদূরতম আভাসে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ বাস্তবকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া কোথা হইতে সে আসিয়া দাঁড়াইল। যদি সে সত্যই দর্পনারায়ণকে না ভুলিয়া থাকে; যদি সত্যই সে না ভুলিতে পারে? বিবাহের পরে ও যদি মাঝে মাঝে আবির্ভাব ঘটে। ইন্দ্রাণী নিজেকে সান্ত্বনা দিল, বুঝাইল—ইহাই শেষ বার। ইন্দ্রাণী বোধ হয় ভুল করিল। জীবনে একটা প্রেম থাকে যাহা কিছুতেই দূর হয় না; অস্পষ্ট হইয়া বিস্মৃতির দিগন্তে বিলীন হইয়া যায়; কিন্তু তারপরে একদিন কেমন করিয়া অসম্ভাবিতরূপে অতর্কিত ভাবে তার আকস্মিক আবির্ভাব ঘটে।

এমন সময়ে ইন্দ্রাণীর হাত কাঁপিয়া প্রদীপটি মাটিতে পড়িয়া গেল, প্রদীপ পড়িবার শব্দে পরন্তপ শব্দ করিয়া উঠিল; বোধ হয় যেন জাগিল; ইন্দ্রাণী অন্ধকারে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া ছায়ার মত দাঁড়াইয়া রহিল। পরন্তপ বিছানায় পাশ ফিরিয়া শুইল; একবার অস্ফুট-স্বরে বেঙার নাম ধরিয়া ডাকিল; আর ইন্দ্রাণী চোরের মত দাঁড়াইয়া সেই শীতের রাত্রে ঘামিতে লাগিল।

পরন্তপ শয্যাত্যাগ বা বিশেষ কোনরূপ গোলমাল করিল না, চকিত হইয়া উঠিয়াছিল, আবার ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল? কিন্তু ইন্দ্রাণীর অনেকক্ষণ আর নড়িতে সাহস হইল না; সে স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া রহিল; তার ভয় হইতে লাগিল পাছে রাত্রি ভোর হইয়া যায়। অনেক-ক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া দেখিল পরন্তপ নড়িতেছে না, সে নিশ্চিন্ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; তখন সে দ্রুত-পদে গৃহত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিয়া প্রায় একরকম ছুটিতে ছুটিতে যে-পথ ধরিয়া গিয়াছিল সেই পথে ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া অর্গল বন্ধ করিয়া দিল। এ অর্গলের নিষেধ তার নিজের প্রতি; নিজেকে আর তার বিশ্বাস নাই।

১১

ক্রমে পরন্তপ সারিয়া উঠিল; এখন সে হাটিতে পারে, কাজেই সারা দিন ঘরে না থাকিয়া কিছু কিছু বেড়াইয়া বেড়ায়, সঙ্গে ছায়ার মত বেঙা চৌকিদার।

একদিন বেঙাকে দিয়া পরন্তপ দেওয়ানজীর কাছে প্রস্তাব করিল, এবার সে বাড়ী ফিরিতে ইচ্ছা করে। দেওয়ানজী বলিলেন, ইন্দ্রাণীকে জিজ্ঞাসা কর। ইন্দ্রাণী বেঙার কথা শুনিয়া বলিল—বেঙা তোর বাবু না হয় যাক তুই থেকে যা।

বেঙা বলিল—সে কি কথা মা'ঠান! সেই যে আমাদের মোতির মা বলত—দয়া করে দেয় নুন. ভাত মারে দশ গুণ। দয়া করে ক'দিন আশ্রয় দিয়েছিলে তাই বলে চিরদিন তোমার উপর ভার হয়ে থাকব! মানুষের কাঁধে চড়ে থাকা যে কি অসুবিধে, সে আর কেউ না বুঝুক আমি তো বুঝি।—এই বলিয়া সে নিজের কুঁজটিকে দেখাইল।

সত্য কথা বলিতে কি, ইতি মধ্যে বেঙা যে শুধু ইন্দ্রাণীর প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা নয়, সে বাড়ীর সকলের প্রিয়পাত্র। সে যদি সাধারণ মানুষ হইত তবে এমন হইত কি না সন্দেহ, কিন্তু সে বিকৃতাঙ্গ বিরূপ, খানিকটা পরিমাণে মনুষ্যত্বের ভাব তার মধ্যে ছিল; সেইজন্য মানুষে তাকে অল্প সময়ের মধ্যে ভালবাসিত।

ইন্দ্রাণী বলিল—তোর বাবু বড় নেমকহারাম রে; বিপদের সময়ে আমি আশ্রয় দিলাম, আর অসুখ সারামাত্র চলে যেতে চায়! যা, আমি কিছু জানিনে; দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা কর গিয়ে।

দেওয়ানজী বিপদে পড়িলেন; ইন্দ্রাণীর সম্মতি ব্যতীত সম্মানিত অতিথিকে কেমন করিয়া যাইতে বলে। এমন সময়ে চাঁপাঠাকুরাণী আসিয়া উপস্থিত। দেওয়ানজী বলিলেন—চাঁপা এখন আমি কি করি। চাঁপা দেওয়ানজীকে দাদামশাই বলিত, কাজেই উভয়ের মধ্যে ঠাট্টা-

তামাসার সম্বন্ধ! চাঁপা বলিল—তোমার চোখের কি হয়েছে? দেওয়ানজী বলিলেন, চোখ আমার বেহাত হয়েছে; খুঁজে দেখো তোমার আঁচলে বাঁধা।

—তবে সেই চোখ দিয়ে আমি যা দেখেছি বল্‌ছি! ইন্দ্রাণীর বিয়ে দিতে হবে না?

দেওয়ানজী দৃঢ় সঙ্কল্পিত ভাবে বলিলেন—নিশ্চয়।

চাঁপা বলিল—তবে পরন্তপ রায়ের সঙ্গে চেষ্টা কর না কেন?

দেওয়ানজীর কল্পনাতে এ-কথা কখনও আসে নাই। তিনি বলিলেন ইন্দ্রাণী তো বিয়ে করবে না।

চাঁপা—মেয়েরা কি কখনও বলে—বিয়ে করবে!

দেওয়ানজীর মুখে হাসি ফুটিল—বলিলেন, তাই বুঝি আমি বিয়ে করতে চাইলে তুমি না বল।

চাঁপা—এতদিনে বুঝলে!

দেওয়ানজী বলিলেন—কিন্তু পরন্তপ বাবু কি রাজী হবেন।

চাঁপা তাকে বাধা দিয়া বলিল—সে তোমার ভাবতে হবে না। আমি বেগুার কাছে শুনেছি বিয়ে করতে তার আপত্তি নেই। পরন্তপ রায়ের আপত্তি নেই ধরে নিতে পার। তুমি একবার ইন্দ্রাণীকে জিজ্ঞাসা কর!

দেওয়ানজী আর তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া খড়ম খট্ খট্ করিতে করিতে ইন্দ্রাণীর মহলে প্রবেশ করিলেন। চাপাও অন্য পথে ইন্দ্রাণীর মহলের দিকে চলিল।

সেদিন সন্ধ্যায় রক্তদহে রাষ্ট্র হইয়া গেল, পরন্তপ রায়ের সঙ্গে ইন্দ্রাণীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে! সন্ধ্যা বেলায় এই সংবাদ শুনিয়া গ্রামের মেয়েরা শঙ্খধ্বনি করিল; সকলেই খুসী হইল; কিন্তু চাঁপার আনন্দ সকলের চেয়ে বেশী।

বনমালা

১

পরদিন অতি প্রত্যুষে দর্পনারায়ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল, সে শয্যার উপরে জাগিয়া দেখিল বনমালা তখন ও ঘুমাইতেছে। অনেক দিনের পরে তার মনের উপর হইতে একটা দুশ্চিন্তার বোঝা নমিয়া গেল, সে ভারি হাল্কা অনুভব করিতে লাগিল। বনমালাকে বিবাহ করিবার পর হইতে একটা চাপা আতঙ্ক তার মনকে চাপিয়া ধরিয়াছিল; উদয়নারায়ণ কি বলিবেন ইহাই ছিল তার স্বপ্নের সমস্যা, জাগরণের দুশ্চিন্তা। এখন তার সমাধান হইয়া গিয়াছে। যে-অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে সে ভাসিয়া চলিয়াছে, তাহা সুখকর নয়; কিন্তু স্বস্তিদায়ক; তাহা দুঃখ, কিন্তু দুঃখের চিন্তা নয়; আমরা দুঃখের চিন্তাকে ভয় করি, দুঃখকে নয়।

সে বজরার ছাদের উপরে আসিয়া বসিল। শীতের কুয়াশা তখনও নদীর উপরে ও দুই তীরের মাঠের উপরে অতি সূক্ষ্ম মলমলের থানের মত বিলম্বিত; নদীর জল কুয়াশায় আচ্ছন্ন, কলধ্বনিই তার অস্তিত্বের যেন প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দুই পাশের তীরে কুয়াশার মলমল বিদীর্ণ করিবার জন্য সূর্য্যের ভূমিশায়ী রশ্মিরেখা চেষ্টা করিতেছে; আশে পাশের গাছ-পালার অস্পষ্ট আকার আলো ভীরু-প্রেতাত্মার মত শঙ্কিত ভাবে কাঁপি-তেছে; কিছুক্ষণের মধ্যেই দর্পনারায়ণের সর্ব্বাঙ্গ বিন্দু বিন্দু জল-কণায় আর্দ্র হইয়া গেল।

সূর্য্যের কিরণ প্রখরতর হইয়া উঠিল; কুয়াশার মলমল অপসারিত হইতে হইতে দিগন্তের ধারে গিয়া ঠেকিল; দুই তীরে তীব্র পীতবর্ণ সরিষার ক্ষেত প্রকাশিত হইয়া পড়িল; সরিষার ক্ষেতের মদির গন্ধে বাতাস মন্থর, বজরা ভাসিয়াই চলিয়াছে, দুই তীরের মাঠে কখন বা ছোলার কচি ক্ষেত, কখন কচি মশুরের, কখন বা কচি আখের; শস্যের শ্যামলবর্ণ শিশিরের শুভ্র প্রলেপে ম্লানতর; নদীতে তরঙ্গ নাই; মাঠে লোকজন নাই; আকাশে মেঘ নাই, বাতাস যেন এখনো নিদ্রিত। সমস্তটা মিলিয়া দর্পনারায়ণের কাছে একটা স্বপ্ন-জগৎ বলিয়া মনে হইতে লাগিল; তার মনে হইল পৌরাণিক কবিরা যে উর্ব্বশীর কল্পনা করিয়াছেন, তার মূলে ছিল এমনি একটি শীত-প্রভাতের মূর্ত্তি। উর্ব্বশীর মত ইহা চিরপ্রসন্ন, বয়োলেখাহীন, চিরযৌবনময়ী; উর্ব্বশীর মুখের সদ্যজাত সৌকুমার্য্য যেন অতাপচিহ্নিত ধরণীর মুখচ্ছবি হইতেই পাওয়া! এই ধরিত্রী মানবের আদিমতম শিশুর কাছে যেমন নবীনা মনে হইয়াছিল, আমাদের কাছেও তেমনি করিয়া প্রতিভাত! ধরিত্রীই উর্ব্বশী; আমাদের গৃহ-প্রান্তের ক্ষুদ্র উদ্যানই গল্পে-শোনা নন্দন কানন।

২

ক্রমে মাঝি-মাল্লারা জাগিয়া উঠিল, দর্পনারায়ণ আলিবর্দ্দিকে ডাকিয়া পাঠাইল। আলিবর্দ্দি আসিলে দর্পনারায়ণ বলিল—আলিবর্দ্দি রাগ করে ত চলে এলাম। কোথায় যাব সে জন্য ভাবি না, যতদিন বজরাখানা আছে না হয় নদীতে নদীতেই ঘুরে বেড়াব। কিন্তু টাকা পয়সা যে ফুরিয়ে গেল রে!

আলিবর্দ্দি বলিল—টাকা পয়সা-ই না হয় ফুরাল, কিন্তু জমিদারী ত আছে।

দর্পনারায়ণ খানিকটা অনুমান করিয়া বলিল—তা ত আছে।

আলিবর্দ্দি বলিল—তবে আবার কি! জমিদারী আছে, তুমিও আছ, তবেই হ'ল! এই বজরাই আমাদের কাছারী। অনেক দিন ত জমিদারী দেখিতে কেউ যায় নি। কর্ত্তা ত ও কাজ প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন; মনে কর না কেন, তুমি সেই জন্য বেরিয়েছ।

প্রস্তাবটা দর্পনারায়ণের মন্দ লাগিল না; কিন্তু কর্ত্তাদাদার ভীতিটা মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করিতে লাগিল। আলিবর্দ্দি তাহা বুঝিল; কিন্তু সে বিষয়ে তর্ক তুলিল না; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা সে বুঝিয়াছে যে, তর্কে কখন মীমাংসা হয় না; চরম মীমাংসা কাজ! তর্কের অপেক্ষা কাজ অনেক সহজ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লোকে কাজকেই ভয় করে।

সকালের দিকেই দর্পনারায়ণের বজরা চররুইমারিতে লাগিল। আলিবর্দ্দি গ্রামের মধ্যে খবর দিবার জন্য নামিয়া গেল।

চররুইমারির একটু ইতিহাস আছে; এই গ্রামখানি চৌধুরীদের খুব বেশি দিনের নয়; টাকা-পয়সা দিয়াও কেনা হয় নাই। দর্পনারায়ণের পিতা কন্দর্পনারায়ণ ও আলিবর্দ্দিই এক সময়ে লাঠির জোরে ইহা দখল করিয়াছিল; তখন গ্রামখানা নগণ্য ছিল; তারপরে অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে; চৌধুরীদের কৃপায় ও শাসনে চররুইমারি আজ বড় হইয়াছে, লাভের সম্পত্তি হইয়াছে।

আলিবর্দ্দির নিকটে খবর পাইয়া গ্রামের প্রধানেরা আনন্দিত হইয়া উঠিল, নিজেদের অত্যন্ত সৌভাগ্যমান্ মনে করিল; সেকালে জমিদার গ্রামে আসিলে প্রজারা খুসি হইত; বিশেষ কন্দর্পনারায়ণকে তাহারা ভয় করিত কাজেই ভক্তিও করিত, তার লাঠির জোর তখনো অনেকের মনে ছিল, তাঁরই পুত্র আসিয়াছে, ভবিষ্যৎ জমিদার, খুসী হইবার কথা। গ্রামের প্রধানেরা প্রচুর পরিমাণে নজর লইয়া বজরায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামের সমস্ত লোক ঘাটে আসিয়া ভিড় করিল। সকলেই সাধ্যমত কিছু ভেট আনিয়াছে। গোয়ালা দই, ক্ষীর, ঘি আনিল; জেলে টাটকা-ধরা মাছ আনিল। ময়রা সন্দেশ আনিল; চাষীরা তরিতরকারী আনিল,—বেগুন, মূলা, কুমড়ো, লাউ, উচ্ছে; নানা রকমের শাক; রুইগঞ্জের বিখ্যাত তাঁতীরা ধুতি, চাদর, শাড়ীর ভেট আনিল; দেখিতে দেখিতে বৃহৎ বজরা নানাবিধ দ্রব্যে পূর্ণ হইয়া গেল; মাঝিরা বাবুকে বলিল যে, আর অধিক জিনিস চাপিলে নৌকা চলিবে না।

প্রাথমিক পরিচয়ের পালা শেষ হইলে গ্রামের প্রধান বদর মণ্ডল বলিল—দাদাবাবু কোন্ দুঃখে আপনি নদীতে নদীতে ঘুরে বেড়াবেন! তার চেয়ে রুইমারিতে বাস করেন আমরা সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি! কর্ত্তার আর কতদিন।

সে আলিবর্দ্দির নিকট হইতে সব ঘটনা শুনিয়াছে।

প্রজাদের আনুকূল্যে ও শ্রদ্ধায় দর্পনারায়ণের মন ভিজিল বটে, কিন্তু সে তাদের কথায় স্বীকৃত হইতে পারিল না। সে বলিল—তোমাদের কথা আমার মনে থাকবে, কিন্তু রুইমারিতে থাকতে পারব না; যদি এ গায়ে থাকি, তবে আবার অন্য গাঁয়ের লোকেরা অসন্তুষ্ট হবে। তার চেয়ে আমি বজরা করে সব গাঁগুলো দেখে বেড়াব, কেউ রাগ করতে পারবে না।

দর্পনারায়ণের যুক্তি সকলে স্বীকার করিল।

বদর বলিল—দাদাবাবু, আমাদের গ্রামে থাকলেন না, কিন্তু একটা কথা রাখতে হবে। পৌষ কিস্তির খাজানার সময় হয়েছে, এ কিস্তির খাজনা আমরা আপনাকেই দেব।

দর্পনারায়ণ বলিল—কিন্তু শেষে কি তোমরা দ্বিগুণ দেবে! আমাকে যদি খাজনা দাও, কাছারীতে দেবে কি?

বদর বলিল—হিসাব! দাদাবাবু গ্রামের আমিই তশীলদার! খাজনা

আপনাকে দিলাম—হিসাব রইল; কাছারীতে এই মাসের শেষে গিয়ে হিসাব দিয়ে আসব। বুড়ো মানুষের টাকা ব'য়ে নিয়ে যাওয়ার মেহনৎ-টা বাঁচল।

উদয়নারায়ণের কথা স্মরণ করিয়া দর্পনারায়ণের মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—কিন্তু—

বদর তাকে থামাইয়া দিয়া বলিল—কিন্তু আমরা বুঝব।

বিকালের দিকে প্রজারা গ্রামে ফিরিয়া গেল; তারা জমিদারকে রাখিতে পারিল না বটে, কিন্তু আজকার দিনটা তাদের একটা স্মরণীয় তারিখ হইয়া রহিল।

রাত্রে আহারাদির পরে বজরা খুলিয়া দেওয়া হইল; বর্ত্তমানের মত দর্পনারায়ণের অর্থাভাব মিটিল।

রাত্রে শুইতে গিয়া দর্পনারায়ণ দেখিল বনমালা কাঁদিতেছে। দর্প-নারায়ণ অনেক সাধাসাধি করিবার পরে বনমালা বলিল—আমার জন্যেই তোমার এত কষ্ট।

সে বলিল—কষ্ট তা কি করে জানলে।

—ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছ।

—ভেসে বেড়াচ্ছি সে কথা ঠিক। কিন্তু ভেসে বেড়াবার চেয়ে যে ডুবে মরা বেশী সুখের তা কে বলল।

উত্তর শুনিয়া বনমালা হাসিয়া ফেলিল—বলিল—যাও।

ক'দিন আগেও বনমালা দর্পনারায়ণকে আপনি বলিত। সে কত সাধিত, বলিত, স্বামীকে আপনি বলা ভাল দেখায় না, আপনি বলিলে পর মনে করা হয়, কিন্তু বনমালা, তখন রাজী হয় নাই। তারপরে কখন কি ঘটিল, বনমালা নিজের অজ্ঞাতসারে স্বামীকে তুমি বলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বনমালা বলিল—আমাকে বিয়ে করাতেই কর্ত্তার রাগ হয়েছে।

দর্পনারায়ণ তার মুখের উপর হইতে চুলগুলি সরাইতে সরাইতে বলিল—কিন্তু তোমাকে দেখলে তাঁর রাগ কখনও থাকবে না।

—ইস্ কি করে বুঝলে।

দর্পনারায়ণ বালিশটা দোভাজ করিয়া তার উপরে মাথা রাখিয়া বলিল—নিজেকে দিয়েই বুঝেছি।

—তোমার কথা ছাড়; তুমি যাকে দেখ তাকেই তোমার ভাল লাগে।

দর্পনারায়ণ বুঝিল বনমালা ইন্দ্রাণীর কথা ভাবিতেছে। সে ইন্দ্রাণীর ঘটনা আত্মস্ত তাকে বলিয়াছিল।

সে বলিল—সে কথা সত্যি। কিন্তু আরও ভাল না পেলে কেউ ভালকে ছাড়ে?

বনমালা বালিশে মুখ গুজিয়া বলিল— না, তোমাদের বিশ্বাস নাই।

ইহা বনমালার কথা নয়, পুরুষ জাতির প্রতি নারী জাতির উক্তি।

বনমালা ভাবিতে লাগিল, অনেকবার ভাবিয়াছে—সে নিশ্চয় ইন্দ্রাণীর চেয়ে সুন্দর, নতুবা দর্পনারায়ণ তাকে বিবাহ করিবে কেন? এ বিজয়ে ত তার আনন্দিত হইবার কথা। কিন্তু কেন জানি সে এই কল্পনায় নিছক আনন্দ অনুভব করিতে পারিত না; কোথা হইতে বিষাদের একটা সুর আসিয়া মিশিত। বনমালা জানিত না জীবন-উত্তরীয়ের একটা সুতা সুখের, একটা-দুঃখের টানা-পোড়ানে ইহার বয়ন, তাই জীবন এত বিচিত্র; জীবন সুখেরও নয়, দুঃখেরও নয়; ভালও নয়; মন্দও নয়; স্বর্গীয়ও নয়, নারকীয়ও নয়; ইহা বিচিত্র, অদ্ভুত, অপূর্ব্ব; ইহার জুড়ি নাই বলিয়াই ইহাকে বুঝিয়া ওঠা কঠিন, কার সঙ্গে ইহার তুলনা করিব। স্বয়ং বিধাতাও ইহাকে সমগ্রভাবে বুঝিতে পারেন না।

বনমালার মুখ তুলিবার জন্য দর্পনারায়ণ সাধিতে লাগিল, কিন্তু সে যে সেই মুখ গুঁজিল আর নড়িল না; কিছুক্ষণ ঠেলাঠেলি করিবার পরে

সে বুঝিল বনমালা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দর্পনারায়ণ ভাবিল, শেষরাত্রে তার মান ভঞ্জন করিতে হইবে। কি অভিনব উপায়ে তাকে খুসী করিবে ভাবিতে ভাবিতে দর্পনারায়ণ ঘুমাইয়া পড়িল।

৩

দর্পনারায়ণ প্রত্যাখ্যাত হইবার পর হইতে উদয়নারায়ণ বৈঠকখানা হইতে বাহির হওয়া বন্ধ করিল; বাড়ীর ভিতরেও কদাচিৎ যাইত; সে লোকজনের সঙ্গে দেখা করিত না; তার সে অট্টালিকা-কম্পনকারী হাসি আর ধ্বনিত হয় না; বৃহৎ বাড়ী ভয়ে গম্ গম্ করিতে থাকে। লোকজন মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা বলে; ধীরে ধীরে চলাফেরা করে; জোরে নিঃশ্বাস ফেলিতেও যেন লোকের ভয় করে।

ইতিপূর্ব্বে উদয়নারায়ণ কখনও আব্বরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে নাই, আর বলিবেই বা কি প্রকারে। সে ত' বোবা! কিন্তু এখন ঘন ঘন আব্বরের ডাক পড়ে! সারাদিন ঘরের মধ্যে বন্ধ হইয়া আব্বরের সঙ্গে কি কথা হয়, কেমন ভাবে কথা হয় লোকে বলিতে পারে না! কেবল মাঝে মাঝে লোকে ঘরের মধ্য হইতে আব্বরের শুষ্ক হাসির ধ্বনিতরঙ্গ ও দাঁড়কাকটার কঃ কঃ শব্দ শুনিতে পায়।

দর্পনারায়ণ চলিয়া যাইবার পর হইতে উদয়নারায়ণ একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িল; বৃদ্ধ বয়সে নিরাশ্রয়ভাবে মেরুদণ্ড সন্নত রাখিতে কয়জনে পারে! শিশু, নারী, বৃদ্ধ ও লতার আশ্রয় নহিলে চলে না! লতার পক্ষে বিতান, বৃদ্ধের পক্ষে সন্তান!

হঠাৎ তার আব্বরকে মনে পড়িয়া গেল। আব্বর দর্পনারায়ণের স্নেহের পাত্র ছিল, সেই সূত্রে সে আব্বরের মধ্যে পৌত্রের একটা কোমল

অংশের প্রতিচ্ছায়া যেন পাইল। বিশেষ আব্বর মুখ ও বধির। সে এমন একটা নিঃশব্দ ও নির্ব্বাক জগতের অধিবাসী যাহা অন্তিম শব্দহীন বাক্যহীন জগতের সগোত্র। উদয়নারায়ণ আজ প্রায় সেই জগতের সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত, কাজেই অতি অনায়াসে যেন আব্বরের সঙ্গে সে নিজের মিল খুঁজিয়া পাইল। শিশুরাও এইরূপ একটা জগতের প্রতিবেশী; কাজেই একটা বালক দর্পনারায়ণ অত লোকের মধ্যে আব্বরকে বুঝিতে পারিয়াছিল, আজ আবার বৃদ্ধ উদয়নারায়ণ তাকে বুঝিতে পারিল। আব্বর একাধারে শিশু ও বৃদ্ধ।

উদয়নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিত—ওরে আব্বর, দর্পনারায়ণ কি আমাকে ভালবাসে?

কাকটা ডাকিয়া উঠিত কঃ কঃ; আব্বর তার মাথায় চড় মারিত; কাকটা থামিত। আব্বর দুইহাতে ভর করিয়া একটা ডিগবাজী খাইত; মানব ভাষায় ডিগবাজীটাকে অনুবাদ করিলে দাঁড়ায়—বাসিত বইকি! আমাকেও বাসিত।

উদয়নারায়ণ আবার জিজ্ঞাসা করিত—তবে ছেড়ে গেল কেন?

কাক-টা ডাকিয়া উঠিত কঃ কঃ; আব্বর আবার তাকে চড় মারিয়া থামাইয়া দিত! তারপরে দুইহাত শূন্যে তুলিয়া একবার ঘুরপাক খাইত; অর্থ এই যে আবার ফিরিবে।

এই রকম করিয়া প্রতিদিন অলৌকিক ভাষায় উভয়ের মধ্যে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিত! অথর্ব্বের সঙ্গে অবোধের সংলাপ; ভগ্নাশ্রয়ের সঙ্গে নিরাশ্রয়ের আলাপ; মৌনের সঙ্গে মূকের চিত্ত-বিনিময়।

এমন সময় একদিন চৌধুরীবাড়ীতে চররুইমারির বৃদ্ধ তহশীলদার আসিয়া উপস্থিত হইল। দেওয়ানজীর সঙ্গে খাজনার হিসাবনিকাশ করিয়া নগদ টাকার পরিবর্ত্তে দর্পনারায়ণের সইকরা কাগজ ফেলিয়া দিল! বলিল—টাকা দাদাবাবুকে দিয়াছে; তাকে চালান সই করিয়া দেওয়া

হোক। আদ্যন্ত শুনিয়া দেওয়ানজীর পক্ক গোপজোড়ার দুই প্রান্ত আপনা হইতেই ধীরে ধীরে নিচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। কেবল একটি কথা তার মুখ হইতে দীর্ঘায়িত হইয়া বাহির হইল, চালান! বৃদ্ধ তহশীলদার বলিল—আজ্ঞে, একটু তাড়াতাড়ি, এখনি আবার ফিরিতে হবে—অনেকখানি পথ।

কাছারীতে একটা বিপ্লব পড়িয়া গেল। ইহা ত' নিয়ম নয়; সব টাকা কাছারীতে জমা হইবে: অন্য কেউ টাকা লইলে সরকার দায়ী হইবে না; তহশীলদার এতদিনের লোক হইয়াও যে কি করিয়া এমন কাজ করিল। ইহার জন্য সে-ই দায়ী। ও-টা তাকেই পূরণ করিয়া দিতে হইবে।

এইবার তহশীলদারের বলিবার পালা। সে রুখিয়া উঠিয়া বলিল—ভাল রে ভাল! তোমরা সবাই মিলে জমিদারির যে মালিক তাকে দিলে তাড়িয়ে; আর আমরা তাকে খাজনা দিয়ে করলাম অপরাধ!

দেওয়ানজী তাকে উচ্চস্বরে কথা বলিতে নিষেধ করিয়া বলিল—আমরা কি করব! কাণ্ডখানা করলেন ত' কর্ত্তা!

তহশীলদার কণ্ঠের-স্বর পূর্ব্ববৎ রাখিয়া বলিল—আমি কি কাউকে ছেড়ে কথা বলছি! আমি সব্বাইকে বলছি! অমন যদি কর, তবে চররুইমারির খাজনা এক পয়সাও আর কাছারীতে আসবে না! সব যাবে দাদাবাবুর কাছে! দেওয়ানজীও তাকে শান্ত করিলেন; বলিলেন, আচ্ছা বাপু বেশ করেছ; এখন কর্ত্তার একটা হুকুম নেওয়া চাই।

কিন্তু মুস্কিল বাঁধিল ওইখানে! কে হুকুম আনিতে যাইবে?

দেওয়ানজী জমারনবিশকে বলিল; সে বলিল—আজ আমার একাদশী; একসঙ্গে দু'টো বিপদ আজ আমি সহ্য করতে পারব না। তারপরে শুমারনবিশকে হুকুম হইল; শুমারনবিশের পালোয়ান বলিয়া খ্যাতি ছিল; সে বলিল—দেওয়ানজী পশ্চিমের পুকুর পাড়ের জঙ্গলে একটা বাঘ এসেছে

বলে শুনছি; লোকের বাছুরটা ছাগলটাও ধরেছে; বরঞ্চ হুকুম করেন সেখানে যাই।

একে একে সকলকেই দেওয়ানজী সাধিল; কেহই কর্ত্তার কাছে যাইতে রাজী নয়। শেষে একজন নব-নিযুক্ত কর্ম্মচারীকে দেওয়ানজী হুকুম করিল—তোমাকে যেতেই হবে, নইলে চাকুরী থাকবে না। সে কয়দিন মাত্র আসিয়াছে; কর্ত্তার পুরা পরিচয় পায় নাই, বিশেষ তার উভয়-সঙ্কট। সে অগত্যা রাজী হইয়া প্রয়োজনীয় কাগজপত্র লইয়া গুটি গুটি বৈঠকখানার দিকে অগ্রসর হইল। কাছারীর সমস্ত লোক, চৌধুরী-বাড়ীর সকলে বৈঠকখানার সম্মুখে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল; এমন তামাসা দেখিবার সৌভাগ্য অনেক দিন তাদের হয় নাই।

ঔৎসুক্যের বশে জনতা নিঃশ্বাস রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; কই তর্জ্জন গর্জ্জন ত' শোনা যায় না! তবে কি একেবারেই লোকটার হইয়া গেল না কি?

প্রায় আধ-ঘণ্টা পরে সকলে দেখিল বৈঠকখানার দরজা ঈষৎ মুক্ত হইল; আরও একটু খুলিল—লোকটা সবেগে বাহির হইয়া আসিল—তার কাঁধের উপর কর্ত্তার গায়ের দামী শালখানা; আর মুখে তার কর্ণস্পর্শী হাসি। ব্যাপার কি? সকলে এক নিমিষে লোকটাকে ঘিরিয়া ধরিল—খবর কি? দেওয়ানজী তাকে কাছে টানিয়া জিজ্ঞাসা করিল কি হে ঘোষ, খবর কি? ঘোষ-পুত্র দন্তপংক্তি বিকশিত করিয়া বলিল, আজ্ঞে কাশ্মীরি শাল। তারপরে অনেক ধমক খাইয়া, অনেক ঢোক গিলিয়া সে বলিল, আজ্ঞে কর্ত্তা খবর শুনে খুসী হয়ে বলে উঠিলেন, বেশ করেছ, বাপকা বেটা বটে। এই বলে তিনি গা থেকে শালখানা খুলে আমাকে বক্‌শিস দিলেন। তার পরে সে দেওয়ানজী ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজ্ঞে আপনারা ভয় পাচ্ছিলেন কেন?

দেওয়ানজী বিরক্ত হইয়া বলিল, তোমার বাপের পুণ্য বেঁচে গেছ,

আবার ভয় পাচ্ছিলেন কেন ? অদৃষ্টের বিচার-বিড়ম্বনায় দেওয়ানজীর মন যেন খারাপ হইয়া গেল ; সে ক্ষুণ্ণ-স্বরে তহশীলদারকে বলিল, চল হে তোমার রসিদখানা দিয়ে দিই। হতাশ জনতা রসভঙ্গজনিত দুঃখে ক্রমে ক্রমে সরিয়া যাইতে লাগিল। যাইতে যাইতে সকলেই একবার মানসাঙ্কে কাশ্মীরি শালখানার মূল্য নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

৪

তিন দিন চলিবার পর দর্পনারায়ণের বজরা চলন-বিলে আসিয়া পৌঁছিল।

চলন-বিল কুম্ভকর্ণের মত ; ছয়মাস জাগিয়া থাকে, ছয় মাস ঘুমায় ; শীতের কয়েকমাস তার নিদ্রা ; বাকি কয়েক মাস তার জাগরণ। শীতের শান্ত চেহারা দেখিয়া তার বর্ষার প্রতাপ বুঝিবার উপায় থাকে না, তাই বলিতেছিলাম, শীতের মাস কয়েটা সে পড়িয়া ঘুমায়।

জল তখন সরিতে থাকে ; জল যতই নামিয়া যায়, ডাঙা ততই হাত পা ছড়াইতে থাকে ; শেষে একদিন জল ন্যূনতম ও মাটি গরিষ্ঠতম হইয়া দাঁড়ায়।

নিদ্রিত কুম্ভকর্ণকে ভয় করে কে ? সে তখন শিশুর চেয়ে নিরীহ। মানুষ লাঙল লইয়া ধীরপদে বাহির হইয়া আসে, গরু আনে, বীজ আনে দৈত্যের নিদ্রার সুযোগ লইয়া চাষ করিয়া ফসল বোনে। সরিষা, হলুদ মটর, মশুর, ছোলা বাড়িতে থাকে, ফুল ধরে, ফসল পাকে, আবার মানুষ ব্যস্তপদে আসিয়া কাটিয়া লইয়া যায়, দৈত্যটা অকাতরে পড়িয়া ঘুমাইতে থাকে, কিছুই জানিতে পারে না।

এই কয়মাস সদ্য-জাগা চরে মানুষ দেখা যায় ; গরু দেখা যায়, রাখাল দেখা যায় ; ইতর প্রাণী দেখা যায়, এই কয়মাস মানুষের রব, রাখালের

সুর গরুর ঘন্টা শোনা যায়; কিন্তু সব দৃশ্য ও শব্দের মধ্যেই যেন অন-ধিকার প্রবেশের একটা চাপা আশঙ্কা আছে।

তারপরে একদিন বৈশাখের প্রারম্ভে পূর্ব্ব দিগন্ত হইতে ব্রহ্মপুত্রের কালো জল সর্পের কুটিল গতিতে শতমুখ দিয়া বিলের মধ্যে প্রবেশ করে; কুম্ভকর্ণ নিদ্রা ভাঙ্গিয়া জাগিয়া বসে। আবার একদিন আষাঢ়ের প্রারম্ভে পশ্চিম দিগন্ত হইতে পদ্মার ঘোলা জল দুধরাজ সর্পের সর্পিল গতিতে বিলের মধ্যে প্রবেশ করে, সদ্যোত্থিত দৈত্য আলস্য ভাঙ্গিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠে। তখন কোথায় ডাঙা, কোথায় মানুষ; তখন কে বলিবে এই দুর্দ্দান্ত দানব ঘুমাইয়া ছিল। একদিক হইতে আসে ঘোলা জল, আর দিক হইতে কালো জল, মাঝখান দিয়া প্রবাহিত হয় কালো শাদার যুক্ত বেণীর সঙ্গম। যতদূর তাকাও মানুষ নাই, গ্রাম নাই লোকালয়ের কোন চিহ্ন নাই; মাঝে মাঝে দু'একটা গ্রামের ক্ষীণ রেখা; অবশেষে, তাহা বুকজলের দুস্তর পরিখায় বেষ্টিত; প্রকৃতির বন্দী মানুষ। দু'একখানা নৌকা দেখা যায় বটে, কিন্তু সে-ও যেন বিলের ইচ্ছাতেই বাঁচিয়া আছে,—বিলের অমনোযোগে বাঁচিয়া আছে,—একটা দমকা বাতাসে, একটা ঢেউয়ের তাড়নায় অনায়াসে ডুবাইয়া দিতে পারে; অক্লেশে মারিতে পারে বলিয়াই সে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। বিলের মারণেও উদারতা আছে। তখন জল থৈ থৈ বিশাল দুস্তর লইয়া বিল সমুদ্রের লীলা করিতে থাকে।

বিলের মধ্যে দর্পনারায়ণের বজরা চলিতেছে, জানালায় বসিয়া বনমালা ও সে দুই তীরের দিকে চাহিয়া আছে। কোথাও একটানা বহুবর্ণ-রঞ্জিত বিচিত্র শস্যক্ষেত্র দ্রৌপদীর ক্রমবর্দ্ধমান অঞ্চলের মত নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়াছে, শেষ নাই চোখেরও ক্লান্তি নাই; কোথাও বালুকাবন্ধুর অনুর্ব্বর তীরভূমি, এখনও সে মানুষের বশ্যতা স্বীকার করে নাই; লাঙ্গলের চিহ্নে তার পিঠ কলঙ্কিত হয় নাই; কোথাও ঘাসের ক্ষেত; গরু চরিতেছে, লেজ দিয়া পিঠের মাছি তাড়াইতেছে;

দু' একটা গরু বসিয়া চোখ বন্ধ করিয়া রোমন্থন করিতেছে, একটা শালিক ঠোঁট দিয়া তার কানের পোকা বাছিতেছে, মুখ দেখিয়া মনে হয় গরুটার ভারি আরাম। কোথাও বা একটা গরু দল হইতে দূরে আপন মনে চরিতেছে, তার পিছনে একটা গো-বক পায়ে পায়ে চলিতেছে।

কোথাও বা গ্রামের ঘাট; কেহ কলসী ভরিয়া জল তোলে; কেহ স্নান করে, ছেলেরা সাঁতার কাটে; বউ ঝি-রা এক পাশে ডুব দেয়; জেলেরা আড় বাঁধিয়া জাল শুকাইতে দিয়াছে; ঘাটে বাঁধা নৌকার গায়ে শেওলা জমিয়া গিয়াছে; গোটা কয়েক পাতি-হাঁস জল ছিটাইয়া চঞ্চুপ্রসাধনে রত; নৌকা বাঁধিবার খোঁটার উপরে দুটা মাছরাঙ্গা এক দৃষ্টে জলের দিকে চাহিয়া উপবিষ্ট; মাঝে মাঝে এক একবার একখণ্ড সজীব মরকতের মত সশব্দে জলে পড়িতেছে; পুঁটি জাতীয় একটা মাছ মুখে করিয়া খোঁটার উপরে গিয়া বসিতেছে; আকাশের উচ্চতম প্রান্তে শঙ্খচিলের বুকের একটা শ্বেতবিন্দু।

ক্রমে বেলা বাড়িতে থাকে; ঘাটের লোক কমিয়া যায়; নদীর তীর জনশূন্য হয়, রৌদ্র প্রখর হইয়া ওঠে, আর সমস্ত মাঠঘাট, জলস্থল প্রকৃতির উপরে বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের প্রযোজক অতি সূক্ষ্ম নীলাভ বাষ্পের মলমলের একখানা যবনিকা টানিয়া দেয়।

দর্পনারায়ণ ও বনমালা জানালায় বসিয়া দুই তীরের দৃশ্য দেখিতে থাকে; সব যায়গাই বনমালার এত ভাল লাগে যে, তার ইচ্ছা, করে সেখানে নৌকা বাঁধিয়া চিরকাল কাটাইয়া দেয়। এইমাত্র যে স্থানটাকে সুন্দর মনে হইয়াছিল, তার পরের স্থানটাকে তার চেয়েও সুন্দর মনে হয়। অর্দ্ধ-পরিচয়ের রহস্যময় তীর হইতে এই সব স্থান তাকে ইসারা করিতে থাকে। সেই জন্যই দূরের শেওলা ঘন দেখায়, দূরের পাহাড় নীল দেখায়, অতীতের দুঃখকেও আর যেন দুঃখ বলিয়া মনে হয় না।

বজরা মাঝে মাঝে এক জায়গায় বাঁধা হয়; স্নানাহার সম্পন্ন হইলে

আবার বাঁধন খুলিয়া দেওয়া হয়; বনমালার মনে হয়, পৃথিবীর সব চেয়ে মনোরম স্থানটা অকারণে ছাড়িয়া যাওয়া হইল। বজরার ছাদের উপরে আলিবর্দ্দি বসিয়া থাকে; সে মাঝে মাঝে নূতন নূতন গ্রামের নাম হাঁকিয়া বলে; দর্পনারায়ণ সেই গ্রামের বিষয়ে কোন গল্প জানা থাকিলে বনমালাকে শোনায়।

সেদিন বিকাল বেলা আলিবর্দ্দি ছাদের উপর হইতে হাঁকিয়া বলিল —দাদাববু, এই হচ্ছে কইজুড়ি, ওই যে উঁচু ভিটে, ওটা হচ্ছে বেণী রায়ের কালীবাড়ী; ওই যে ফাঁসিবট।—দুইজনে তাকাইয়া দেখিল প্রকাণ্ড একটা বটগাছ, বহুকালের প্রাচীন, প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় একটা অজগরের মত সর্পিল ভঙ্গীতে আকাশের দিকে উঠিয়াছে। প্রকাণ্ড বনস্পতি সহস্র শাখা দিয়া অন্ধকার ঘনীভূত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—এতবড় গাছ দেখা যায় না।

বনমালা জিজ্ঞাসা করিল, বেণী রায় কে? কই তার কালীবাড়ীর কোন চিহ্ন নাই! গেল কোথায়? মাগো, এতবড় গাছ তো জন্মে দেখি নি!

দর্পনারায়ণ বলিল, ছিল, এখানে মস্ত গ্রাম ছিল এককালে, এখন কিছু নাই—সে অনেক দিনের কথা।

বনমালা বেণী রায়ের কাহিনী শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। তখন দর্পনারায়ণ শীতের ঘনায়মান অন্ধকারে আরম্ভ করিল—

———

বেণী রায়ের কাহিনী

সে অনেক দিনের কথা, প্রায় আড়াইশ বছর হবে, এখানে মস্ত গ্রাম ছিল, আজ তার কিছুই নাই, কেবল নামটা আছে, নাম হচ্ছে কইজুড়ি। ওই বটগাছও তেমনি ছিল; ওর বয়স যে কত তা কেউ জানে না, একশ বছরের বুড়োও বলে সে অমনি দেখছে, তার পিতামহরাও ওই গাছকে অমনি দেখে আসছে।

ওই গাছের নীচে ছিল মস্ত এক দীঘি; এখন তার খানিকটা আছে, আর সমস্ত ভেঙ্গে নদীর সামিল হয়ে গেছে। বর্ষাকালে দীঘিতে আর নদীতে এক হয়ে যায়—গাছটির কোমর অবধি জলে যায় ডুবে। গ্রীষ্মকালে নদী সরে যায়, দীঘির পাঁজরা বেরিয়ে পড়ে, তার শুষ্ক তলদেশ দেখা যায়, সেখানে প্রকাশিত হয়ে পড়ে শত শত নর-কঙ্কাল। কতক এখনও কঙ্কাল বলে বোঝা যায়, আর কতযে মাটিতে মিশে মাটি হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। ওই যে উঁচু পাড়, গাছটার ঠিক নীচেই ওইখানেই ছিল বেণী রায়ের কালী-বাড়ী। এখন শুধু ভিটেটা আছে—কিন্তু তার খ্যাতি এমনি যে কালী পূজোর রাত্রে দূর-দূরান্ত থেকে সব লোক এসে পূজো দিয়ে যায়। বছরে সেই একটা দিন—এখানে লোকের সাড়া-শব্দ পাওয়া যায়, আর সারা বছরের মধ্যে কেউ আসে না। এ জায়গাটাকে এ অঞ্চলের লোক এমন ভয় করে যে, খুব গরমের সময়েও রাখাল ছেলেরা এ গাছের তলায় এসে বিশ্রাম করতে ভয় পায়। বরঞ্চ তারা কাঠফাটা রোদে মাঠের মধ্যে বসে থাকবে, তবু এখানে আসবে না।

বনমালা ঔৎসুক্যের আতিশয্যে জিজ্ঞাসা করিল—বেণী রায় কে?

সেই কথাই তো বলছি। বেণী রায় ছিল এই অঞ্চলের দুর্দ্দান্ত এক জমিদার; আর সেকালের সব জমিদারদের মত ডাকাতও বটে।

এই কইজুড়ি গ্রামে একদল ছোটলোক ডাকাতের বাস; একদল কেন—গ্রামের সব লোকই ছিল ডাকাত। এদের অত্যাচারে আশে পাশের লোক উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল; কত গ্রাম যে জনশূন্য হয়ে গেল তার ঠিক নাই; কেউ এদের শাসন করতে পারে না, আর শাসন করবেই বা কে? রাজা তো নেই। শেষে এদের সাহস এত বেড়ে গেল যে, একবার এরা বেণী রায়ের বাড়ীতে গিয়ে পড়ল। বেণী রায় তখন বাড়ীতে ছিল না, ডাকাতরা টাকাকড়ি লুটে আনল আর আনল তার বোনকে ধরে।

বেণী রায় ফিরে এসে সব শুনল। তার দলবল সংগ্রহ করল, পাঁচশ ছিল তার নৌকা, হাজার তার ঢালী; বন্দুক, ঢাল, তলোয়ার, লাঠি শড়কি নিয়ে সবাই পড়ল এসে কইজুড়িতে। সেই এক রাত্রে কইজুড়ি গ্রাম বিধ্বস্ত হয়ে গেল—ছেলেবুড়ো মেয়েমদ্দা একটি প্রাণী বাঁচল না; সকলের ছিন্ন দেহ পড়ল ওই দীঘির জলে। কিন্তু তাতে বেণী রায়ের উদ্দেশ্য সফল হ'ল না—কারণ তার আসবার আগেই তার বোন দীঘিতে ঝাঁপ দিয়েছিল।

কইজুড়ি গ্রাম জনশূন্য করেও বেণী রায়ের রাগ পড়ল না—ক্ষুধিত দাবানলের মত তা বেড়েই চলল। সে ওই দীঘির ধারে বটগাছের তলায় এক কালী স্থাপন করল, আর প্রতি রাত্রে চলতে লাগল সেই কালীর কাছে নরবলি। ক্রমে চলন-বিল জনশূন্য হ'ল, কিন্তু বেণী রায়ের মন প্রতিহিংসাশূন্য হ'ল না। পূবে যমুনার ধার থেকে পশ্চিমে পদ্মা পর্য্যন্ত বেণী রায়ের প্রতিহিংসা বলি খুঁজে ফিরতে লাগল—প্রতিরাত্রে তার একশ আটটা বলি চাই-ই। শেষে লোক সব পালাতে আরম্ভ করল—কতক পালাল যমুনা পার হয়ে ময়মনসিংহ জেলায়—কতক পালাল পদ্মা পার হয়ে নদীয়ায়।

এই সময়ে রাজা মানসিংহ এলেন সুবে বাংলা জয় করতে, আকবর বাদশার সেনাপতি অম্বরের অধিপতি রাজা মানসিংহ। বাংলা দেশ জয় করে' যখন তিনি ফিরছেন,—সেকালে দক্ষিণ আর পশ্চিমবঙ্গকেই লোকে বাংলা দেশ বলত এ সব অঞ্চলের বড় কেউ খোঁজ রাখত না—তখন তাঁর

কানে বেণী রায়ের অত্যাচারের কথা গেল। তিনি সসৈন্যে বেণী রায়কে দমন করতে এলেন পদ্মা পার হয়ে। কিন্তু তার পরে? এদিকে সব বিল আর জল, নদী আর খাল; বাদশাহী ফৌজ যাবে কেমন করে? তা ছাড়া বেণী রায় কি মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করবে? সে আজ এখানে কাল ওখানে। মানসিংহ তাকে ধরবেই বা কেমন করে? মানসিংহ প্রকৃত অবস্থা বুঝে এক কাজ করলেন, চরের হাতে বেণী রায়ের নামে এক চিঠি পাঠালেন, তাতে লিখলেন—তোমার কোন ভয় নাই, তুমি একাকী এসে আমার সঙ্গে দেখা কর, আমিও একা দেখা করব—একা এবং নিরস্ত্র। বিশ্বাসঘাতকতার ভয় নেই, রাজপুতরা বিশ্বাসঘাতকতা করে না।

বেণী রায় সাহসী পুরুষ, সে একা এসে মানসিংহের সঙ্গে দেখা করল।

মানসিংহ বললেন, যথেষ্ট হয়েছে, এবার তোমার প্রতিহিংসা শান্ত হোক।

বেণী রায় বল্‌ল, কিন্তু এখানো যে ওদের বংশ নির্ব্বংশ হয় নি।

মানসিংহ বলিলেন, একের অপরাধে অন্যকে সাজা দেওয়া কি উচিত!

বেণী রায় বল্‌ল, ওরা সবাই এক।

মানসিংহ তার হাত ধরে' বললেন, তুমি বীর পুরুষ, এবার ক্ষান্ত দাও।

বেণী রায় নীরব। মানসিংহ বুঝলেন। তিনি বললেন, তুমি কাশী বাস কর গিয়ে, সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বেণী রায় বল্‌ল, আমার জন্য ভাবনা করি না, কিন্তু আমার সঙ্গে বহু লোক আছে, তাদের কি হবে? মানসিংহ তাদের ডেকে জমিদারী দিলেন; চলন-বিলের চারিদিকের জমিদারদের ইতিহাস এই রকমে সুরু হল। বেণী রায় তার কালীমূর্ত্তি দীঘির জলে বিসর্জ্জন দিয়ে কাশী যাত্রা করল।—সে আজ আড়াইশ বছরের আগেকার কথা!

দর্পনারায়ণ যখন থামিল, তখন রাত্রি গভীর।

সে রাত্রে বনমালার ভাল ঘুম হইল না সারারাত্রি তন্দ্রায়-জাগরণে স্বপ্নে-নিদ্রায় পাক খাইতে লাগিল। কখন বেণী রায়ের প্রতিহিংসা-প্রবণ

চক্ষু, কখন মানসিংহের বীর্য্য-উদার মুখশ্রী, কখন ডাকাতের আক্রমণ, কখন বেণী রায়ের জিঘাংসা ঘুরিয়া ফিরিয়া তার মনে জাল বুনিতে লাগিল।

বিছানায় শুইয়া থাকা যখন তার পক্ষে অসহ্য হইল, সে উঠিয়া দেখিল, পাশেই দর্পনারায়ণ নিদ্রিত; তখন বজরার জানালা ফাঁক করিয়া সে বিলের দিকে চাহিল।

কিন্তু এ-কী! এ তো দিনের বেলার নির্জ্জীব দৃশ্য নয়, এ যে জীবন্ত সত্তা! মাঠের মধ্যে ওই কিসের আলো? একটি, দুটি নয় শত শত, জোনাকী না আলেয়া? না, বেণী রায়ের দলের লোকদের প্রতিহিংসার উগ্র চক্ষু মাঠের মধ্যে আজিও বলি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে! দূরে ও কিসের শব্দ! হাজার হাজার পাখার না হাজার হাজার হাতের? মাথার উপরে আকাশ-পথে হুঃ হুঃ শব্দে কি উড়িয়া গেল? জলে কলধ্বনি জাগিয়াছে গাছে মর্ম্মর রব। দিনের বেলায় তো এ সব শোনা যায় নাই। এ যেন সেই গল্পে শোনা দৈত্যপুরী, দিনের বেলায় সেখানে কোন সাড়াশব্দ নাই, রাত্রিকালে সেস্থানে সহস্র সত্তায় সজীব। বনমালার কেমন ভয় করিতে লাগিল, সে তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া শয্যা গ্রহণ করিল।

হে রহস্যময়ী, হে তিমিরাবগুণ্ঠিতা, অন্ধকার শর্ব্বরীর নিকষ-পাষাণরচিত সিংহাসনশায়িনী, হে প্রকৃতি, হে আদিমতমা, তোমাকে চিনি না, কেমন না, কেমন করিয়া এমন কথা বলি? তোমাকে দেখিয়াছি তবু দেখি নাই —কারণ তোমার অবগুণ্ঠনখানিই দেখিয়াছি তোমার মুখ দেখিবার দুরূহ সৌভাগ্য ঘটে নাই; তোমাকে জানি এমন কথাই বা বলি কেমন করিয়া। তবু মন বলে, সংস্কার বলে, তুমি আমার আত্মীয়া, তুমি আমার আত্মার আত্মীয়া। তোমারই রক্তপ্রবাহ আমার নাড়ীতে রণিত, অনুভব করি কিন্তু বলিতে পারি না। তুমি সহস্র-রসনাময়ী তবু তুমি মূক; তুমি অযুত-দৃষ্টিশালিনী তবু তুমি অন্ধ; তুমি সহস্র-কর্ণিকা তবু তুমি বধিরা; তুমি সর্ব্বজ্ঞানময়ী তবু তুমি রহস্যাবৃতা। মানব ও তুমি সহোদর, তবু তুমি কত ভিন্ন?

জোড়াদীঘির চৌধুরী-পরিবার

বিধাতার হাতের চরম সৃষ্টি প্রকৃতি নির্দোষ, নিখুঁৎ, আদর্শ। মানব বহুদোষাপন্ন, বহু ত্রুটিসমাকীর্ণ, পদে পদে খণ্ডিত। মানুষ আপনার অগোচরে প্রকৃতান্বিত হইবার চেষ্টা করিতেছে; প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মকতা স্থাপনই মনুষ্যত্বের আদর্শ। কারণ নিঃসঙ্গ মানুষ অসম্পূর্ণ আর প্রকৃতি স্বয়ম্পূর্ণা।

৫

গ্রামের নাম বামুনডাঙ্গা; নদীর নাম কঙ্কণ; কঙ্কণ বড়ল নদীর ছোট একটি শাখা; বর্ষার সময়ে বিলের সঙ্গে একাকার হইয়া যায়; শীতকালে স্বতন্ত্র। বামুনডাঙ্গা গ্রামে কঙ্কণ নদীর তীরে সস্ত্রীক দর্পনারায়ণ আজ এক মাস বাস করিতেছে।

নৌকা ছাড়িয়া বাসা বাঁধিবার কারণ এই যে, মানুষ একাধারে স্থাবর ও জঙ্গম। নৌকায় বসিয়া ভাসিয়া যাতায়তেও এই দ্বৈধভাব আছে, কিন্তু ইহাতে দীর্ঘকাল মানুষ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না; তার মন চায় পৃথিবীর স্পর্শ। বহু যুগের অভ্যাস মাটির টানে তার মন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

এত গ্রাম থাকিতে বামুনডাঙ্গা গ্রাম বাছিয়া লইবার কারণ, গ্রামখানি চৌধুরীদের জমিদারির এলাকাভুক্ত নয়, অথচ আশে পাশ তাদের জমিদারি।

বামুনডাঙ্গা গ্রামটি ছোট; অধিকাংশই চাষী গৃহস্থের বাস; নদীর ধারে একটি দীঘি, দীঘির উঁচু পাড়ের উপরে দর্পনারায়ণের কুঠির। ইহাকে কুঠির বলাই সঙ্গত; বামুনডাঙ্গার চাষী গৃহস্থদের স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠিতে ইহা মনোরম বাসভবন, কিন্তু জোড়াদীঘির চৌধুরীদের পরিমাপে ইহা কুঠির ছাড়া কিছু নয়।

গ্রামের চারিধারে বিস্তৃত মাঠ, রবিশস্যে ভরা; কতক কাটা হইয়াছে, কতক কাটা হইতেছে, কতক এখনও ভাল করিয়া পাকে নাই।

নদীর ঘাটে বজরাখানা বাঁধা থাকে—দূর গ্রামের হাট হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিয়া আনা হয়, মাঝে মাঝে বজরা বাজার করিবার জন্য পাবনা সহরে যায়; আলিবর্দ্দি যায়; কখন কখনও দর্পনারায়ণও সঙ্গে থাকে।

সেদিন সকাল বেলা দীঘির ঘাটে বসিয়া আলিবর্দ্দি ও দর্পনারায়ণে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। দু'জনের মনেই এক চিন্তা; এক আশঙ্কা—আবার দু'জনেই তাহা নানা প্রবোধ দ্বারা ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছিল।

আলিবর্দ্দি বলিতেছিল—দাঁড়াও না দাদাবাবু, বুড়ো এলো বলে।

দর্পনারায়ণও তাই চায়, এবং বিশ্বাসও করে, কিন্তু ধরা না দিয়া বলিল—কই আর এল, তিন মাস হয়ে গেল! আসবার হলে এতদিনে আসত।

আলিবর্দ্দি বলিতেছিল—দাদাবাবু পৃথিবীটা তো ছোট নয়। আর পৃথিবীর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম চলন-বিলটাও তো নেহাত কম নয়।

দর্পনারায়ণ বলিল—তা আমরা যে চলন-বিলের দিকেই এসেছি তা তারা জানবে কি করে।

আলিবর্দ্দি উত্তর দিল—ঠিক জানবে দাদাবাবু, ঠিক জানবে। তারপরে হাসিয়া বলিল—চর-রুইমারির তহশীলদারকে আমি বলে দিয়েছিলাম, সে কি ভাবছ কাছারীতে গিয়ে সে কথা বলেনি।

দর্পনারায়ণ বিরক্তির ভাণ করিয়া বলিল কেন বলতে গেলি।

দর্পনারায়ণের ইহা বিরক্তির ভাণ মাত্র! সে মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল সত্যই যদি কর্ত্তা-দাদা তার খোঁজ না করেন। একা হইলে কথা ছিল না, কিন্তু সদ্য-বিবাহিতা স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া ভাসিয়া বেড়ানতে

না আছে সুবিধা না আছে গৌরব। আর বনমালাই বা কি ভাবিতেছে! স্ত্রীর কাছে তার আত্মসম্মান আছে তো।

পাঠক হয় ত ভাবিতেছেন, মন্দ কি! বাড়ী ফিরিবার জন্য এত তাড়া কেন? বাড়ীতে তো সবাই ফেরে, কিন্তু এমন ভাবে শীতের রোদে বজরা করিয়া ভাসিয়া বেড়াইবার সুখ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে। এমন মধুর হনিমুন-যাপন ছাড়িয়া বেরসিকের মত বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যস্ততা কিসের?

আমিও পাঠকের সঙ্গে অভিন্নমত, শুধু তাই নয়, কবিকুল পিতামহ স্বয়ং বুড়ো বাল্মীকিরও ইহাই মত ছিল; নতুবা তিনি বিবাহান্তে রাম-সনাথা সীতাকে বনে পাঠাইতেন না। রামের বনবাস হনিমুন ছাড়া আর কিছু নয়; তবে চৌদ্দ বছর কালটা আমাদের কিছু দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু ত্রেতাযুগের লোক না কি পঞ্চাশ ষাট হাজার বছর বাঁচিত; সে মাপকাঠিতে চৌদ্দ বছর অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই মনে হইবে।

কিন্তু বিপদ এই যে, দর্পনারায়ণ এ কাহিনীর পাঠক নয়, নায়ক, অর্থাৎ সে দ্রষ্টা নয়, ভোক্তা; বিশেষ করিয়া হনিমুনের রোমান্স ও ফিলজফি সম্বন্ধে একান্ত অজ্ঞ, এ রকম ক্ষেত্রে তার দৃষ্টির সঙ্গে আমাদের দৃষ্টির প্রভেদই স্বাভাবিক।

সে চিন্তিত হইয়া পড়িল, কিন্তু চিন্তা ঢাকিবার চেষ্টায় জোর করিয়া বলিল—না এল, না এল, এতদিন কাটিল, এর পরেও কাটিবে।

আলিবর্দ্দি মনে মনে হাসিল। এতদিন ও এর পরেও অনেক প্রভেদ বিশেষ দর্পনারায়ণে কণ্ঠস্বরে তেজের তেমন ঝঙ্কার ছিল না।

এই নির্ব্বাসনের জন্য বনমালা নিজকেই দায়ী করিত। সে স্বামীকে বলিত, তাকে বিবাহ না করিলে তার এমন বিপদ ঘটিত না; মনে মনে অবশ্য সে এ কথা স্বীকার করিত না—কোন স্ত্রী-ই করে না।

দর্পনারায়ণ তার ভীতিকে অমূলক বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিত;

মনে মনে অবশ্য সে এত জোর হাসিতে পারিত না—অনেকেই পারে না।

বনমালা ও দর্পনারায়ণে সাংসারিক দিক্ দিয়া কোন অসুবিধার কারণ নাই। টাকার অভাব ছিল না; প্রজারা যথেষ্ট টাকা দিয়াছে; বামুনডাঙ্গা গ্রামে আশ্রয়টিও মন্দ নয়, চাকর ও পরিবারবর্গও যথেষ্ট—সকলের উপরে আলিবর্দ্দির মত এমন বিশ্বস্ত ভক্ত ভৃত্য।

বনমালার সঙ্গিনী তারাসুন্দরীকে পাঠকের মনে থাকিতে পারে। তারা বনমালার বাপের বাড়ীর লোক; বনমালার সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ী আসিতেছিল; তারা তার দিবারাত্রির সহচরী।

তা ছাড়া দু'তিন জন ভৃত্য আছে; তারা সব কাজ করে বনমালা যত পারে করে; তারাও করে। বামুনডাঙ্গা গ্রামে আসিয়া গফুর নামে এক বুড়ো মুসলমান চাষা বনমালাদের পরিবারভুক্ত হইয়া গিয়াছে। গফুরের ইতিহাস কেহ জানে না—লোকটা এত ভাল যে; কেহ তার অতীত কাহিনী জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিত না; তার বর্ত্তমানই তার অতীতের যথেষ্ট প্রতিভূ। গফুরের থাকিবার মধ্যে একটা শিক্ষিত লোটন পায়রা; ছোট্ট পাখিটি গোফুরের পোষা; গফুর তাকে যেখানে ছাড়িয়া দিক্ না কেন, ফিরিয়া আবার তার হাতে আসিবে। বনমালা সারাদিন সেই পায়রাটি লইয়া খেলিত। শেষে পাখীটা তার এমন বশমানিল যে ছাড়িয়া দিলে ঠিক তার হাতে ফিরিয়া আসিয়া বসিত। তাই পায়রাটিকে লইয়া বনমালার অনেকটা সময় কাটিত।

৬

চৈত্র মাসের সন্ধ্যা। হাতে কাজ নাই, বনমালা একা কুটীরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছে। দর্পনারায়ণ নাই; সে ও আলিবর্দ্দি বজরাখানি লইয়া দূরবর্ত্তী পাবনা সহরে গিয়াছে। এই রকম তারা মাসে মাসে যায়; কখনো কখনো বনমালা সঙ্গে যায়, আজ যায় নাই। প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র কিনিবার জন্য পাবনা যাইবার আবশ্যক হয়, ক্ষুদ্র গ্রামে সব জিনিস পাওয়া যায় না।

বনমালা একা; তারা গৃহকাজে নিরত। বনমালার খুব গরম লাগিতেছিল—সে উঠানে পায়চারী করিতে লাগিল। একটুও বাতাস নাই, বিকাল বেলা যে-টুকু বাতাস ছিল তাহাও কমিয়া গেল—বনমালার খুব অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল।

এমন সময়ে সে দূরে আকাশের প্রান্তে তাকাইয়া দেখিল, ঈশান কোণে একখানা মেঘ উঠিয়াছে—যমের মহিষের মত কালো তার রঙ। বনমালা খুসী হইল—ভাবিল, বাতাস উঠিবে। বাতাসই উঠিল বটে, কিন্তু বনমালার প্রয়োজনের চেয়ে বেশী।

বনমালা কিছুক্ষণ নদীর দিকে তাকাইয়া ছিল, আবার যখন ঈশান কোণে ফিরিল—দেখিল, কে যেন মেঘখানাকে নীচে হইতে ঠেলিয়া উপরের দিকে তুলিয়া দিয়াছে—আকাশের অর্দ্ধেক ভাগ মেঘখানা গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, মেঘের মধ্যে টানা-পোড়েনে বিদ্যুতের রেশমী সুতার বয়ন আরম্ভ হইয়াছে; আকাশে বায়ুর লেশমাত্র নাই; গাছের একটি পাতাও নড়িতেছে না—সমস্ত প্রকৃতি চিত্রার্পিতবৎ।

কালো মেঘ আকাশখানাকে গ্রাস করিতে লাগিল—কপিল বিদ্যুৎ তলোয়ার খেলিতে আরম্ভ করিল—সাদা ডানার তরঙ্গ তুলিয়া বকের দল

গ্রামের দিকে ছুটিতেছে ; মেঘের ছায়ায় পৃথিবী কটা হইল, নদীর জল কালো হইল।

হঠাৎ একটা বিকট বিদ্যুৎ আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চিরিয়া ফেলিল সঙ্গে সঙ্গে এক মুহূর্ত্তপরে একটা শুষ্ক তীব্র অট্ট গর্জ্জনে পৃথিবীর হৃতপিণ্ড কাঁপিয়া উঠিল। বনমালা চকিত হইয়া দেখিল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ভীত হইয়া শুনিল, দূরে আকাশের প্রান্তে ঈশান কোণে বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার জলের মত একটা অস্পষ্ট অথচ ভীষণ শব্দ। ঝড় উঠিয়াছে। উৎকট কালবৈশাখী।

বননালা কুঠীরের মধ্যে আসিতে না আসিতে ঝড় আসিয়া ঘরের উপরে পড়িল। ঘরখানার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া ঝাঁকুনি দিয়া দমকা চলিয়া গেল আবার নিস্তব্ধ, যেন কিছুই হয় নাই। একটু সামলাইয়া উঠিতে না উঠিতে আর একটা দমকা, তারপর আর একটা, তারপর আবার। কাল-বৈশাখীর ঝড়ের সঙ্গে সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাতের তুলনা চলে। একটা দম-কার আক্রমণের হাত এড়াইতে না এড়াইতে আর একটা আসিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া তোলে।

ঘরের চাল মচ মচ করিতে লাগিল বেড়া নড়িতে লাগিল দরজা, জানালার খিল ও কপাট থর থর করিতে লাগিল আর ঘরের মধ্যে তারা ও বনমালা শীতে ও ভয়ে কাঁপিতে থাকিল।

একবার জানলা দিয়া বনমালা নদীর দিকে তাকাইল, আকাশে মেঘ ও বিদ্যুতে প্রলয় কাণ্ড করিতেছে, মেঘের কালো ডানা-মেলা প্রকাণ্ড গরুড়টার সঙ্গে বিদ্যুতের সহস্র-শীর্ষ নাগিণীর সে কি যুদ্ধ? পাখীটার নখে সাপটা আর্ত্ত চেষ্টা করিতেছে ; পাখীর চঞ্চুতে তার অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত ; আবার সাপটার ছোবলে অগ্নি উদ্গার হইতেছে দুইজনে বায়ুপথে কি বিষম দ্বন্দ্ব? বিদ্যুৎ চমকিতেছে, মেঘ ডাকিতেছে।

ঝড়ের বেগে নদীতীরের গাছপালা ঝটপট করিতেছে ; এক একবার

দমকা আসে—গাছগুলা ভূমিশায়ী হইয়া পড়ে; বড় আমগাছটার পল্লবজাল একদিকে উল্টিয়া যায়, শাখা-প্রশাখার শাদা রেখাগুলি শ্যাম পত্রান্তরাল ভেদ করিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠে। বাতাসের ঝাপটে আশ্রয়চ্যুত কাকের দল বাসা ছাড়িয়া বাহির হয়—ঝড়ের তাড়নে ডালের আঘাত লাগিয়া দু'চারটা মরিয়া মরিয়া পড়ে।

বৃষ্টি নামিল তড় তড় করিয়া বড় বড় ফোটা পড়ে, শব্দ শুনিলে মনে হয় যেন শিলাবৃষ্টি? বনমালা নদীর দিকে তাকাইল। ছোট্ট কঙ্কন নদীকে আর চিনিবার উপায় নাই—সে এখন চামুণ্ডার মত জাগিয়া উঠিয়াছে; জলযবনিকায় নদীর অদূর পরপার বহু দূরবর্ত্তী মনে হইতেছে; ঢেউয়ে, ফেনায়, গর্জ্জনে নদী ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ বনমালার বুকের মধ্যে ছাৎ করিয়া উঠিল। নদীর মধ্যে একখানা বজরা যেন! একবার দেখা যায়—আর একবার অন্তর্হিত হয়। দু'তিনবার চেষ্টার পরে দেখিল সত্যই একখানি বজরা। তবে কি দর্পনারায়ণেরই? কিন্তু তার বজরা তো নীল রঙের। এ বজরার রং যে লাল। বনমালা ও তারা ভাল করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিল—না বজরার রং নীল নয়, লাল।

তার ভয় গেল, কিন্তু মনে অনুকম্পার ভাব গেল না। আহা এমন সময়ে বিপদে পড়িয়াছে! দুইজনে দেখিল, বজরাখানা তীরের একটা মোটা গাছের গুড়ির সঙ্গে কাছি দিয়া বাঁধা। কিন্তু কাছি যেন আর টেকে না এক একটা দমকায় মনে হয় কাছি ছিড়িয়া নৌকা উড়াইয়া লইয়া যাইবে। তারা মনে মনে হায় হায় করিতে লাগিল।

বনমালার ভয় হইল দর্পনারায়ণের নৌকাও হয়তো এই সময়ে অন্য কোথাও এমনি বিপদে পড়িয়াছে; কিন্তু প্রত্যক্ষ বিপদের চিহ্ন পরোক্ষ বিপদে আচ্ছন্ন করিয়া ছিল।

ক্রমে ঝড়ের বেগ শান্ত হইয়া আসিল—বৃষ্টি জোরে নামিল। তারা

জানালা ছাড়িয়া প্রাঙ্গণের দিকে আসিল। দেখিল উঠানে জল দাঁড়াইয়াছে—ছিন্ন পাতায়, ভগ্ন ডালে বাড়ীটা ভরিয়া গিয়াছে।

ক্রমে বৃষ্টিও থামিল। তারা বাহিরে আসিয়া কোথায় কি ক্ষতি হইয়াছে দেখিতে লাগিল। এমন সময়ে তারা দেখিল একজন বৃদ্ধ, দেখিয়া মনে হয় এক সময়ে সে সুপুরুষ ছিল, সিক্ত বস্ত্রে খালি পায়ে উঠানের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বনমালাকে দেখিয়া বৃদ্ধ বলিল—মা আমি বড় বিপদে পড়েছি।

বনমালা বলিল—আপনি-ই কি এই বজরায় ছিলেন?

বৃদ্ধ বলিল—হা-মা।

বনমালা বলিল—আমরা জানালা দিয়ে ঝড়ের সময় বজরাখানা দেখ্‌তে পেয়েছিলাম—সেখানার তো কোন—

বৃদ্ধ তাহার কথা শেষ না হইতেই বলিল—না কোন ক্ষতি হয় নাই, তবে কাছি ছিড়ে যাওয়ায় অনেকটা দূরে গিয়ে পড়েছে; মাঝি মাল্লারা আছে, ফিরিয়ে আনতে অনেক রাত হয়ে যাবে।

বনমালা বলিল—আপনি ঘরে চলুন!

তারা বৃদ্ধকে বাহিরের ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল, একখানা শুষ্ক ধুতি ও গায়ে দিবার জন্য একখানা মোটা চাদর দিল। বৃদ্ধ ভিজা কাপড় ছাড়িয়া আরাম করিয়া বসিলে বনমালা বড় এক বাটিতে গরম দুধ লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

এতক্ষণে বৃদ্ধ বনমালাকে ভাল করিয়া দেখিবার অবকাশ পাইল; তাকে দেখিয়া মনে হইল এ রমণী সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে নয়! জিজ্ঞাসা করিল—মা তোমার বাড়ী কি এই গাঁয়েই?

বনমালা বলিল, আজ্ঞে হাঁ? বলিবার সময় হয় তো তার গলা কাঁপিয়া গিয়াছিল—কি কোন বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছিল—বৃদ্ধ বুঝিল, মেয়েটি আসল কথা চাপিয়া যাইতেছে।

বৃদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে বনমালা জিজ্ঞাসা করিল; আপনার বাড়ী কোন্ গাঁয়ে? বৃদ্ধ যেন এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না, সে বলিল, এই কাছেই কৈবর্ত্তডাঙার নাম শুনেছ মা—সেইখানে। বনমালার কেমন বিশ্বাস হইল না। সে পুনরায় প্রশ্ন করিল, যাচ্ছিলেন কোথায়? বৃদ্ধ বলিল, সামান্য জোতজমি আছে, তাই খাজনা আদায় করতে যাচ্ছিলাম। বনমালা হাসিয়া বলিল, যার এত বড় বজরা, সে কি আর সামান্য জোতদার! এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের বৃদ্ধ আর কোন উত্তর দিল না—কেবল হাসিয়া উঠিল! সে কি হাসি। ঝড়ের শেষের মেঘের ডাকের মত করুণ অশ্রুর ব্যঞ্জনায় পূর্ণ। বনমালা দুধের বাটি অগ্রসর করিয়া দিল। বৃদ্ধ দুধটুকু পান করিয়া তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আঃ বড় তৃপ্তি পেলাম মা।

৭

রাত্রি অনেক হইল তবু দর্পনারায়ণরা ফিরিল না। বনমালা বিশেষ চিন্তিত হইল না, কারণ এমন প্রায়ই হয়, পাবনা গেলে ফিরিতে পরের দিন হইয়া যায়। দর্পনারায়ণ ফিরিল না দেখিয়া বৃদ্ধ একাকী আহারে বসিল।

বৃদ্ধ আহারে বসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কই তোমাদের বাবু তো এখনো ফিরিলেন না?

আহারের স্থানে বনমালা তারা দুইজনেই উপস্থিত ছিল, তারা উত্তর করিল। বোধ হয় ঝড় বাদলের জন্য রওনা হ'তে পারেন নি, এমন মাঝে মাঝে হয়।

বৃদ্ধ বলিল—তা হলে তো বড় বিপদ হ'ল: আমি তাঁর অতিথি হলাম; কাল সকালেই ফিরতে হবে, তার সঙ্গে দেখা করে না গেলে বড় অন্যায় হবে।

বনমালা বলিল—কাল সকালেই বা ফিরবেন কেন? দু'দিন না হয় থেকেই গেলেন।

বৃদ্ধ বলিল—সে হয় না মা, একটা; কাজে বেরিয়েছি—এখানে বসে থাকলে চলে কি করে।

বনমালা হাসিয়া বলিল—কাজ তো আপনার খাজনা আদায় করা। দু'দিনে তা তামাদি হ'য়ে যাবে না। বিশেষ, আজকাল ঝড় বাদলে আপনার শরীর খারাপ হ'য়ে পড়েছে।

শরীরের উল্লেখে বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল বুড়ো বয়সে আবার শরীর! তবে চোখে আজকাল একটু কম দেখি, এই যা।

বনমালা বলিল এই বয়সে আপনি কেন খাজনা-পত্র আদায় করতে বের হন, ছেলেদের পাঠাইলেই পারেন।

—ছেলে আর কই! ছিল এক নাতি—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বৃদ্ধের যেমন কি মনে পড়িল—সে সাবধান হইয়া গেল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিয়া আহারে দ্বিগুণ ভাবে মন দিল।

সকলে কিছুক্ষণ নীরব। হঠাৎ বৃদ্ধ তাকে প্রশ্ন করিল, তোমার দাদাবাবু কি করেন?

তারা উত্তর করিল—কি আর করেন। সামান্য জোত জমি আছে তা-ই দেখা শোনা করেন।

বৃদ্ধ বলিল—তোমাদের এ গ্রামে বাস কত দিন?

তারা অসতর্ক ভাবে বলিয়া ফেলিল—অল্পদিন।

তার আগে ছিল কোথায়?

তারা প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পায় না দেখিয়া বনমালা বলিল, মুর্শিদাবাদ জেলায়।

অনেক সময় সত্য গোপনের শ্রেষ্ঠ উপায় সত্যকথা বলা।

বৃদ্ধ বলিল,—তা এ গাঁয়ে কেন আছ? ভদ্র লোক নেই এ গাঁয়ে, আমাদের গাঁয়ে চল না।

তারা জিজ্ঞাসা করিল—কোন গাঁয়ে বাড়ী আপনার?

বৃদ্ধ বলিল—রাতুলপুর।

বনমালার মনে পড়িল কিছুক্ষণ আগে তার নিবাস গ্রামের নাম বলিয়াছিল, কৈবর্ত্তডাঙ্গা। বনমামালা বুঝিল, সে সত্য গোপন করিতেছে।

তারা জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা আপনি তো ঘুরে বেড়ান—জোড়া-দীঘি কতদূর?

বৃদ্ধ চমকিয়া উঠিল!—বলিল, জোড়াদীঘি—অনেক দূর? তোমারা কি করে জানলে?

তারা হাসিয়া বলিল—বলেন কি? সেখানকার জমিদারের নাম কে না জানে?

বৃদ্ধের মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল—তা বটে!

বৃদ্ধের আহার শেষ হইল। তারা বাহিরের ঘরে তাঁর শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিল। বৃদ্ধ পরিশ্রান্ত হইয়াছিল—শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল।

শেষ রাত্রে দর্পনারায়ণ ও আলিবর্দ্দি ফিরিল। বনমালা দর্পনারায়ণকে বৃদ্ধ অতিথির কথা বলিল; তার যথোচিত সৎকার হইয়াছে শুনিয়া দর্পনারায়ণ খুসী হইল।

বনমালা বলিল—বুড়োর কথা শুনে মনে হ'ল সে নিজের আত্ম-পরিচয় গোপন করেছে।

দর্পনারায়ণ বলিল—তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ধর আমরা-ই কি আর কারো কাছে সত্য পরিচয় দিচ্ছি। দু'জনে কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে রাত্রি ভোর হইয়া হইয়া আসিল। এমন সময়ে বৃদ্ধের নিদ্রাভঙ্গ হইল সে বাহির হইয়া আসিল। দর্পনারায়ণ তাঁর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বাহিরে গেল। বনমালা খানিকটা পিছনে চলিল।

বাহিরে আসিতেই বৃদ্ধ ও দর্পনারায়ণ মুখোমুখি দেখা হইল। এক মুহূর্ত্ত দু'জনেই নীরব—বিস্ময়াহত, বৃদ্ধ দেখিল—সম্মুখে তার পৌত্র দর্পনারায়ণ; দর্পনারায়ণ দেখিল—সম্মুখেই উদয়নারায়ণ।

একমুহূর্ত্ত মাত্র। দর্পনারায়ণ কি করিবে ভাবিতেছে এমন সময় উদয়-নারায়ণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল—তবে রে হতভাগা! তুই ভবঘুরের মত ঘুরে মর্‌বি—মর্‌। এই চাষাদের মধ্যে এসে চাষাদের মত থাকবি থাক্—তা বলে আমার নাতবৌকে গরীবের মত রাখার তোর কি অধিকার?

সারারাত্রি পরিশ্রমের পরে আলিবর্দ্দির কেবল একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। সে অপ্রত্যাশিত ভাবে কর্ত্তার কণ্ঠস্বর শুনিয়া একলাফে শয্যা, গৃহ, বাড়ী ত্যাগ করিয়া মাঠের মধ্যে গিয়া এক খেজুর গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল।

৮

অলিবর্দ্দি যাহা অনুমান করিয়াছিল তাহা-ই বটে! উদয়নারায়ণ পৌত্রের অনুসন্ধান করিতে করিতে আসিয়া তার দেখা পাইয়াছে।

সে আজ দুইমাস হইল বজরা করিয়া বাহির হইয়াছে—নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়াছে, কোথাও সন্ধান পাইয়াছে, কোথাও পায় নাই; কখনো কখনো এতই নিরাশ হইয়াছে যে, ফিরিয়া যাওয়ার কথাও মনে উঠিয়াছে। কাল যদি অপ্রত্যাশিত ভাবে ঝড়টা না উঠিত—তবে/হয় তো এত শীঘ্র সাক্ষাৎ ঘটিত না।

নবদম্পতীকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিবার পরে কিছুদিন উদয়নারায়ণ পৌত্রের নাম সহ্য করিতে পারিত না। কতজন পৌত্রের জন্য ওকালতি করিতে গিয়া তাড়া খাইয়াছে, কত কত কর্ম্মচারী চাকুরী হারাইয়াছে, দ্রবময়ী তো দিবারাত্রী চোখের জলে অন্ধকার দেখিয়াছে।

শেষে কেহ আর দর্পনারায়ণের নাম বৃদ্ধের কাছে তুলিল না। উদয়নারায়ণ একাকী গুম্ হইয়া বসিয়া থাকিত। প্রথমে তার আশা ছিল দর্পনারায়ণ অনুতপ্ত হইয়া চিঠি লিখিবে—মাস গেল, দুই মাস গেল, চিঠি আসিল না। তারপর সে ভাবিত দর্পনারায়ণ ফিরিয়া আসবে—কেহ ফিরিল না। বৃদ্ধ দিবারাত্রি উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা

করিত। পাছে সে আসিয়া ফিরিয়া যায়, তাই রাত্রিতে পর্য্যন্ত দেউড়ী বন্ধ করিবার হুকুম ছিল না; শীত গেল—বসন্ত আসিল—তবু নবদম্পতী ফিরিল না।

অবশেষে বৃদ্ধের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল—সে পৌত্রের অনুসন্ধানে বাহির হইল; মুখে অবশ্য সে কথা বলিল না। উদয়নারায়ণ বলিল—সে জমিদারি পরিদর্শন করিতে যাইতেছে, গ্রামের সকলে বুঝিল পৌত্রের খোঁজে পিতামহ চলিয়াছে—তবু সকলেই মুখে বলিত—কর্ত্তা জমিদারী দেখিতে চলিয়াছেন। একদিন ফাল্গুনের প্রভাতে বজরা সাজাইয়া বৃদ্ধ জমিদারী দেখিতেই যাত্রা করিল।

বৃদ্ধ সন্ধান পাইয়াছিল দর্পনারায়ণ চলন-বিলের দিকে গিয়াছে—সেই দিকে তার বজরা চলিল। গ্রামে, গ্রামের হাটে হাটে, দুই তীরে নদীর শাখা-প্রশাখায় সন্তর্পণে সন্ধান করিয়া চলিতে তার সময় লাগিত—এই রকমে দুইমাস কাটিয়াছে। তার অনুসন্ধানের ইহাই ইতিহাস।

উদয়নারায়ণ গর্জ্জন করিয়া চলিয়াছে—হতচ্ছাড়া; ভবঘুরে তোর যেখানে খুসী যা! আমি তোর মুখ দেখতে চাইনে, তোকে বাড়ীতে ঢুকতেও দেব না; কিন্তু আমার নাতবৌকে, জোড়াদীঘির নাত-বৌকে চাষার মধ্যে চাষার মত করে রেখেছিস্! আমি আজই তাকে নিয়ে যাব! দেখি কে আটকায়।

সে নিশ্চয় জানিত কেহ তাকে বাধা দিবে না—বরঞ্চ যাইতে পারিলেই এখন সবদিক রক্ষা হয়—ইহা উদয়নারায়ণও জানে—এইভাবে কথা বলাই তার স্বভাব। এমন সময়ে আলিবর্দ্দিকে তার চোখে পড়িয়া গেল—অমনি সে পুনরায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল—ওই বেটাই সর্ব্বনাশের গোড়া, বেটা! বজ্জাত বেটা হারামজাদা! আলিবর্দ্দি বহুদিন

কর্তার বহু-পরিচিত ভৎ'সনা শোনে নাই, আজ শুনিয়া মনে ভারি স্বস্তি পাইয়া, মুখ চাপিয়া হাসিতে লাগিল।

উদয়নারায়ণ কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত নীচু করিয়া বনমালাকে উদ্দেশ্যে করিয়া বলিল—দিদি, আমি আজই তোমাকে নিয়ে রওনা হব। শীগগির তৈরি হয়ে নাও।

তারা বলিল—আজকার দিনটা সময় না পেলে কি ক'রে গুছিয়ে নেওয়া যায়!

উদয়নারায়ণ তাচ্ছিল্য ও ঠাট্টার মাঝামাঝি স্বরে বলিল—ওঃ আবার গুছিয়ে নেওয়া! কত জমিদারি এখানে আছে! আবার গুছিয়ে নেওয়া! নাও, নাও ওঠ! এখনি রওনা হ'তে হবে—এমনি অনেক দেরি হয়ে গেছে!

যাত্রার আয়োজন আরম্ভ হইল। কেহ কোন প্রকার বাঁধা দিতে ছিল না, দিবার কল্পনাও করিতেছিল না, কিন্তু বৃদ্ধ সকলের কথায়, মুখের ভাবে বাঁধা দেখিয়া যেন ক্ষেপিয়া উঠিতে লাগিল। আসল কথা বৃদ্ধ একটা বাঁধা জয় করিতে চাহে—যে-বাঁধা বাস্তবে নাই—তাহা যে কল্পনায় সৃষ্টি করিয়া জয় করিবার অনুমান করিতেছিল।

বজরা দুইখানি সজ্জিত হইল; যাত্রার জন্য সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিল এমন সময়ে খবর পাইয়া গফুর লোটন পায়রাটি লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

বনমালা বলিল—গফুর তুই আমাদের সঙ্গে চল।

গফুর বলিল—আমার কি কোথাও যাওয়ার উপায় আছে? আমি যে পাহারা দিয়ে আছি।

বনমালা বিস্মিত হইয়া বলিল—পাহারা আবার কা'কে দিচ্ছিস?

গফুর—দেখনি! ওঃ দেখবে কি করে'? তোমরা দেখ দিনের বেলা—মনে হয় এটা একটা বিল! রাতের বেলা যদি দেখতে?

বনমালা—রাতের বেলা আবার কি দেখব?

গফুর—দেখবে—একটা ডাইনি, উল্কামুখী ডাইনি মাঠের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বনমালা ভীত হইয়া বলিল—বলিস কি রে?

গফুর বলিল, বলব আবার কি? হয় ও আমাকে নেবে, নয় আমি ওকে নেব। ও নিয়েছে আমার বউ, ছেলে, মেয়ে সব। আর আমি নিয়েছি—দেখনি আমার ক্ষেত খামার! হাঃ হাঃ...খানিকটা হাসিয়া লইয়া আবার সে বলিতে লাগিল, তোমরা ভাব আমি চাষ করি, ফসলের দরকার! আমার একটা পেট, ফসলে আমার কি দরকার! ভিক্ষা করলেই তো চলে! তা নয়, তা নয়; আমি লাঙ্গল দিয়ে বিলকে বশ করছি! একবার যেখানে লাঙ্গলের আঁচড় পড়ে সে জায়গা থেকে ও ডাইনি চিরকালের মত পালায়, সে জায়গায় আর কক্ষনো ঢুকতে পারে না!—এই পর্য্যন্ত বলিয়া একটু থামিয়া আবার সে আরম্ভ করিল—দেখনি রাতের বেলায় সারামাঠ ওই উল্কামুখী ডাইনি ঘুরে বেড়ায় কিন্তু আমার ক্ষেতে আসতে পারে না। আমি যতদিন বাঁচব, কেবলি লাঙল দিয়ে যাব—ফসলে আমার কোন্ দরকার! বুঝলে না মা?

বনমালা বুঝিল কি না জানি না—বুঝিল বলিয়া বোধ হইল না। গফুর বলিল—আমি যেতে পারলাম না মা। তুমি এই পায়রাটা নিয়ে যাও। পাখীটা আমার বড় ভালবাসার ছিল—যখনই এটার কথা মনে হবে—তখনি তোমাকে মনে পড়বে! এই বলিয়া সে পাখীটি বনমালার হাতে দিল। পায়রা বনমালার পোষ মানিয়াছিল—সে-টা তার হাতে গিয়া বসিল।

তখন গফুর তার গ্রাম্যস্বরে গ্রাম্য ভাষায় অবোধ্য এক গান গাহিতে গাহিতে লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বিলের দিকে রওনা হইয়া কিছুক্ষণের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। সেদিন মধ্যাহ্নে আহারাদির পরে বনমালা, দর্পনারায়ণ আলিবর্দ্দি ও তারা উদয়নারায়ণের সঙ্গে বামুনডাঙ্গা ত্যাগ করিয়া জোড়াদীঘি যাত্রা করিল।

জোড়াদীঘি বনাম রক্তদহ

১

'সংসারে সুখ সুলভ না হইলেও দুর্লভ নয়, দুঃখ তো পদে পদে, কিন্তু আনন্দ! অন্তত সংসারের বর্ত্তমানের গণ্ডীর মধ্যে তার সন্ধান মেলে না; কিন্তু পশ্চাতে ফিরিয়া তাকাইলে অতীতের কুহেলিকার ধূসরতার মধ্যে আনন্দ একেবারে দুর্লভ নয়! শুধু তাই নহে, আনন্দের প্রকৃতি অদ্ভুত, যেখানে তাকে কখনো আশা করা যায় না, হঠাৎ সেখানেই সে দেখা দেয়। আজ যাকে দুঃখ বলিয়া মনে করিতেছ, কিছুদিন পরে ফিরিয়া তাকাইও, দেখিবে তার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সে আর দুঃখ নয়, সে যেন আনন্দের মতই। আজ যাহা অশ্রু কাল তাতে মুক্তাকণার উজ্জ্বলতা! আজ যাহা দুঃখের দীর্ঘনিঃশ্বাস, কাল তাহা দূরাগত বসন্তের দক্ষিণ সমীরণ। তাই বলিতেছিলাম, আনন্দের প্রকৃতি অদ্ভুত, তাহা সুখও নয়, দুঃখও নয়, তাহা সুখ-দুঃখের রোমন্থন—তাহা স্মৃতি-সাগর। দুঃখের স্মৃতি আর দুঃখদায়ক নয়, সুখেরও স্মৃতিও সুখ নয়, তা আনন্দ। স্মৃতির স্বাতি নক্ষত্রের প্রভাবে দুঃখের অশ্রুবিন্দু মুক্তাফলের অনবদ্যতা লাভ করে।'

ইন্দ্রাণী জীবনে কখনো সুখ পায় নাই, নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে সে পথে চলিতেছিল; পিতৃহীন জীবনের দুঃখ, দর্পনারায়ণের সঙ্গে বিবাহ-বিভ্রাটের দুঃখ, পরন্তপের সঙ্গে ঘটনাচক্রের বিবাহের দুঃখ—একটার পরে আর একটা। আজ বিবাহের পরে এই দুঃখের শোভা-যাত্রার যখন ছেদ পড়িল সে একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইল। কিন্তু এ কি! সে বিস্মিত হইয়া গেল! দুঃখের সে তীব্রতা গেল কোথায়! আর্ত্ত

হাহাকারে সে বুক-ফাটা করুণধ্বনি তো আর তেমন মর্মন্তুদ নয়। তার মনে হইল, স্মৃতির মণিকোঠায় কে যেন একজন বসিয়া আছেন, যিনি সুখ-দুঃখের পরিম্লান স্মৃতিকে সযত্নে ধৌত করিয়া আনন্দের ভাস্বরতা দান করিতেছেন, তাঁর নিপুণ কৌশলে সুখ ও দুঃখের শোভাযাত্রা হইয়া উঠিতেছে? সীতা দেবী যেদিন দোহদবিশ্রামক্ষণে অরণ্যকাণ্ডের দুঃখের ঘটনাগুলিকে চিত্ররূপে দেখিয়াছিলেন—সেদিন কি তিনি অবিমিশ্র দুঃখই পাইয়াছিলেন? তাঁর সেদিনকার ভীতিবিহ্বলতার মধ্যে দুঃখ ছাড়াও আর একটি ভাব ছিল—তাহা আনন্দ! দুঃখের স্মৃতি যদি দুঃখের মতই বিভীষণ হইত, তবে মানুষ বাঁচিত না। মানুষের দুই চক্ষুর একটি অতীতে নিবদ্ধ, যেখানে আনন্দ, অপরটি ভবিষ্যতে নিবদ্ধ, যেখানে আশা; বর্ত্তমানটা মানুষে অন্ধভাবে হাতড়াইয়া চলে, যাকে সুখ মনে করে, যাহা দুঃখ, যাকে দুঃখ মনে করে, তাহা দুঃখ নয়।

ইন্দ্রাণী বিস্মিত হইয়া ভাবিল—এ কি! পিতৃমাতৃহীনতা তেমন দুঃখদায়ক কই। দর্পনারণের আপমানের প্রান্তেও আনন্দের ভাস্বরতার একটা আভাস। ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া দেখিল, সেখানের দিক্‌মণ্ডল মুক্তার রসে ভিজিয়া স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে—আশার নক্ষত্রোদয়ের পূর্ব্বরাগে। ইন্দ্রাণী জীবনকে গভীর ভাবে বুঝিতে পারিতেছে; জীবনকে বুঝিবার কোন বাঁধা নাই; দুঃখের অভিজ্ঞতার চাপ যাহার উপর পড়ে, সে জীবনকে তত বেশী বোঝে, তত শীঘ্র বোঝে, মৃৎস্তরের চাপ যেখানে লঘু সেখানে আদিম অরণ্যের ধ্বংসাবশেষ কয়লারূপেই থাকে, যেখানে প্রবল—সেখানে বনস্পতিস্তূপ হীরক হইয়া উঠে।

উর্ণনাভ জাল পাতিয়া নিঃশব্দ সতর্কতার মাঝখানে অপেক্ষা করিয়া থাকে; হতভাগ্য শিকার জালে পড়িলে সে, নীরব সন্তোষে দেখে, তখনই তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে না; শিকার ক্রমে জালে জড়াইতে থাকে, উর্ণনাভ কেবল দেখিয়া যায়, তারপরে এক সময়ে ক্লান্ত শিকারের উপর গিয়া পড়িয়া তাকে আত্মসাৎ করে। চাঁপা ঠাকুরাণী সেই উর্ণনাভ—ইন্দ্রাণীর অদৃষ্টকে লইয়া সে

জাল বুনিয়া তুলিয়াছিল—ইন্দ্রাণী তাতে শিকার; সে দেখিয়া পরম প্রীত হইল—তার ফাঁদে ইন্দ্রাণী ও পরন্তপ উভয়েই আত্মসমর্পণ করিয়াছে। সে বুঝিল, এখনো শিকারের উপরে পড়িবার সময় হয় নাই, তবে সময় আসন্ন—সে দিন গুণিতেছে।

পরন্তপ ইন্দ্রাণীকে বিবাহ করিয়া প্রতিশোধের পথে প্রথম দুরূহ বাঁধাটা অতিক্রম করিয়াছে। ইহাতেই তার আনন্দ, ইন্দ্রাণীকে সে বোঝে না—বুঝিতে চেষ্টাও করে না। বোধ করি তাকে বুঝিবার শক্তিও তার নাই। তবে বাহিরের দিক হইতে সে ভালই আছে। ইন্দ্রাণীকে বিবাহ করিয়া তার দারিদ্র্য দূর হইয়াছে; এখন সে ধনী জমিদার; দেশে যা-কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া যাহা পাইল সংগ্রহ করিল; পরন্তপ রায় এখন আর তেমাথার ঋণী জমিদার নয় রক্তদহের মালিক, ধনী জমিদার।

ইন্দ্রাণী ও পরন্তপ, দর্পনারায়ণের প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষা করিতে লাগিল; চাঁপাও অপেক্ষা করিতে লাগিল—কোন ব্যক্তির নয়—শিকারের লগ্নের, শিকার লগ্ন পাকা শিকারী-ই জানে; অন্যের পক্ষে তাহা বোঝা সম্ভব নয়।

২

একদিন জোড়াদীঘির লোকে দেখিল দুইখানা বড় বজরা গ্রামের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। কর্ত্তা নামিল, দর্পনারায়ণ নামিল, আলিবর্দ্দি নামিল; চৌধুরী বাড়ী হইতে পাল্কী আসিল—সবশেষে নূতন বধূ পাল্কীতে করিয়া নামিল। চৌধুরী-বাড়ী অনেকদিন পরে কর্ত্তার হাঁকডাকে ও অট্ট-হাসিতে মুখর হইয়া উঠিল।

প্রথম কিছুক্ষণ আলাপ-পরিচয়ের পালাতে কাটিল। আত্মীয় স্বজনেরা আসিল—গ্রামের ভদ্রলোকেরা আসিল—চাকর-বাকর, পাইক-বরকন্দাজ, আমলা, গোমস্তার দল আসিল। সকলে একবাক্যে দর্পনারায়ণকে জানাইয়া

দিল, এতদিন তারা তার অভাবে বিনিদ্র হইয়া কালযাপন করিতেছিল, এতক্ষণে কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিতেছে।

ইন্দ্রাণীর জন্য যে নূতন মহল তৈরী হইয়াছিল, এতদিন তাহা শূন্য পড়িয়াছিল—বনমালা তাহা পূর্ণ করিয়া বসিল। সে সব ঘর নূতন করিয়া চুণকাম করা হইল—সেখানে নূতন দাস-দাসী নিযুক্ত হইল—আর তেতলার প্রশস্ত কক্ষে মকরমুখো হাতীর দাঁতের কাজ করা পালঙ্কে বনমালার প্রতিষ্ঠা হইল। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব যে বনমালাকে দেখিল, তার ব্যবহারে ও রূপে মুগ্ধ হইল। সকলেই বলিল—হাঁ চৌধুরী-বাড়ীর যোগ্য বউ বটে। উদয়নারায়ণ ইন্দ্রাণীকে বলিতেন, রক্তদেহের রক্তকমল, এখন বনমালার নাম দিলেন—ভাগীরথীর শ্বেতপদ্ম।

সত্য কথা বলিতে কি, ইন্দ্রাণী এ বাড়ীতে বধূরূপে আসিলে সকলে এমন খুসী হইত না, কারণ তার রূপ এমন সর্ব্ববাদীসম্মত নয়; সে-রূপ বিরাট সৌন্দর্য্যময়, তাহা প্রাকৃতজনের চোখে হঠাৎ ধরা পড়ে না তাহা দেখিতে হইলে অভ্যস্ত চক্ষু আবশ্যক! বনমালার রূপ মুগ্ধসৌন্দর্য্যময়, তাহা একান্ত ভাবে লৌকিক—দেখিবামাত্র ভাল লাগে।

উদয়নারায়ণ অকদিন পরে বৈঠকখানায় বসিলেন, দেওয়ানজীর ডাক পড়িল। দেওয়ানজী আসিলে উদয়নারণ বলিলেন, বুঝলে হে, তোমরা ভাবছ আমি গিয়ে দর্পনারায়ণকে সেধে নিয়ে এসেছি—একথা মোটেই সত্যি নয়। এই বলিয়া তিনি দেওয়ানের মুখের দিকে তাকাইয়া তার মনের ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

দেওয়ানজী সবই বুঝিতে পারে, কাজেই বলিল—আজ্ঞে এ কথা আর যেই বিশ্বাস করুক, আমি তো বিশ্বাস করি না।

উদয়নারায়ণের তবু যেন সন্দেহ গেল না, জিজ্ঞাসা করিলেন—তবে কি বিশ্বাস কর ?

দেওয়ানজী দ্বিধামাত্র না করিয়া বলিল—দাদাবাবু আপনার কাছে কেঁদে পড়েছিলেন।

উদয়নারায়ণ ঋজু হইয়া বসিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন—নাঃ তোমার বুদ্ধি আছে। তুমি ঠিক ধরেছ।' কিন্তু বোধ হয় সবাই এ কথা বিশ্বাস করে না; তাদের ধারণা আমিই গিয়ে ওদের সেধে এনেছি।

আসল কথা উদয়নারায়ণের বিশ্বাস সকলেই ব্যাপারখান বুঝিয়াছে, কাজেই তিনি প্রত্যেকের মুখেই নিজেই দুর্ব্বলতার ইতিহাসের চিহ্ন যেন দেখিতে পাইতেছেন।

উদনারায়ণ স্বর নীচু করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ও কি বলে বেড়ায় —বলেছে আমি গিয়ে নিয়ে এসেছি।

দেওয়ানজী কথাটা একেবারে উঠাইয়া দিয়া বলিলেন—আরে রাম! এমন কথা বলবেন দাদাবাবু।

উদয়নারায়ণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—যাক্ তবু ধর্ম্ম আছে। তারপর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, রামজয় (দেওয়ানের নাম রাম-জয় লাহিড়ী, কর্ত্তা যখন মন খুলিয়া তার তার সঙ্গে কথা বলেন তখন নাম ধরিয়া ডাকেন) আমি তো বুড়ো হয়ে পড়েছি—

কথাটা কি ভাবে লইতে হইবে বুঝিতে না পারিয়া দেওয়ানজী কোন কথা বলেন না—

কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বল রামজয়? রামজয় সত্যটাকে যত-দূর সম্ভব হাল্কা করিয়া বলিলেন—তা হ'ল বই কি?

কর্ত্তা বলিলেন—তবেই দেখ। আজ একটা পরামর্শ করিবার জন্য তোমায় ডেকেছি। এই বলিয়া তিনি দেওয়ানজীর কাছে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। দুইজনে অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা হইল এবং দুই-জনের মুখ দেখিয়া মনে হইল আলোচ্য বিষয়ে উভয়ে একমত।

সেদিন বিকালে চৌধুরী-বাড়ীর লোক টোলে গিয়া ভট্টাচার্য্যকে

জানাইল, কর্ত্তা তাকে ডাকিয়াছেন। ভট্টাচার্য্যের দ্বিপ্রহরিক নিদ্রা সবে ভাঙ্গিয়াছে, কাজেই তিনি নিজে না গিয়া ডাকিলেন—বাণীবিজয় ও বাণী, আছ না কি ?

বাণীবিজয় পাশের ঘরেই ছিল। সে অবশ্য কথা মিথ্যা বলে না, তাই বলিয়া সত্য গোপন করিতে বাঁধা নাই। সে যতক্ষণ পারিল চুপ করিয়া থাকিল, কিন্তু যখন বুঝিল এবার উত্তর না দিলে ভট্টাচার্য্য স্বয়ং আসিবেন, তখন সে বলিল—আজ্ঞে, এইখানেই আছি।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—বটে, এত মনঃসংযোগ করে কি করছ ?

বাণীবিজয় বলিল—আজ্ঞে কালিদাস কৃত কুমারসম্ভব চর্চ্চা করছিলাম—

ভট্টাচার্য্য—চিরদিন কুমারসম্ভবই করলে—'রঘু'খানা দেখলে না—

বাণীবিজয় উত্তর করিল—আজ্ঞে অগ্রে কুমার তৎপর তো বংশ।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—সে কথা ঠিক।

কিন্তু বাণীবিজয় যে-অর্থে বলিল—ভট্টাচার্য্য সে অর্থ ধরিতে পারিলেন না। পারিবার কথাও নয়' কারণ ভট্টাচার্য্য জানিতেন না যে, বাণী-বিজয়ের ঘরে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত পুঁটি নাম্নী গোপ-যুবতী অবস্থান করিতেছিল।

বাণীবিজয় ভট্টাচার্য্যের কাছে আসিলে ভট্টাচার্য্য বলিলেন—বাণী, চৌধুরী-কর্ত্তা ডেকে পাঠিয়েছেন—একবার গিয়ে শুনে এস তো ব্যাপার কি।

বাণীবিজয় চৌধুরী-কর্ত্তাকে মনে মনে ভয় করে, বিশেষ দর্পনারায়ণের বিবাহে পৌরোহিত্য করিবার পরে সে আর চৌধুরীদের দেউড়ি পার হয় নাই—কাজেই মনে মনে বিতর্ক করিয়া বলিল—আজ্ঞে যেখানে মহা-শয়ের আহ্বান সেখানে কি আমার—

ভট্টাচার্য্য দেখিলেন, অকালে তাঁহার আলস্য ভঙ্গ হয়, কাজেই বলি-লেন—শিষ্য গুরুর প্রতিহস্তক, যাও তুমি গেলেই কাজ হবে।

গত্যন্তর নাই দেখিয়া বাণীবিজয় চৌধুরী-বাড়ী রওনা হইল।

চৌধুরী-কর্ত্তা তখন সুবৃহৎ আলবোলায় ধূমপান করিতেছিলেন, বাণী-বিজয় সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইল। কর্ত্তা বলিলেন—এই যে বাণী, ব'স ব'স; তার পরে ভট্টাচার্য্য কই? বাণীবিজয় ভট্টাচার্য্যের অনুপস্থিতির একটা কারণ বলিল।

কর্ত্তা বলিলেন—সে না হ'লে হবে না। তুমিও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু সে হচ্ছে বয়োবৃদ্ধ, তাকে চাই। তুমি যাও গিয়ে তাকে নিয়ে এস। অবশ্য, তুমিও সঙ্গে এস।

বাণীবিজয় পুনরায় একটি প্রণাম করিয়া ভট্টাচার্য্যকে আনিতে টোলে রওনা হইল।

সন্ধ্যাবেলা ভট্টাচার্য্য আসিলে বৈঠকখানায় মন্ত্রনা-সভা বসিল। ফরাসের উপরে গালিচায় চৌধুরী-কর্ত্তা—গালিচা হইতে একটু দূবে দেওয়ানজী ও ভট্টাচার্য্য—ভট্টাচার্য্যের পশ্চাতে যতদূর সম্ভব আত্মগোপন করিয়া বাণী-বিজয় আসীন।

চৌধুরী-কর্ত্তা বলিলেন—কি বল ভট্টাচার্য্য আমার তো বয়স হ'ল।

ভট্টাচার্য্য কর্ত্তার বযস হইবার অনিবার্য্য অপরাধটা দুরন্ত কালের উপর চাপাইয়া বলিলেন—তা তো হলই, কারণ কালস্য কুটিলা গতি—

কর্ত্তা বার্দ্ধক্যের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা পাইয়া খানিকটা যেন নিশ্চিন্ত হইলেন; বলিলেন—তবেই দেখ, এ বয়সে কি আর আমার জমিদারী দেখা সম্ভব, না উচিত?

সকলে নীরবে এই যুক্তির সত্যতা যেন স্বীকার করিল।

কর্ত্তা আবার আরম্ভ করিলেন—বুঝলে ভট্টাচার্য্য, দেওয়ানজী বলছিল, এখন দর্পনারায়ণকে সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিলেই ভাল হয়।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—এর চেয়ে আর উত্তম প্রস্তাব কি হতে পারে—

কর্ত্তা বলিলেন—তা হ'লে তোমার আপত্তি নেই? আমি ভাবছিলাম কি জান—বিষয়-সম্পত্তি, জমিদারী যা আছে, ওর নামে এখন সব করে

দেব, নিজের ঘাড়ে জোয়াল না নিলে কি দায়িত্ব-জ্ঞান আসে? কি বল ভট্টাচার্য্য?

ভট্টাচার্য্য আর কি বলিবেন—কর্ত্তার উপর কথা বলিবার সাহস কারও নাই।

—তাই বলছিলাম কি জান—কর্ত্তা আবার সুরু করিলেন, একটা ভাল দিন দেখে দেবতা গুরু-পুরোহিত স্মরণ করে শুভ কাজটা আরম্ভ করা যাক্।

কর্ত্তা থামিলে ভট্টাচার্য্য বলিলেন—এ তো আপনার ন্যায় কথাই বটে! এত বড় একটা কাজ দেব-দ্বিজকে সন্তুষ্ট না করে আরম্ভ করা উচিত নয়।

কর্ত্তা বলিলেন—এ দিকের সব কাজ দেওয়ানজী ঠিক করবে। প্রজাদের খবর দেওয়া—নূতন করে নামজারী করা সে জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি এক কাজ কর; একটা ভাল দিন দেখে দাও খুব শীগ্‌গীর। আর এই উপলক্ষ্যে পূজার জন্যে কি কি উপকরণ তোমার চাই, ধুতি, শাড়ী তৈজসাদি—তার একটা ফর্দ্দ তৈরি করে ফেল।

ভট্টাচার্য্যের আজ সুপ্রভাত বটে! একেবারে অসম্ভব রকম কিছু নয়, তবে বছরের এ সময়টায় অপ্রত্যাশিত বটে। প্রত্যেক বছর পূজার সময় চৌধুরী-বাড়ী হইতে ধুতি, শাড়ি তৈজসাদি, ঘৃত, তণ্ডুল যাহা সে পায়, তাতে তার সারা বছরের খরচ চলিয়া যায়। কিংবা ব্যাপারটাকে অন্য ভাবে বলা চলে, আর বলিলেই বোধ হয় যথার্থ হয়; সারা-বছরের তার যাহা সাংসারিক প্রয়োজন, সেই অনুসারে সে পূজোপকরণের ফর্দ্দ করিয়া দেয়। কিন্তু বর্ত্তমান উপলক্ষ্য নূতন—কাজেই ইহার আয়টাও একেবারে উপরি পাওনা।

ভট্টাচার্য্য তখনি একটা মন গড়া ফর্দ্দ দিতে প্রস্তুত হইতেছিল, কিন্তু পিছন হইতে বাণীবিজয় বাধা দিয়া মৃদু-স্বরে বলিল, মহাশয়, এ রকম বৃহৎ ব্যাপারে

বস্ত্রাদি সম্বন্ধে হঠাৎ কিছু বলা ভাল নয়, পণ্ডিতদেরও ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে। ভট্টাচার্য্য বাণীবিজয়ের ইঙ্গিত বুঝিয়া কর্ত্তাকে বলিল, কর্ত্তা আমার এই ছাত্রটি বেশ শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে উঠেছে। (শাস্ত্রজ্ঞ অপেক্ষা বস্ত্রজ্ঞ বলিলেই সত্য বলা হইত)।

কর্ত্তা স্মিতহাস্য করিয়া বলিলেন, সে আমি দেখেছি। বাণীবিজয় বেশ লায়েক হ'য়ে উঠেছে। দেওয়ানজী, বাণীবিজয়ের বিদায়ের ব্যবস্থা যেন উপযুক্তরূপে করা হয়।

কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, বাণীবিজয়ের মনোভাব ভট্টাচার্য্য খানিকটা বুঝিলেও সম্পূর্ণ বুঝিতে পারেন নাই। কয়দিন হইতে তার মনে বড় অশান্তি চলিতেছে; শ্রীমতি পুঁটি তাকে একখানা পাটের শাড়ীর জন্য মাসাধিক কাল হইতে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে; বাণীবিজয় দিব-দিতেছি করিয়া অনেক দিন কাটাইয়াছে, কিন্তু তার বদান্যতার উপরে পুঁটির বিশ্বাস ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে—সে বাণীবিজয়ের কাছে আসা ও তার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। আজ বিকালে যখন সে কুমারসম্ভব আলোচনা করিতেছি বলিয়াছিল, তখন সে একেবারে মিথ্যা কথা বলে নাই। বল্কল বসনে উমাকে কেমন মানাইয়াছিল, সেই নজীর দেখাইয়া সে পট্ট-বসনলুব্ধা পুঁটিকে ধৈর্য্য ধারণ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছিল।

এখন হঠাৎ এই সুযোগে সে হাতে যেন স্বর্গ পাইল—(বাণীবিজয়ের স্বর্গ মানে পুঁটি)। কিন্তু পাছে ভট্টাচার্যের অজ্ঞতাজাত অনবধানতায় এমন পট্ট-সুযোগ ফস্কাইয়া যায়, তাই সে তাড়াতাড়ি ভট্টাচার্য্যকে হঠ-কারিতা করিতে নিষেধ করিল।

কর্ত্তা বলিলেন—সে কথা ঠিক—হঠাৎ কিছু করা উচিৎ নয়, ভট্টাচার্য্য; বিশেষ এত ত্বরাও নেই তুমি যাও, ভেবে-চিন্তে পাঁজি-পুঁথি ঘেঁটে আমাকে দু'চার দিন পরে জানিও। তখন ভট্টাচার্য্য ও তার লায়েক ছাত্র কর্ত্তার নিকট হইতে বিদায় লইলে সেদিনকার মত মন্ত্রণাসভা ভঙ্গ হইল।

৩

একদিন সকাল বেলা ইন্দ্রাণী শুনিতে পাইল দর্পনারায়ণ সস্ত্রীক জোড়াদীঘিতে ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রথমে খবরটা সে বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু ক্রমে নানা লোকের মুখে একই সংবাদ শুনিয়া শুনিয়া আর অবিশ্বাসের স্থান রহিল না। দর্পনারায়ণ যে শুধু ফিরিয়া আসিয়াছে তা নহে—স্বয়ং চৌধুরী-কর্ত্তা গিয়া অনুরোধ করিয়া তাদের ফিরাইয়া আনিয়াছেন; লোকের মুখে সে শুনিল, পৌত্র-বধুর মুখ দেখিয়া তিনি পৌত্রের অপরাধ ও ইন্দ্রাণীর কথা ভুলিয়াছেন।

সমস্ত ঘটনা শুনিয়া ইন্দ্রাণী অধর দংশন করিয়া তেতালার ঘরে গিয়া আশ্রয় লইল।

বিধাতা পুরুষ রসিক বটেন! মানুষে দুঃখের কথা প্রায় যখন ভুলিয়াছে, তখন হঠাৎ তিনি অতি তুচ্ছ একটি ঘটনার দ্বারা বিস্মৃত দুঃখকে স্মরণ করাইয়া দেন; শান্তি তো দূরের কথা, স্বস্তি দিতে তাঁর একান্ত অনিচ্ছা।

ক্ষণকালিক বিস্মৃতির পরে দ্বিগুণ তীব্রভাবে দর্পনারায়ণের কথা ইন্দ্রাণীকে ব্যথিত করিয়া তুলিল—সে কাজ-কর্ম্ম ফেলিয়া একাকী বসিয়া জীবন সমুদ্রে বারংবার চিন্তা-জাল নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং প্রতিবারই রত্নের পরিবর্ত্তে বীভৎস সব জল-জন্তু, ভগ্ন তরণীর হাল, নঙ্গর উঠিতে লাগিল। রত্নাকর নাম কেবলমাত্র আংশিক ভাবে সত্য।

ইন্দ্রাণী বনমালার কথা ভাবিতে লাগিল। দর্পনারায়ণের উপর তার যে রাগ ছিল, তার অনেকখানিই বনমালার উপরে পড়িল। ইন্দ্রাণী ভাবিতে লাগিল, বনমালা দেখিতে কেমন? সে কি এতই সুন্দরী, ইন্দ্রাণীর অপেক্ষাও, যে দর্পনারায়ণকে অনায়াসে আকর্ষণ করিয়া লইল।

সে একবার চাঁপাকে গল্পচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, বনমালাকে দেখিতে কেমন। চাঁপা বলিয়াছিল যে, সে তাকে দেখে নাই সত্য, তবে লোকমুখে শুনিয়াছে, সে সুন্দরী বটে। চাঁপা কিছু দেখেও নাই. শোনেও নাই;

ইন্দ্রাণীর গর্ব্বে আঘাত করিবার জন্যই বানাইয়া কথাটা বলিল। বনমালা সুন্দরী শুনিয়া ইন্দ্রাণীর যে পরিমাণে দুঃখ হইবার কথা, বিস্ময়ের বিষয় ততখানি দুঃখ তার হইল না।

সে আর একবার বেঙাকে জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ রে বেঙা, জোড়াদীঘির নাত-বৌ না কি খুব সুন্দরী?

বেঙা বলিল—কি যে বল মা-ঠাকুরুণ! কচুবনের কালোমাণিকের রাধা আবার সুন্দরী। এমন কালো-বউ জমিদারের ঘরে কখনো আসে নি।

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করিল—তুই দেখেছিস না কি?

বেঙা যে কখনো তাকে দেখেছে, তা সে জানিত না। তাই সে বলিল—সত্যি বল্‌তে কি মা-ঠাকরুণ, আমি কখনো পেত্নী দেখি নি, তাই বলে তা কি রকম তা জানি না—এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

ইন্দ্রাণীও হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল। বেঙা ইন্দ্রাণীকে খুসী করিবার জন্যই বনমালার কুরূপের কথা বানাইয়া বলিয়াছিল। ইন্দ্রাণীও যেন প্রথমটা খুসিই হইয়াছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তার অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। বনমালা সুন্দরী শুনিয়া তার দুঃখ হয় নাই। কিন্তু কুৎসিত, কুরূপ, রূপহীনার দ্বারাই তার পরাজয় ঘটিল! নিজের চোখের জলে ইন্দ্রাণী ডুবিয়া হাঁসফাঁস করিতে লাগিল। অশ্রুজলের গোষ্পদই মানুষের ডুবিয়া মরিবার পক্ষে যথেষ্ট। রাত্রে ইন্দ্রাণীর ঘুম হইল না, সে ছটফট করিয়া মরিতে লাগিল।

সেদিন রাত্রে কল্পনায় যদি বনমালার কক্ষে উপস্থিত হইতে পারিতাম, তবে দেখিতাম, মকরমুখো হাতীর দাঁতের কাজ-করা পালঙ্কের উপরে আর একটি সুন্দরী-রমণী বিনিদ্র রাত্রে এপাশ ওপাশ করিয়া কাটাইতেছে। ইন্দ্রাণী বিজিত, বনমালা বিজয়ী; কিন্তু মানসিক অবস্থা উভয়েরই সমান।

বনমালার অশান্তি কিসের! সপত্নী সিংহাসনে সে সগৌরবে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, কিন্তু তার মনে হইতেছে, এই কক্ষ, এই পালঙ্ক, এই অলঙ্কার,

এই আসবাব, এই বাড়ী-ঘর, দাস-দাসী, আত্মীয়-পরিজন সকলেই যেন তাকে অনধিকার প্রবেশের জন্য নীরবে ধিকার দিতেছে। জড়, জীব সকলেই! সে কল্পনায় পৌরাণিক বত্রিশসিংহাসনের আলাপ-আলোচনা পালঙ্কের কণ্ঠে যেন শুনিতে পাইল।

সে রাত্রে ইন্দ্রাণীর রূপ ভাবিতে ভাবিতে বনমালা, ও বনমালার রূপ ভাবিতে ভাবিতে ইন্দ্রাণী ঘুমাইয়া পড়িল।

বনমালা স্বপ্ন দেখিল—লক্ষ তারা, রোমাঞ্চিত অনন্ত রহস্যময়ী বিরাট রাত্রির—সে কালো আকাশের কৃষ্ণ-নিকষ নির্ম্মিত সিংহাসনে পরম মহিমায় রাজ্ঞীর মত সমাসীন!

ইন্দ্রাণী স্বপ্ন দেখিল—পূর্ণিমার আলোয় পরিধৌত তারালুপ্ত মুগ্ধ রাত্রির দিগ্বধূগণ রাশি রাশি বেল-কুন্দ নিশিগন্ধা বর্ষণ করিয়া পৃথিবী শুভ্র করিয়া তুলিয়াছে।

সত্যই ইন্দ্রাণীর রূপ নক্ষত্রনীরব, মহিমাময়, রহস্যময় রাত্রির; আর বনমালার রূপ জ্যোৎস্নাধবল মুগ্ধ পৃথিবীর; একটি অলৌকিক, আর একটি একান্তভাবে লৌকিক। বনমালা ঘরের আর ইন্দ্রাণী পৃথিবীর; ইন্দ্রাণী অনায়াসে যে কোন রাজাধিরাজের বামপার্শ্বে সগৌরবে গিয়া বসিতে পারে। বিধাতা মাঝে মাঝে ভুল করিয়া রাজ্য স্থির না করিয়া রাজ্ঞী গড়িয়া থাকেন, ইন্দ্রাণী সেই রাজ্যহীন রাজ্ঞীদের অন্যতমা। রক্তদহে, জোড়াদীঘি কোথাও তাকে মানায় না; সে ইচ্ছা মাত্রেই শচী ও দ্রৌপদীর মাঝখানে নিজের শূন্য আসনটিতে যে কোন মুহূর্ত্তে বসিতে পারে।

৪

সময় হইয়াছে বুঝিয়া চাঁপা ঠাকুরাণী শিকারের প্রতি শর নিক্ষেপ করিল।

ইন্দ্রাণীর বিবাহে চাঁপার উৎসাহ সকলের চেয়ে বেশী ছিল; বিবাহের

পরে কয়েক মাস সে ইন্দ্রাণী ও পরন্তপের সুখ-সুবিধার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে; ক্রমে তাদের মধ্যে ঘনিষ্টতা জমিয়াছে, এমন সময়ে চাঁপা ধীরে ধীরে তার নীতির পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল।

দর্পনারায়ণের হাতে অপমানের পর হইতে পরন্তপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল প্রতিশোধ না লওয়া পর্য্যন্ত সে নারী ও সুরা স্পর্শ করিবে না। ইন্দ্রাণীকে বিবাহ মূল উদ্দেশ্যে দর্পনারায়ণকে জব্দ করিবার সুযোগ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু বিবাহের পর ক্রমে তার প্রতিজ্ঞার জোর কমিয়া আসিতে আরম্ভ করিল। রক্তদহের জমিদার রূপে যে সমস্ত সুখসুবিধা ও ঐশ্বর্য্যের স্বাদ পাইল, তাতে পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা তার কাছে অনেকটা অবাস্তব হইয়া পড়িল, এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে পুনরায় আজীবনের চিহ্নিত পথের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল। প্রথমে মদ ধরিল। সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকখানায় একাকী মদ্যপান করিত; বেঙা তাহাকে গোপনে মদ সরবরাহ করিত। ইন্দ্রাণী বুঝিত; কিছুই বলিত না; দর্পনারায়ণের অপরাধের কথা সে ভুলিতে পারে নাই। চাঁপা বুঝিত, সময় হয় নাই মনে করিয়া সে চুপ করিয়া থাকিত।

ক্রমে পরন্তপের মন নারীর জন্য ব্যকুল হইয়া উঠিল। ইন্দ্রাণী! না; ইন্দ্রাণী তৃষ্ণার জল; সে তো নেশার পানীয় নয়! বেঙা গোপনে তাকে বাহির বাড়ীতে মেয়ে সরবরাহ করিত। ইন্দ্রাণী বুঝিত; কিন্তু তাহার মুখের একটি রেখাও পরিবর্ত্তিত হইত না; পাষানের আবার ভাব বিপর্য্যয় কি। ইন্দ্রাণী তো পাষাণী! একদিন অনেক রাত্রে যখন পরন্তপ বাহির বাড়ী হইতে ভিতরে আসিতেছে, এমন সময়ে তার চোখে পড়িল, আলোকিত জানালা-পথে চাঁপাকে;' পরন্তপ চমকিয়া উঠিল, এত কাছে তবু মনে পড়ে নাই। পরন্তপের মন লালসায় আকুল হইয়া উঠিল।

তারপর হইতে পরন্তপ শত সহস্র রকম ছুতাতে চাঁপাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল; চাঁপাও শত সহস্র রকম ছুতাতে তাকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল; দুইজন নিপুণ অসিচালক যেন বিদ্যুতঝলিত অস্ত্রের দ্বারা একই সময়ে

আত্মরক্ষা ও আততায়ীকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। চাঁপা সারাদিন নানা কাজে, নানা ছুতায় পরন্তপের কাছে আসে, মিষ্ট কথা বলে, চোখের ভাষা চঞ্চল হইয়া উঠে; যেমনই সন্ধ্যা হয় আর সে ঘেঁসে না; পরন্তপ তাকে দূর হইতে দেখিয়া দিনের বেলার মানুষ বলিয়া আর চিনিতে পারে না—যেন সে কতদূরে গিয়া পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে সে অসম্বৃত অঞ্চল সম্বৃত করিবার নামে তাহা শিথিলতর করিয়া উল্কার মত ছুটিয়া পালায়; পরন্তপ মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া থাকে।

একদিন নির্জ্জন দ্বিপ্রহরে পরন্তপ হঠাৎ চাঁপার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল; চাঁপা কত সৌভাগ্য মনে করিয়া তাকে বসাইল; কত গল্প করিল; পরন্তপ বলিল, তার মাথা ব্যথা করিতেছে, চাঁপা মাথা টিপিয়া দিল, পাখার বাতাস করিল; কত সুখ দুঃখের কথা হইল; পরন্তপ ভাবিল, সে চাঁপাকে ভুল বুঝিয়াছে; মেয়েমানুষ একটু জবরদস্তি চায়।

সেদিন রাত্রে চাঁপা পুরাতন চণ্ডীমণ্ডপের মধ্য দিয়া কি কাজে যাইতেছিল, এমন সময় কোথায় ছিল পরন্তপ, সে হাসিয়া চাঁপার হাত ধরিল। আঃ কি সে নরম হাত; ফুলের স্নিগ্ধতার সঙ্গে বাসর-শয্যার কোমলতা তাতে সম্মিলিত! কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই একটানে হাত ছাড়াইয়া সে দ্রুত প্রস্থান করিল; যাইবার সময় এক ঝলক মদিরা তার চোখ হইতে উচ্ছ্বাসিত হইয়া পড়িল! পরন্তপ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সেই দৃষ্টি ও হাতের স্পর্শ তার শিরায় শিরায় বাসনার স্পর্শমণি বুলাইয়া দিতে লাগিল। চাঁপা শিকারী বটে!

এমন সময় সংবাদ আসিল, দর্পনারায়ণ নূতন বধূসহ জোড়াদীঘিতে ফিরিতেছে। চাঁপা বুঝিল, এইবার তার শর নিক্ষেপ করিবার সময়!

চাঁপা ইন্দ্রাণীকে আঘাত করিতে চায়—এমন আঘাত যাহা সে জীবনে কখনো ভুলিবে না। বাহির হইতে কেহ বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু অন্তরে সে পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইবে—বজ্রাঘাতে যেমন মানুষের দেহটা দাঁড়াইয়া থাকিলেও অস্তিত্বের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। এতদিন দর্পনারায়ণ ছিল

বিতাড়িত, ইন্দ্রাণীর সেই এক সুখ ছিল; এসময়ে মারিলে সে আধমরা মাত্র হইত; কিন্তু এখন দর্পনারায়ণ নূতন বধূসহ সগৌরবে ফিরিয়া আসিয়াছে, চাঁপা বুঝিতেছে ইন্দ্রাণীর তাতে কতখানি দুঃখ, এই সময় যদি পরন্তপকে সে আয়ত্ত করিতে পারে তবে—এমন ব্যাপার কল্পনা করিতেই তার মন হিংসার উগ্র হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত; এতদিন সে পরন্তপের লালসায় শান দিয়া তাকে প্রখর করিয়া তুলিয়াছে, এবার প্রতিহিংসার এই মহেন্দ্রক্ষণে সে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিবে। ইন্দ্রাণী পাষাণী! তা হোক, পাষাণও ভেদ করিতে পারে ইহা এমন অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র!

হঠাৎ সে দিন রাত্রিবেলায় চাঁপা বাহির-বাড়ী হইতে পরন্তপকে ডাকিয়া পাঠাইল। পরন্তপ তার কক্ষে আসিলে চাঁপা তাকে আদর করিয়া বসাইল। সে দেখিল, বিছানার উপরে একটি বকুলফুলের মালা; হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বলি এ মালা আবার কার জন্য? চাঁপা একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস চাপিয়া দিতে দিতে বলিল, আমার আবার মালা পরাবার লোক কই; নিজে গাঁথি নিজেই পরি!

পরন্তপ বলিল—বল কি, আমি তো জানতাম, মালারই অভাব, গলার নয়।

চাঁপা হাসিতে হাসিতে বলিল—তেমন গলা পাই কোথায়?

—সত্যি? বলিয়া মালাটি লইয়া পরন্তপ জিজ্ঞাসা করিল, পরি?

চাঁপা সহজ ভাবেই বলিল—পরুন না!

পরন্তপ বলিল—ও'কি ছিঃ, এত আলাপের পর ওই আপনি, আজ্ঞে ভাল দেখায় না!

চাঁপা বলিল—আমাদের মুখে এতবড় কথা সাজে না!

—বটে? এই বলিয়া হঠাৎ সে হাত দিয়া চাঁপার চিবুক ধরিয়া বলিল; দেখি কি রকম তোমার মুখ!

চাঁপা মুখ সরাইয়া লইল, কিন্তু সরিল না। পরন্তপ বলিল,—দাঁড়িয়ে

থাকলে কেন, ব'সনা! চাঁপা বলিল,—আমি আসছি, আপনি বসুন। এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

পরন্তপ অপেক্ষা করিয়া করিয়া অবশেষে চাঁপার শয্যায় শুইয়া পড়িল; কিছুক্ষণ শুইবার পরে তার ঘুম পাইল, সে ঘুমাইয়া পড়িল। চাঁপা আর ফিরিল না।

এদিকে ইন্দ্রাণী শয়নকক্ষে শুইতে গিয়া দেখিল, রাত্রি অনেক হইয়াছে; পরন্তপ আজকাল বহু রাত্রে আসে, তাই সে দরজা খোলা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়ে, কিন্তু ঘুমাইবার আগে তার একটা অভ্যাস আছে, কুলুঙ্গির উপরে সে দেখে সিন্দুকের চাবি আছে কি না। আজ দেখিল, চাবি নাই! সে ভাবিল চাঁপা বোধ হয় লইয়া গিয়াছে, ফিরাইয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছে, চাবি ত চাঁপা ও সে ছাড়া আর কেউ নাড়ে না। সে তাড়াতাড়ি চাঁপার কক্ষে গেল; ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শয্যার কাছে পৌঁছিয়া সে চমকিয়া উঠিল। চাঁপার শয্যায় ফুলের মালা গলায় দিয়া পরন্তপ নিদ্রিত! এক মুহূর্ত্ত মাত্র! তারপর যে চোরের মত নিঃশ্বাস রোধ করিয়া পা টিপিয়া বাহির হইয়া আসিল—এক দৌড়ে শয়নকক্ষে গিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। ইন্দ্রাণী বোধ হয় আগাগোড়াই পাষাণী নয়।

এতক্ষণ চাঁপা ঘরের পাশে অন্ধকারে বসিয়াছিল। সে জানিত, ইন্দ্রাণী চাবি না পাইয়া নিশ্চয়ই তার ঘরে একবার আসিবে; চাঁপাই চাবি সরাইয়া রাখিয়াছিল। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পরে ইন্দ্রাণী আসিল—ঘরে প্রবেশ করিল, আবার চোরের মত পলাইয়া গেল—চাঁপা সব লক্ষ্য করিল। ইন্দ্রাণী চলিয়া যাইবার পরে সে হাসির ভরে লুটাইয়া পড়িল। কিন্তু যে রকম প্রাণ ভরিয়া সে হাসিবে এতদিন কল্পনা করিতেছিল, তেমন করিয়া হাসিতে পারিল না, কোথায় যেন বাঁধিতে লাগিল।

ইন্দ্রাণী চলিয়া গেলে সে ঘরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত পরন্তপকে এক

প্রকার জোর করিয়া উঠাইল এবং হাত ধরিয়া দরজার কাছে আনিয়া বাহির করিয়া দিবার উপক্রম করিল।

পরন্তপ নেশা ও নিদ্রাজড়িত স্বরে বলিল—এ আবার কি?

—ঘরে যান।

—এই তো বেশ ছিলাম।

—না, না, রাত হয়েছে, ঘরে যান—

—তুমি?

—যান, বিরক্ত করবেন না।

পরন্তপ গলায় হাত দিয়া বলিল, -মালা গেল কোথায়? তারপর নিজের মনেই বলিতে লাগিল—স্বপ্ন না কি? চাঁপা আর বিলম্ব না করিয়া তাকে বাহিরে ঠেলিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

তখন চাঁপা বিছানায় শুইয়া হাসিতে গিয়া অঝোরে কাঁদিয়া ফেলিল। চাঁপাও বোধ হয় আগাগোড়াই মন্দ নয়। মানুষ অবিমিশ্র ভালও নয়, ফকিরের নানারঙের জোড়াতালি পোষাকের মত মানুষ পাঁচ-মিশালি সৃষ্টি।

পরন্তপ সোজা বৈঠকখানায় গিয়া নিদ্রিত বেঙাকে এক লাথি মারিয়া জাগাইয়া বলিল—এই বেটা মদ নিয়ে আয়। সুপ্তোত্থিত বেঙা বলিয়া উঠিল, না। মোতির মা যে বলেছিল—

পরন্তপ পুনরায় হাঁকিয়া উঠিল—রাখ তোর মোতির মা—নিয়ে আয় মদ।

৫

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে ইন্দ্রাণী একদিন বেঙাকে ডাকিয়া বলিল—হ্যাঁ রে বেঙা, সেদিন যে তুই বললি জোড়াদীঘির নূতন-বৌ দেখতে কুৎসিত, তুই কি ক'রে জানলি? তুই কি দেখেছিস্?

বেঙা বলিল—তা এক রকম দেখা বই কি।

—তার মানে তুই নিজের চোখে দেখিস্ নি।

বেঙা বলিল—সে কথা ঠিক মা, নিজের চোখে দেখিনি—তবে কি না মোতির মার চোখে দেখেছি—মোতির মা বলে কি জান—

ইন্দ্রাণী হাসিয়া বলিল—মোতির মার কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে গেলাম, আর পারি না।

—ওই তো মা, মোতির মাকে দেখনি বলেই এমন কথা বলছ!

—কিন্তু তোর মোতির মা নূতন-বৌ সম্বন্ধে কি বলে?

—মোতির মা বলে, নূতন-বৌ দেখতে নিশ্চই কুৎসিত, নইলে জোড়াদীঘির কর্ত্তা তাদের বাড়ীতে ঢুকতে দেবে না কেন?

বেঙার উত্তর শুনিয়া ইন্দ্রাণী হাসিতে লাগিল, বলিল—তার তো অন্য কারণও থাকতে পারে।

বেঙা বলিল—আচ্ছা মা, এবার আর মোতির মার চোখে নয়, নিজে গিয়ে দেখে আসব।

ইন্দ্রাণী বিস্মিত হইয়া বলিল—সে কি রে? তুই সেখানে কেমন করে যাবি?

বেঙা তার পায়ের কাছে ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া বলিল—মা তোমার আশীর্ব্বাদে আর—। ইন্দ্রাণী তাকে কথা সমাপ্ত করিতে না দিয়া বলিল—আর মোতির মার বুদ্ধিতে,—কি বলিস্?

বেঙা হাসিয়া ফেলিল। ইন্দ্রাণী বলিল—মোতির মার বুদ্ধি তা'তে আর সন্দেহ নেই। কিছুক্ষণ এদিকে ওদিকে ঘুরে এসে মনগড়া যা হয় একটা কিছু বলে দিবি এই তো!

ইন্দ্রাণীর কথা শুনিয়া বেঙা জিভ কাটিয়া, কানে হাত ঠেকাইয়া বলিল—বল কি মা। মিথ্যে কথা—বেঙা চৌকিদার আর যাই করুক, ওইটি তার দ্বারা হয় না।

ইন্দ্রাণী হাসিতে লাগিল।

বেঙা বলিল—আচ্ছা মা বিশ্বাস না হয়, আস্ত একটা প্রমাণ আনব। তখন দেখে নিও, বেঙা চৌকিদার সত্যি বলে কি মিথ্যা।

ইন্দ্রাণী হাসিয়া তাকে বিদায় দিল।

পরের দিন বেঙা বৈরাগী ভিখারীর সাজে কপালে ফোঁটা কাটিয়া কাঁধে ঝুলি ও হাতে লাঠি লইয়া জোড়াদীঘির অভিমুখে যাত্রা করিল।

* * *

বিকাল বেলায় জোড়াদীঘিতে এক বৈরাগী আসিয়া উপস্থিত হইল। একদল ছেলে তার পিছনে লাগিয়া গেল। কেহ চীৎকার করিতে লাগিল।

ওগো বৈরাগী ঠাকুর

তোমার ঝুলি থেকে জল পড়ে টাপুর টুপুর

আবার কেহ কেহ বা তার আরও কাছে গিয়া জিজ্ঞাসার সুরে চীৎকার করিতে লাগিল—

ওরে ও বাবাজী

তোমার ঝোলার ভিতর কি ?

কিন্তু বাবাজী তাদের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া সোজা চৌধুরী-বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। কাছারীতে দেওয়ানজী কাজে ব্যস্ত ছিলেন, বাবাজীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, এখানে নয়, অন্যত্র যাও।

এক বৈরাগী আসিয়াছে শুনিয়া বনমালার দাসী তাকে ডাকিতে আসিল,—বলিল,—ভিতরে চল, বৌ-মা ডাকছেন। বৈরাগীও যেন তাই চায়। সে দাসীকে অনুসরণ করিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিল।

বেঙা ভিতরে গিয়া দেখিল, আঙিনায় দাস-দাসী, ছেলে-বুড়ো অনেকে জড়ো হইয়াছে—কয়েকজন মহিলাও আছে। ইহাদের মধ্যে কে যে বনমালা সে বুঝিতে পারিল না। একজন তাকে কিছু চাল ও পয়সা দিতে গেল,

বেঙা জিভ কাটিয়া বলিল—গুরুর নিষেধ, বাড়ীর গিন্নী ছাড়া আঁর কারও হাত থেকে ভিক্ষা নেওয়া বারণ।

যে ভিক্ষা দিতে গিয়াছিল, সে হাসিয়া বলিল—নাও, বৌ-মা তুমি দাও।

বনমালা তার হাত হইতে চাল ও পয়সা লইয়া বৈরাগীর ঝুলির মধ্যে ঢালিয়া দিল। বেঙা দেখিল, বাড়ীর গৃহিনী বটে, বোধ হয় ইন্দ্রাণীর চেয়েও বেশী সুন্দর।

বনমালা বলিল—তুমি গান জান?

বেঙা বলিল—গান না জানলে কি ব্যবসা চলে?

বনমালা বলিল—তাহ'লে একটা গান গাও।

বেঙা তখন একতারা বাজাইয়া গান আরম্ভ করিল—

'এক পাপীর বাড়ীতে ছিল তুলসী বৃন্দাবন,
তুলসী কাটিয়া পাপী লাগাইল বাইগুন।'

গান শুনিয়া, বিশেষ গানের সঙ্গে সঙ্গে তার অদ্ভুত মুখভঙ্গী দেখিয়া সকলে হাসিতে লাগিল। এই গান শেষ হইলে মেয়েদের ফরমাইস মত সে আরও কয়েকটি গান করিল। তখন বনমালা জিজ্ঞাসা করিল—বাবাজী তুমি হাত দেখতে জান?

বেঙা সকল সময়েই অপ্রতিভ, বলিল—জানি বই কি।

অমনি এক সঙ্গে আট দশ জনে বলিয়া উঠিল—আমার হাতখানা, আমার হাত!

বেঙা পুনরায় জিভ কাটিয়া বলিল—গুরুর নিষেধ, মা-ঠাকরুণ সব, বাড়ীর গিন্নী ছাড়া আর কারো হাত দেখা বারণ।

মেয়েরা ক্ষুণ্ণ হইল। বলিতে লাগিল, তারাও তাদের বাড়ীর গৃহিণী। বনমালা তখন নিজের হাত বাড়াইয়া দিল। বেঙা বলিল—অন্যের সম্মুখে হাত দেখলে ফল ফলে না। বনমালার ইঙ্গিতে অন্য সকলে প্রস্থান করিল।

তখন বেঙা খড়ি পাতিয়া, কখনও বা তার হাতের রেখা বিচার করিয়া অনেক কথা বলিল।

হাত দেখিবার মত সহজ ব্যাপার আর কিছুই নাই। যারা হাত দেখায় তারা বিশ্বাস করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া থাকে—যে কোন কথা বলিলেই, তা ভাল হোক, আর মন্দ হোক, বিশ্বাস করিয়া বসে। অতীতের কথা বলাও কঠিন নয়, মানুষের মন এমন এবং জীবন এমন বিচিত্র যে, যাই বল না কেন, তাই কোন না কোন রূপে জীবনে ঘটিয়া গিয়াছে, কাজেই সব সত্য বলিয়া মনে হয়।

বেঙা বলিল—মা-ঠাকরুণ, তোমার জীবনের একটা বিপদ কাটিয়া গিয়াছে।

বনমালার মনে পড়িল, পলাশীর মাঠের সেই ঘটনা। বাবাজীর প্রতি তার বিশ্বাস বাড়িল।

বেঙা জানিত, বিবাহের পরে সে অনেক দিন দর্পনারায়ণের সঙ্গে এদিক ওদিকে ঘুরিতে বাধ্য হইয়াছে।

বেঙা বলিল—মা, বিয়ের পরে তোমার দেশভ্রমণ লেখা দেখছি।

বনমালা দেখিল বাবাজী একেবারে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন। তারপরে বেঙা বনমালার ভাবী পুত্রকন্যার সংখ্যা নির্দ্দেশ করিল; বনমালা লজ্জিত হইয়া হাত টানিয়া লইল। সে বলিল, বাবাজী তুমি ব'সো, আমি আসি। এই বলিয়া সে কিছু পারিতোষিক আনিতে গেল। বেঙা দেখিল, অদূরে একটা খাঁচায় সুন্দর একটি পায়রা আছে। তার মনে পড়িল, ইন্দ্রাণীকে বলিয়াছিল প্রমান লইয়া যাইবে। সে চট্ করিয়া উঠিয়া খাঁচা খুলিয়া পায়রাটিকে বাহির করিয়া কৌশলে একটা ন্যাকড়ায় জড়াইয়া ঝুলির মধ্যে ফেলিল। বনমালা ফিরিয়া আসিয়া তাকে একখানা ধুতি বক্‌শিস দিল। বেঙা গৃহীণির গুণগান করিতে করিতে ও অদূরভবিষ্যতে অগণ্য পুত্রকন্যার আবির্ভাবের আশা দিতে দিতে বাহির বাড়ীতে আসিল। তার আর ভিক্ষার

প্রয়োজন ছিল না—সে সোজা দেউড়ী পার হইয়া রক্তদহের দিকে প্রস্থান করিল।

*　　　*　　　*

পরের দিনে সকালে বেঙা ইন্দ্রাণীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভীত পায়রাটিকে বাহির করিয়া বলিল—এই নাও মা প্রমাণ।

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করিল—এ কোথায় পেলি?

বেঙা বলিল—এ পায়রা যে-সে পায়রা নয় মা; একেবারে লোটন-পায়রা; এ ছাড়া পেলেই যেখান থেকে এসেছে, সেখানে উড়ে যাবে।

ইন্দ্রাণী বলিল—এ পায়রা কার-রে?

—একেবারে খোদ জোড়াদীঘির নূতন-বৌয়ের। ভাল করে' খাঁচায় বন্ধ করে' রেখে দিও; ছাড়া পেলেই উড়ে যাবে তার কাছে।

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করিল—কেমন দেখলি তাকে?

বেঙা জীবনে এই প্রথম বলিল—বেটি মিথ্যা কথা বলেছে!

—কে রে?

—মোতির মা।

—কেন?

—জোড়াদীঘির নূতন-বৌ পরমা-সুন্দরী।

ইন্দ্রাণীর মুখে নিজের অজ্ঞাতসারে বিষণ্ণতা ফুটিয়া উঠিল। তার এতদিন ধারণা ছিল দর্পনারায়ণের পত্নী সুন্দরী হইলে তার দুঃখের তীব্রতা যেন অল্প হইবে। কিন্তু বেঙার মুখে তার রূপের খ্যাতি শুনিয়া মোটেই তার সে রকম মনে হইল না; বরঞ্চ দুঃখের তীব্রতা অধিক করিয়া অনুভব করিল। মানুষ বিধাতার অদ্ভুত সৃষ্টি।

৬

চৌধুরীকর্ত্তা পূজার ফর্দ্দ ধীরে সুস্থে করিতে বলিয়াছিলেন; ফর্দ্দ ধীরে সুস্থেই হইতেছে ত্বরার কোন লক্ষণ নাই।

সেদিন বিকাল বেলা দীর্ঘ নিদ্রার পরে ভট্টাচার্য্যের মন বড়ই প্রফুল্ল ছিল; তিনি ডাকিলেন, ওহে বাণী, এস একবার বসা যাক। জমিদারবাড়ী থেকে বড়ই তাগিদ আসছে।

বাণীবিজয়ের অপ্রস্তুত থাকিবার কথা নয়, কারণ তার তাড়া আরও জরুরি, সেই জন্য সে আদেশ মাত্র লেখনি ও মস্যাধার লইয়া আসিয়া বসিল। ভট্টাচার্য্য দ্রব্যাদির নাম বলিতে যাইবেন, এমন সময়ে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, বলিলেন—ওহে বাণী, গিন্নীকে ডাক, এ সব বিষয়ে তার যেমন স্মরণশক্তি, আমার তেমন নয়।

বাণী লেখনী রাখিয়া গৃহিণীকে ডাকিতে গেল। কিছুক্ষণ পরে গৃহিণী আসিলেন, বলিলেন, আমাকে আবার কেন তোমাদের এ সব শাস্তরের মধ্যে আমি কি করব!

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, গিন্নী, শুধু শাস্তর হলে কি আর তোমাকে ডাকতাম, এর মধ্যে 'বস্তর' আছে—

বাণীবিজয় কথাটাকে আরও একটু ঠেলিয়া দিবার জন্য বলিল,—আজ্ঞে শুধু বস্তর কেন, তৈজস, স্বর্ণ, রৌপ্য, ধেনু, নানারকম ব্যাপার আছে—

গিন্নী একটি পিতলের কৌটা হইতে খানিকটা দোক্তা মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া পানটাকে বেশ আয়ত্ত করিয়া আনিতে আনিতে বলিলেন,—আমার বাপু ওসব ভাল লাগে না। দেব-দ্বিজের কাজের মধ্যে অমন করে দৃষ্টি দিলে অমঙ্গল হবে বাপু!—এই পর্য্যন্ত বলিয়া গিন্নী বসিয়া পড়িলেন—বাণীবিজয় ক্ষিপ্র হস্তে একটা কুশাসন অগ্রসর করিয়া দিল; কুশাসনে গৃহিণীকে কেবল অর্দ্ধেক ধরিল।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন গিন্নী তোমাকে এতদিন ধরে শাস্ত্র চর্চ্চা করালাম আর এখনও ভুল ভাঙ্গল না! আরে ওই দেব-দ্বিজের মধ্যে দ্বিজ তো আমরাই।

শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া গৃহিণী যেন কতকটা আশ্বস্ত হইলেন—তবুও সংশয়

প্রকাশ করিয়া বলিলেন, কি জানি বাপু, আমি অতশত বুঝি না; তোমরা সব পণ্ডিত, যা হয় কর, কিন্তু দেবতাদের রাগিও না।

বাণীবিজয় বলিল, আজ্ঞে দেবতাদের জন্যে ভাবিনে, কিন্তু ফর্দ্দের দৈর্ঘ্য দেখলে চৌধুরীকর্ত্তা না রেগে যান।

ভট্টাচার্য্য উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, দেবতা হে, দেবতা, চৌধুরীকর্ত্তা আমাদের দেবতা!

গৃহিণী বলিলেন—তা হলে তোমাদের দেব-দ্বিজে বেশ মিলন হয়েছে। তারপর ব্যস্ত ভাবে বলিলেন—নাও, নাও, আমার তাড়াতাড়ি আছে। ঘোষেদের বড় বউয়ের কাল সাধ; সেখানে আমাকে যেতে হবে। আমাকে আবার ডাকা কেন? নাও বাপু, যখন ডেকেইছ, সামান্য দু'চারটা জিনিস যা দরকার বলে যাচ্ছি। এই পর্য্যন্ত এক নিঃশ্বাসে বলিয়া, তিনি যাইবার জন্য কোনরূপ ব্যস্ততা প্রকাশ না করিয়া জমিয়া বসিলেন।

—নাও, বাবা, বাণী লিখে নাও, আমি আবার ভুলে যাব, বুড়ো-মানুষের মনকে বিশ্বাস নেই—বলিয়া গৃহিণী আরম্ভ করিলেন,—সদুর বাড়ীতে আজ ছমাসের মধ্যে কিছু পাঠান হয় নি, তা মনে আছে কি? কেবল লেখা পড়া নিয়ে থাকলেই চলে না। এই পর্য্যন্ত বলিয়া একবার হতভাগ্য ভট্টাচার্য্যের দিকে বক্রদৃষ্টিপাত করিলেন। তারপর আবার আরম্ভ হইল,—যেমন যেমন বলব, অমনি লিখে নিয়ো বাবা বাণী। সদুর জন্যে তাঁতের শাড়ী দু'খানা, জামাই-এর ধুতি চাদর একজোড়া; খেন্তি, পটল, কানু, হ'ল গিয়ে তিন জন, তাদের তো কিছু দেওয়া হয় নি। খেন্তি, পটলের ডুরেশাড়ী আর ধুতি দু'জোড়া। কানুর জন্য দোলাই একখানা। লিখেছো তো বাবা বাণীবিজয়?

বাণীবিজয় সম্মতি জ্ঞাপন করিল। গৃহিণীর ফর্দ্দ শুনিয়া কর্ত্তার মনে নানা ভাবের চমক লাগিতেছিল, কখন বিস্ময়, কখন প্রশংসা, কখন বা ঈষৎ ভক্তি, কিন্তু হঠাৎ দোলাই-এর ফরমাস শুনিয়া কর্ত্তার চমক ভাঙিল; তিনি উপরোধের সুরে বলিলেন, গিন্নী দোলাইটা কি ঠিক হল?

গিন্নী তখন তার দ্বিতীয়া কন্যা জগদম্বার সাংসারিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মনে মনে একটা হিসাব করিতেছিলেন, হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, কেন ?

—দৈবক্রিয়াতে দোলাই দিবার বিধান তো কোন শাস্ত্রে নেই।

—সব শাস্ত্রই কি তোমার পড়া হয়েছে ?

কর্ত্তা বলিলেন—এমন কথা কোন্ পাষণ্ড বলবে, কিন্তু কোন শাস্ত্রে আছে তোমার যদি জানা থাকে—তবে—তবে—

—কি ? আমি মেয়েমানুষ শাস্ত্র পড়ব—আর তুমি তা হলে কি করবে ?

কর্ত্তা বুঝিলেন গৃহিণী ক্রুদ্ধ হইয়াছেন ; গৃহিণী রাগিলে নাকের নথ স্থির হইয়া থাকে ; বাহুর অনন্ত জোড়া ঘন ঘন কাঁপিয়া ওঠে। গৃহিণী বলিলেন, আমি মুখ্খ্যু মেয়েমানুষ ; শাস্তর জানি না ; কিন্তু আমরা কবে কখন কি কতখানি দরকার তা জানি ! এই সব জিনিস আমর চা-ই। শাস্তরে না থাকে কিনে এনে দাও।

গৃহিণীর শেষ যুক্তিটা আকস্মিক বজ্রের মত কর্ত্তার মাথায় আসিয়া পড়িল, তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কর্ত্তার দুর্দ্দশা দেখিয়া বাণীবিজয় বলিল, মহাশয় আমার যতদূর স্মরণ হয় পরাশর সংহিতায় দোলাই-এর উল্লেখ আছে, অতএব—

—অতএব ব্যস্ত হবার কারণ নেই। বলে যাও গিন্নী, তোমার আর কি কি প্রয়োজন !

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন—আমার বাবার কাছে শুনেছি, বুঝলে বাণী,—তিনি আমাদের অঞ্চলের সব চেয়ে বড় পণ্ডিত ছিলেন (বাণী এ কথা বহুবার শুনিয়াছে) যে, ঋষিদের লেখা শাস্ত্রে এমন জিনিস নেই যা খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি একবার পূজার ফর্দ্দের মধ্যে একটা লোহার সিন্দুক, দু'খানা ঢাল, শড়কি ভরে দিয়েছিলেন। এই পর্য্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা করিয়া পুনরায়

বক্তব্য বিষয়ে ফিরিয়া আসিলেন—ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী কখনও কাজের কথার সূত্র ভুলিয়া গিয়াছেন, এমন অপবাদ কেহ দিতে পারে না।

—লিখে নাও বাবা বাণী, আমার আবার মতিভ্রম হয়। গতবার পূজোর জগদম্বাকে কিছু দিতে পারিনি। এই বলিয়া তিনি জগদম্বার সংসারের লোক-সংখ্যা গণনা আরম্ভ করিলেন। জগদম্বা আর তার দুই জা' হল গিয়ে তিন; জামাইরা তিন ভাই, হল গিয়ে ছয়—কেমন হল না বাণী? খাঁদু, হাঁদু, মতি. রতন হল গিয়ে চার; ছয় আর চারে কত বাবা বাণী? বার? না?

বাণী বলিল, আজ্ঞে—দশ!

—মাত্র দশ? উঁহু আরও বেশী হবে! গৃহিণী পুনরায় আদম সুমারী আরম্ভ করিলেন।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, গিন্নী, অকটু তাড়াতাড়ি কর; তুমি না ঘোষেদের বাড়ী যাবে বলেছিলে?

—দৈব-কার্য্যে তাড়াতাড়ি করলে অপরাধ হবে; সে আমি পারব না, মাগো;—বলিয়া গৃহিণী দেবতার উদ্দেশ্য হাতজোড় করিয়া কপালে ঠেকাইলেন। ভট্টাচার্য্য নিরুপায় হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

—এদের সকলেরই একখানা করে ধুতি আর শাড়ী চাই; এখন এই হলেই চলিবে; তারপর না হয় পূজোর সময় আবার দেখা যাবে! বলিয়া গৃহিণী নিজের বিচক্ষণতায় নিজেই অবাক হইয়া গেলেন।

গৃহিণীর তালিকাকে সমাপ্তিতে আনিবার জন্য ভট্টাচার্য্য বলিলেন—বাণী তা হলে লিখে নাও, আর দেরী নয়।

—কিন্তু এদিকে বাসন-পত্তরের অবস্থা দেখেছো। সব যে ভেঙ্গে চুরে গেল—

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, সে সব হবে এখন, পূজোর সময়।

—না, না, সব পূজোর জন্য ফেলে রাখলে চলবে না। ততদিন ই বা চলবে কি করে? গোটা-দুই পিতলের কলসী, খান পাঁচ সাত কানপুরি থালা; গোটা দুই তিন ঘটি, অন্তত একটা ডেকচি নইলে নয়!

ভট্টাচার্য্য পুনরায় শঙ্কিত ভাবে বলিলেন, গিন্নী, তুমি তো বললে। কিন্তু এখন এ সব জিনিস আমি শাস্ত্রের সঙ্গে মিল করি কি করে? খামাকা তো চাওয়া যায় না!

—তোমার ভরসায় বাপু আমি এসব বলি নি। বাবা বাণী তুমি একটু পুঁথি নেড়ে চেড়ে মিলিয়ে দিয়ো।

বাণী গদ গদ ভাবে বলিল, মা ঠাকুরুণ, সে জন্ম আপনি ভাববেন না; আমাদের শাস্ত্র যেমন উদার তেমনই ভারসহ, ওর মধ্যে সব ঢুকবে, সব ভার ওতে সইবে।

গৃহিণী প্রশংসাসূচক স্বরে বলিলেন, তুমিই পড়েছিলে বাবা শাস্তর! আচ্ছা বাণী খান কতক কাঁঠালের তক্তা ঢুকিয়ে দিতে পার? বাড়াতে যে তক্তপোষের অভাব হয়েছে।

—কি যে বলছেন মা ঠাকুরুণ, কাঁঠালের কাঠ তো সামান্ত জিনিস, আস্ত কাঁঠাল গাছ ঢুকিয়ে দিতে পারি।

আর সেই সঙ্গে খানকতক পাকুড় গাছের তক্তা; দরজা হবে; আর একটা শালগাছের গুঁড়ি ঢেঁকি তৈরি হবে। চৌধুরীদের পুকুর পাড়ে গোটা কয়েক শালগাছ আছে, অনেক দিন থেকে লক্ষ্য করেছি।

বাণীবিজয় গাছের নাম লিখিয়া লইল। তারপরে একটু কাশিয়া সঙ্কোচের সঙ্গে বলিল, সবই তো হল মা, কিন্তু আপনার জন্ম তো কিছু হ'ল না—

আমার আবার কি দরকার? তুমিও যেমন!

—সে কি হয়? আপনার জন্তে কিছু না হলে তালিকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে! এই আমি লিখলাম, পট্টবস্ত্র একখানা—এই বলিয়া পট্টবস্ত্র একখানার স্থলে দুইখানা লিখিল।

—গৃহিণী কৃত্রিম বৈরাগ্যের সঙ্গে বলিলেন, হু আমার জন্ম আবার পট্টবস্ত্র! না না বাণী, ওটা কেটে দাও। তিনি নিশ্চয় জানিতেন বাণী কাটিয়া দিবে না।

বাণী জিভ কাটিয়া বলিল, ওইটি পারব না মা, আর যাই করি।

গৃহিণীর হঠাৎ ঘোষেদের বউয়ের সাধের কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি মুখের মধ্যে খানিকটা দোক্তা ফেলিয়া দিতে দিতে বলিলেন যা হয় তোমরা কর—আমার বাপু তাড়াতাড়ি, আমি চললাম। তিনি অতিকষ্টে শরীরটাকে টানিয়া তুলিয়া প্রস্থান করিলেন।

গৃহিণী চলিয়া গেলে ভট্টাচার্য্য এদিক ওদিক দেখাইয়া মৃদু-স্বরে বলিলেন যাক্ তবু গিন্নী এবার অন্নের উপর দিয়েই সেরেছে!—অনেক কিছুই এখনও বাকি রয়ে গেল। লেখ তো বাপু—খড়ম দুই জোড়া; চর্ম্মপাদুকা দুই জোড়া; ভাল মুর্শিদাবাদি ছত্র দুইটি; আস্ত মৃগচর্ম্ম তিনখানা;—

ভট্টাচার্য্যের ক্রম-বর্দ্ধমান তালিকার মধ্যে বাণীবিজয় নূতন নূতন দ্রব্যের নাম সংযোগ করিয়া দিতে লাগিল—

শীতলপাটি দুইখানি—

ভট্টাচার্য্য—শয্যাদ্রব্য দুই দফা—

বাণীবিজয়—ভোটকম্বল এক জোড়া—

ভট্টাচার্য্য—শয্যাধার একখানা; শয্যাধার মানে বুঝলে তো খাট—

বাণীবিজয়—আজ্ঞে তা বুঝেছি বই কি; সংস্কৃত নাম না হ'লে দাতার দাতব্যবৃত্তি উত্তেজিত হয় না।

ভট্টাচার্য্য—ঠিক বুঝেছ হে! শাস্ত্রের মর্ম্ম তুমি ঠিক ধরতে পেরেছ। গাড়ু একটি—

বাণীবিজয়—গামছা ছয়খানা—

এই রকম ভাবে বাণীবিজয় ও তার শাস্ত্র-পিতা দুয়েতে অনেকক্ষণ ধরিয়া তালিকা প্রস্তুত করিল; একজন যাহা ভুলিয়া যায়, অন্যজন তাহা মনে করাইয়া দেয়; ইহাকেই বোধ করি বলে গুরু-শিষ্য সংবাদ।

ফর্দ্দ যখন ছয় পাতা হইল, ভট্টাচার্য্য উদার ভাবে বলিলেন, থাক থাক আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে। উদারতা পূর্ণ উদরেব বৃত্তি মাত্র।

তালিকা দেখিয়া গুরু ও শিষ্য উভয়েই সন্তুষ্ট হইল। বাণীবিজয়ের পট্টবস্ত্র যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, গুরুর তো কথাই নাই।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, ওখানা সাবধানে রেখে দাও ; কাল প্রত্যুষে একবার চৌধুরী-বাড়ী যাওয়া যাবে।

তারপর একটু থামিয়া বলিলেন, এমন বোধ হয় কিছু বেশী হল না! এত বড় একটা ব্যাপার হচ্ছে!

বাণী বলিল, আজ্ঞে কিচ্ছু না। ওদের পক্ষে সামান্যই, আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। জগতের রহস্যই তো এই! আমরা ভাবছি কত না জানি হল। দেখবেন চৌধুরী-কর্ত্তা দেখে বলবেন—মাত্র এই!

ভট্টাচার্য্য ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে আর কিছু ঢুকিয়ে দেব না কি?

বাণী বলিল, আজ্ঞে সময় আছেই। সারারাত্রি ভেবে দেখবেন এখন। কিছু মনে পড়লে তখন--

—বেশ, বেশ ; তোমার সাংসারিক বুদ্ধি আছে হে, জীবনে উন্নতি করবে।

এমন আশীর্ব্বাদ পাছে নিষ্ফল হয়, তাই সে গুরুর পায়ের কাছে টিপ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িল!

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, তুমিও রাতটা ভেবে দেখো। এ সুযোগ গেলে আবার সেই পূজোর আগে ছাড়া হবে না।

—যে আজ্ঞে, বলিয়া বাণীবিজয় দ্রুত প্রস্থান করিল। পাশের ঘরে সে অনেকক্ষণ হইতে কার যেন পদ-সঞ্চালন-শব্দ শুনিতে পাইতেছে।

অনেক দিন পরে আবার চৌধুরী-বাড়ী উৎসবের আয়োজনে মুখর হইয়া উঠিল। রাজমিস্ত্রী বাড়ী-ঘর সংস্কার করিতে লাগিয়া গেল ; চুণকাম

হইতে লাগিল ; রংমিস্ত্রী পুরাতন রঙের উপরে নূতন করিয়া তুলি বুলাইতে আরম্ভ করিল ; প্রকাণ্ড আঙিনায় সামিয়ানা খাটাইবার জন্য বাঁশ পোতা আরম্ভ হইল ; ঝাড়লণ্ঠন টাঙাইবার জন্য কাঠের খুঁটি পোতা হইল, চৌধুরী-বাড়ীর সকলে ব্যস্ত।

কাছারীর কাজের উগ্রমূর্ত্তিও অনেকটা কোমল হইয়া আসিল, আমলা-গোমস্তার দল হিসাবের খাতা ছাড়িয়া বেহিসাবী কাজে লাগিয়া গেল, এমন কি দেওয়ানজীর কড়া হাঁক-ডাকের মধ্যে কড়ি-মধ্যমের আভাস দেখা দিল, ব্যস্ততার আতিশয্যে তিনি চাবির তোড়া বারংবার হারাইতে লাগিলেন এবং প্রত্যেক বারই অন্যের উপর দোষারোপ করা সত্ত্বেও নিজের কোমর হইতে তাহা আবিষ্কৃত হইতে লাগিল।

দেউড়ীতে বরকন্দাজেরা নূতন পাগড়ী নূতনতর ভঙ্গীতে বাঁধিতে সুরু করিল এবং পুরাতন লাঠিতে তৈল প্রয়োগ করিয়া নূতন করিয়া তুলিবার চেষ্টায় লাগিয়া গেল ; আলিবর্দ্দি পাগড়ী বাঁধিয়া আঙরাখা গায়ে দিয়া নাগরা জুতা পরিয়া দেউড়ীতে জমাইয়া বসিয়া কয়েক মাসের ভ্রমণ-কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। আলিবর্দ্দির মধ্যে ঐতিহাসিকের বীজ সুপ্ত ছিল ; বৈদেশিক সরস্বতীর আশীর্ব্বাদ পাইলে ঐতিহাসিকের খ্যাতি সে নিশ্চয় লাভ করিতে পারিত! প্রতিদিন নূতন করিয়া আবৃত্তির সঙ্গে তার কাহিনী পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, পরিবর্ত্তিত হইতেছে, প্রতিদিনই সত্যের সঙ্গে অধিকতর কল্পনার ভেজাল মিশিতেছে, অবশেষে নিরীহ সত্য অনেক পিছনে পড়িয়া থাকিল, আলিবর্দ্দির রসনার তাড়নায় কল্পনা মহাকাব্যের সীমায় গিয়া পৌঁছিল।

বৈঠকখানায় উদয়নারায়ণ আসর জমাইয়া বসিয়াছেন, পশ্চিমা শালওয়ালা বিনা মুনাফায় অত্যুৎসাহের সঙ্গে শাল বেচিতেছে ; মুর্শিদাবাদে ও রাজসাহীর মুগার কাপড়ওয়ালার ন্যায্য মূল্যের দুই তিন গুণ দামে কাপড়, শাড়ী বিক্রয় করিতেছে ; নূতন বাসন কেনা হইতেছে ; স্যাকরা পুরাতন গহনা বদলাইয়া

নূতন গহনা দিতেছে ; উদয়নারায়ণ সবই কিনিতেছেন মুখে তার 'না' নাই। ভট্টাচার্য্যের সশঙ্ক ছয় পাতার ফর্দ্দ কর্ত্তার বদান্যতার ইঙ্গিতে বার পাতায় পৌঁছিয়াছে।

দেওয়ানজী বারংবার চাবি খুঁজিবার অবকাশে বৈঠকখানায় ও কাছারীর মধ্যে টানা-পোড়েন পাড়িতেছেন। চারিদিকে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠান হইতেছে ; পরগণায় পরগণায় প্রত্যেক মহালে প্রধানদের নামে চিঠি দেওয়া হইতেছে, তারা যেন যথানির্দ্দিষ্ট তারিখে ছোট বড় সকল প্রজাকে সঙ্গে লইয়া সদরে আসিয়া উপস্থিত হয়। আত্মীয়-স্বজনকে সপরিবারে উৎসবের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইয়াছে ; চারি পাশের জমিদারদের উৎসবে যোগ দিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করা হইতেছে ; কেহ যেন বাদ না পড়ে—কর্ত্তার কড়া-হুকুম।

দেওয়ানজী ব্যস্তভাবে বৈঠকখানায় ঢুকিয়া বলিলেন, কর্ত্তা, তারাপুরের বাবুদের কি চিঠি দেওয়া হবে ?

কর্ত্তা বলিলেন, তোমার হল কি রামজয়, কতবার তো ওই একই কথা বললাম।

—তাই তো, তাই তো, দাঁড়ান, আমি লিখে নি—এই বলিয়া দেওয়ানজী দ্বিগুণ ব্যস্ততার সঙ্গে প্রস্থান করিলেন। একটু পরেই আবার ঘুরিয়া আসিয়া বলিলেন, চাবির গোছাটা কি ফেলে গেলাম না কি ?

কর্ত্তা বলিলেন, ফেলবে কেন ? ওই তো তেমোর কোমরে ? রামজয় কোমরে হাত দিয়া বলিলেন, কোমরেই তো বটে, কি মুস্কিল ! বুড়ো হ'য়েছি, কিছুই আর ঠিক থাকে না। কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, তোমার গোলমাল চাবিতে নয়, বুদ্ধিতে।

—সে আর বলতে ! আজ সকাল' থেকে অন্তত একশ বার চাবি হারিয়েছি, আর—

কর্ত্তা বলিয়া উঠিলেন—একশ বারই কোমরে পেয়েছ !

ঠিক ধরেছেন। এতেই বোঝা যাচ্ছে বুড়ো হয়েছি—

—চাবি না হারালেও তুমি বুড়ো হয়েছ। আর তুমি যদি বুড়ো হও, আমার তবে অবস্থা কি ভাব তো।

—আজ্ঞে ভেবে দেখব এখন—বলিয়া তিনি আবার প্রস্থান করিলেন। যেন কথাটা একাকী নিভৃতে বসিয়া না ভাবিলে বোঝা মুস্কিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—রক্তদহের জমিদারকে কি করা যায়? চিঠি দেওয়া হবে কি?

—নিশ্চয়, একশ' বার। কেন তার অপরাধটা কি? বিশেষ একবার রক্তদহের রক্তকমলের মালিক এসে আমার ভাগীরথীর শ্বেতপদ্মকে দেখে যাক, জিতল কে, সে না দর্পনারায়ণ?

—আজ্ঞে সে তো ঠিক কথা। আমি তা হলে সেই ব্যবস্থা করিগে'।

—যাও, কিন্তু আর যেন চাবি হারিও না।

দেওয়ানজী বলিলেন—আমার ওই হয়েছে এক বিপদ। চাবি সামলাতে গেলে কাজের কথা ভুলে যাই; কাজ করতে গেলে চাবি যায় হারিয়ে। বলিয়া দেওয়ানজী কছারীর দিকে খড়মের শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

চৌধুরীদেব প্রকাণ্ড আঙিনায় সামিয়ানার তলে মধু অধিকারীর যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে—"অভিমন্যু বধ" পালা। আসরে তিলধারণের স্থান নাই। মাঝখানে যাত্রার আসর; এক পাশে গালিচার উপরে উত্তরীয়মাত্র শোভিত উদয়নারায়ণ; তাঁর চারিপার্শ্বে গণ্যমান্য অতিথিগণ; ছোট বড় জমিদার, জোতদার, আত্মীয়-স্বজন; এক ধারে দর্পনারায়ণ। রূপার রেকাবে করিয়া পান, মশলা বিলি করা হইতেছে। বয়স্ক লোকেরা কর্তাকে আড়াল করিয়া তামাকু টানিতেছে; গোলাব-পাশ হইতে গোলাব জল ছিটান

হইতেছে। মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া ভৃত্যেরা বড় বড় হাত-পাখা লইয়া বাতাস করিতেছে, আর যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে উত্তরা-অভিমন্যুর বিদায়-সম্ভাষণ চলিতেছে; যাত্রাদলের একটি ছোট ছেলে করুণ-কণ্ঠে আসন্ন বিদায়ের বেদনাকে ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া গাহিতেছে—

…তুমি মম, সুধা সম !…

এমন সময়ে রক্তদহের জমিদার পরন্তপ রায় আসরে প্রবেশ করিল; দেওয়ানজী যথাযোগ্য সমাদর করিয়া তাকে বসাইলেন। পরন্তপকে দেখিয়া দর্পনারায়ণ চমকিয়া উঠিল। এ লোকটা আসিল কোথা হইতে!

সে শুনিয়াছিল বিদেশী এক জমীদারের সঙ্গে ইন্দ্রাণীর বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু সেই বিদেশী জমিদার যে ওই হতভাগাটা, তাহা দর্পনারায়ণের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল! তার ধারণা হইল, সে যে বনলালাকে বিবাহ করিয়াছে, পরন্তপ কোন সূত্রে তাহা জানিয়াছে, সেই জন্যই তাকে অপমানিত করিবার জন্য সে এই উৎসবে আসিয়াছে।

দর্পনারায়ণকে দেখিয়া পরন্তপ বিস্মিতও হইল না, নূতন করিয়া রুষ্টও হইল না! সে জানিত না, বনমালাকেই দর্পনারায়ণ বিবাহ করিয়াছে, আর জোড়াদীঘির চৌধুরীবাড়ীতে যে দর্পনারায়ণের সাক্ষাৎ মিলবে, ইহার মধ্যে নূতনত্ব কোথায়! দুইজন দুইজনকে লক্ষ্য করিতে লাগিল, কেহ কারও সঙ্গে বাক্যালাপ করিল না।

দর্পনারায়ণের মনে আর একটা ব্যথার গুপ্ত-কাঁটা খচ্ খচ্ করিয়া ফুটিতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল না, এই নূতন ক্ষোভ কিসের জন্য! যদি সে ভাল করিয়া নিজের মনের মধ্যে তাকাইত, তবে বুঝিতে পারিত, ইহা ঈর্ষা; যে লোকটাকে সে সব চেয়ে ঘৃণা করে, যাকে সে নরাধম মনে করে, তারই সৌভাগ্যের ঈর্ষ্যা! শেষে ওই হতভাগাটা ইন্দ্রাণীকে বিবাহ করিল! নিজে সে ইন্দ্রাণীকে বিবাহ করে নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া আর কেহ করিবে কেন? আর কেহ যদি করিল, সে পরন্তপ ব্যতীত অন্য লোক হইল না কেন?

তার মনে হইল পরন্তপ এ দিক দিয়াও তার উপরে এক হাত লইয়াছে। ইন্দ্রাণীকে না পাইবার দুঃখ অত্যন্ত তীব্র ভাবে সে অনুভব করিতে লাগিল।

রাত্রি অনেক হইলে দেওয়ানজী পরন্তপকে আহারের জন্য লইয়া গেল। আহার শেষ করিয়া পরন্তপ বিদায় লইয়া বাড়ী রওনা হইল। যখন দেউড়ী অতিক্রম করিয়া একটু নির্জ্জন ও অন্ধকার স্থানে আসিয়াছে, অমনই সে পৃষ্ঠ-দেশে কার স্পর্শ অনুভব করিয়া ফিরিয়া চাহিল; দেখিল দর্পনারায়ণ। এক মুহূর্ত্তের জন্য দুইজনে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। দর্পনারায়ণ প্রথমে কথা বলিল,—আপনার সঙ্গে আমার একটা বোঝাপাড়া বাকি রয়ে গিয়েছে।

পরন্তপ বলিল, সে অভিযোগ তো আমার, সেদিন আমি মত্ত অবস্থায় ছিলাম।

— আজ বুঝি তার প্রতিশোধ দিতে এসেছিলেন!

—প্রতিশোধ দিতে আর পারলাম কই? হলে মন্দ হত না!

দর্পনারায়ণ বলিল, সে জন্য দুঃখ কেন? তলোয়ারের হাত ঠিক আছে তো? না, জমিদারী পেয়ে এখন বাবু হয়ে উঠেছেন?

—তলোয়ার পেলে বোঝা যেত।

—তবে আসুন আমার সঙ্গে।—এই বলিয়া তাকে অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া দর্পনারায়ণ চলিতে লাগিল।

সরু, বাঁকা অন্ধকার পথ দিয়া, লোকজন এড়াইয়া চলিতে চলিতে সে চৌধুরী-বাড়ীর প্রাচীনতম যে অংশটাতে বাস্তুর বাগান, সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। বলিল, একটু অপেক্ষা করুন সে দ্রুত অন্তর্দ্ধান করিল এবং একটু পরেই দুইখানা কোষমুক্ত তলোয়ার, একটি মশাল, চকমকি পাথর ও শোলা লইয়া ফিরিয়া আসিল। চকমকি ঠুকিয়া মশাল জ্বালিল; মশালের পীত আলোকে পরন্তপ দেখিল, জায়গাটা জঙ্গলে পূর্ণ, নির্জ্জন, মারিয়া ফেলিলেও কেহ জানিতে পারিবে না। দর্পনারায়ণ মশালটাকে মাটিতে পুঁতিয়া দিল; মশালের আলোকে তলোয়ার ঝকমক করিয়া উঠিল।

এই সব কাজ করিবার পরে দর্পনারায়ণ বলিল—এইবার—

পরন্তপ মালকোচা মারিয়া, চাদর কোমরে জড়াইয়া একখানা তলোয়ার গ্রহণ করিল; অন্য খানা দর্পনারায়ণ উঠাইয়া লইল।

তখন সেই গভীর রাত্রিতে, নির্জ্জন বনকল্প স্থানে, মশালের আলোকে দুই শত্রুতে, দুই প্রতিদ্বন্দীতে, দুই বুদ্ধিভ্রষ্ট ব্যক্তিতে, মৃত্যুপণ করিয়া অসি চালনা করিতে লাগিল। অস্ত্রে অস্ত্রে লাগিয়া ঝন্‌ঝনা উঠিতে লাগিল; মশালের আলোকে চঞ্চল তলোয়ারে বিদ্যুৎ সঞ্চার করিতে লাগিল; দুইজনের পরিশ্রমের নিঃশ্বাস দ্রুততর হইয়া উঠিতে লাগিল। দুই জনেই সমান নিপুণ। দুইজনে ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া, চোখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করিয়া, কপালে ঘাম ঝরাইয়া অসি চালনা করিতে লাগিল, কিন্তু কেহ কাউকে স্পর্শ করিতে পারিল না! যখন অনেকক্ষণ এইরূপ চলিয়াছে, হঠাৎ সেই বনপ্রান্ত হইতে একটা কঠোর শুষ্ক অট্টহাস্য উত্থিত হইল; পরন্তপ চমকিয়া উঠিতেই পা পিছলাইয়া গেল; সে পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেল; পড়িবার সময়ে মশালটার উপরে পড়িল, মশাল নিবিয়া বন অন্ধকার হইল। সে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে দর্পনারায়ণ গিয়া তাকে চাপিয়া ধরিল; পরন্তপ বুঝিল, পতনের বেগে তার হাতের তরবারি কোথায় ছিটকাইয়া পড়িয়াছে, দর্পনারায়ণের উদ্যত তরবারি শত্রুর উপর পড়িল না, হঠাৎ তার ইন্দ্রাণীর মুখ মনে পড়িয়া গেল; ইন্দ্রাণীর স্বর্ণমুকুরের মত উজ্জ্বল-চিক্কণ, প্রতিভা ও সৌন্দর্য্যের চিরলীলাস্থল, অপূর্ব্ব সুন্দর মুখ! সে তলোয়ার ফেলিয়া দিয়া পরন্তপকে হাতে ধরিয়া তুলিল—বলিল—উঠুন!

পরন্তপ বলিল—কিসের শব্দে হঠাৎ চমকে গিয়েছিলাম তাই—আমার তলোয়ারখানা—

—দরকার নাই।

—কেন?

—আজ আর নয়—

পরন্তপ বলিল—তবে কি আর এক দিন হবে?

দর্পনারায়ণ শুধু বলিল—দেখা যাবে।

কিন্তু দুই জনেই বুঝিল ইহাই শেষ নয়; পলাশীর মাঠে যার সূত্রপাত, রক্তপাত বিনা তাহা শান্ত হইবে না। দর্পনারায়ণকে অনুসরণ করিয়া পরন্তপ চলিতে লাগিল: দেউড়ীর কাছে আসিয়া পরন্তপকে পথে তুলিয়া দিল; দুইজনে নীরবে পরমতম শত্রুর কাছে বিদায় লইল।

৮

ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি। রক্তদহে বড় ধুম করিয়া বিশ্বকর্ম্মা পূজা হয়। কারণ এই গ্রামে দুই তিন শত ঘর কামারের বাস। সেদিন তারা যন্ত্রপাতি ধুইয়া মুছিয়া বিশ্বের সবচেয়ে বড় কর্ম্মকার বিশ্বকর্ম্মার পূজা করে; বিকাল বেলায় সকলে মিলিয়া জমিদার-বাড়ী যায়; সেখানে এই উপলক্ষে তাদের বার্ষিক নিমন্ত্রণ, পেট ভরিয়া খায়; আহারের পরে নারিকেল কাড়াকাড়ি খেলা হয়।

পূজার একটা নারিকেল দুই পক্ষের মধ্যে ছুঁড়িয়া দেওয়া হয়—মাঝখানে একটা সিমানা থাকে, যে পক্ষ নিজেদের সীমানায় নারিকেলটি লইয়া যাইতে পারে, তাদের জয় হয়। এই খেলা রক্তদহে অনেক বছর হইতে হইয়া আসিতেছে, কেহ তাদের হারাইতে পারে নাই। রক্তদহের লোকেরা আশে পাশের সব গাঁয়ের লোকদের এই খেলায় হারাইয়া দিয়াছে। এক একবার তারা এক একটা গ্রামকে আহ্বান করে, কিন্তু কেহই জিতিয়া যাইতে পারে নাই।

এবার তারা জোড়াদীঘির লোকদের এই উপলক্ষ্যে আহ্বান করিয়াছে; জোড়াদীঘিকে তারা বড় এ উপলক্ষ্যে আহ্বান করে না, আগে দু' একবার করিয়াছে, তারা জিতিতে পারে নাই। এবারের আহ্বানের বিশেষ একটু অর্থ আছে।

রক্তদহের লোকেরা জোড়াদীঘির লোকদের উপর হাড়ে চটিয়া গিয়াছে; জোড়াদীঘিকে তারা বিশ্বাসঘাতক মনে করে; জোড়াদীঘির জমিদার তাদের জমিদার-কন্যাকে বিবাহ করিবে অঙ্গীকার করিয়া সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে, এই অপমান তারা কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই।

যখন তারা শুনিল, ইন্দ্রাণীর পরিবর্ত্তে দর্পনারায়ণ অপরিচিতা এক মেয়েকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিয়াছে, তখন খুব এক চোট প্রাণ ভরিয়া হাসিয়াছিল, কিন্তু রাগ তাতে যায় নাই। তাই তারা স্থির করিয়াছে, জোড়াদীঘিকে নারিকেল কাড়াকাড়ি খেলায় হারাইয়া দিয়া ইহার প্রতিশোধ লইবে।

ইহাতে জমিদারেরও ইঙ্গিত আছে। ইন্দ্রাণী রক্তদহের প্রধানদের ডাকিয়া বলিয়া দিয়াছে, জোড়াদীঘিকে পরাজয় করিতে পারিলে তাদের সকলকে নূতন ধুতি-চাদর পার্ব্বণী দিবে। ইন্দ্রাণী আরও বলিয়াছে, পশ্চিমের মাঠে দুইদল একত্র হইলে ছাদের উপর হইতে সে নিজের হাতে নারিকেল ছুঁড়িয়া দিবে। রক্তদহের প্রধানেরা ইন্দ্রাণীকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া গিয়াছে—ইন্দ্রাণীর ইচ্ছা সকলকে জানাইয়া দিয়াছে, তাদের উৎসাহের আর সীমা নাই।

জোড়াদীঘি রক্তদহের আহ্বান গ্রহণ করিল। জোড়াদীঘির প্রধানেরা রক্তদহে রওনা হইবার আগে চৌধুরী-বাড়ীতে দেখা করিতে গেল। দর্পনারায়ণ সমস্ত শুনিয়া বুঝিল—ইহা তাকেই অপদস্থ করিবার চেষ্টা এবং বুঝিল ইহা পূর্ব্বাভাস মাত্র সহজে এ বহ্নি নিভিবে না। সে সকলকে উৎসাহ দিল বড় রকম বকশিষ কবুল করিল এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিল। চৌধুরী-বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া অগণিত লোক বিভিন্ন পথ দিয়া রক্তদহের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল।

রক্তদহের জমিদার-বাড়ীর পশ্চিমের দিকে যে বিস্তীর্ণ মাঠের কথা এর আগে উল্লেখ করিয়াছি, সেই মাঠে লোক জমিতে আরম্ভ করিল। অপরাহ্নে নারিকেল কাড়াকাড়ি আরম্ভ হইবে, কিন্তু দুপুর হইতেই ভিড় সুরু হইল।

রক্তদহের লোকেরা গ্রামেই থাকে, তারা আগেই আসিয়াছে ক্রমে দলে দলে জোড়াদীঘির লোক আসিতে লাগিল। দুইদল দুইদিকে দাঁড়াইল, কিন্তু লোকের সংখ্যা শেষে এতই বাড়িয়া গেল যে, রক্তদহে জোড়াদীঘিতে আর ভেদাভেদ রহিল না।

ভাদ্র মাস, কাজেই মাথার উপর দিয়া কাঠফাটা রৌদ্র ও ছাগল-তাড়ানো বৃষ্টি চলিতে লাগিল, তাতে কারও ভ্রূক্ষেপ নাই; মাঝে মাঝে উভয় গ্রামে বচসা ও কলহ হইতে লাগিল—কিন্তু সকলেই সংযত হইয়া রহিল। মানুষ বিনা সূত্রে মারামারি করে না—ইহাতেই বোধ করি মনুষ্যত্ব। ফুটবল খেলায় যেমন নিরীহ চর্ম্ম-গোলকটি উপলক্ষ করিয়া মারামারি ও নাক ফাটান রীতি, এখানেও তারা তেমনি নিরেট নারিকেলটির অপেক্ষায় রহিল—সেটি জনতার মধ্যে পড়িলেই তাণ্ডব সুরু হইয়া যাইবে।

জমিদার-বাড়ীর দেউড়ীতে তৃতীয় প্রহরের ঘণ্টা বাজিতে দেখা গেল—বিস্তৃত মাঠ জনসমাগমে পূর্ণ;—ছাদের উপর হইতে নীচে চাহিলে দেখা যায় কেবল কালো মাথা; সম্মুখে, দূরে, বামে, দক্ষিণে কেবল কালো মাথা আর মাঝে মাঝে ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত ব্যগ্র মুখের কালো রং, কটা রং আর তার নীচেই শাদা চাদর ও কাপড়ের আভাস।

কিছুক্ষণ পরে চাঁপা ঠাকুরাণীকে সঙ্গে করিয়া ইন্দ্রাণী ছাদের উপরে আসিল। ইন্দ্রাণীকে দেখিয়া জনতার কোলাহল হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া গেল—এক মুহূর্ত্ত মাত্র, তার পরেই আবার গোলমাল সুরু হইল। ইন্দ্রাণীর আবির্ভাবের কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ পুরোহিত একটি সিঁদুরমাখা নারিকেল লইয়া উপস্থিত হইলেন; ইন্দ্রাণী নারিকেলটি লইল: চাঁপা তিনবার শঙ্খধ্বনি করিল, তখন ইন্দ্রাণী মাল্যোপম হাত দুইখানি লীলায়িত করিয়া সেই সিঁদুরমাখা নারিকেলটি নিম্নে নিক্ষেপ করিয়া দিল।

অমনি সেই বৃহৎ জনতা বিকট চীৎকার করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল, পাড়িবামাত্র নারিকেল কোথায় অন্তর্হিত হইল। তখন মারামারি,

কাড়াকাড়ি, হাতাহাতি পড়িয়া গেল—সকলেরই বিশ্বাস, তার কাছে ছাড়া অন্যের কাছে নারিকেল আছে, কিন্তু কোথায় আছে কেউ জানে না। যে যাকে পারিতেছে, আক্রমণ করিতেছে, মারিতেছে, আবার ছাড়িয়া অন্যকে ধরিতেছে। ক্রমে সেই জনতা আট দশটি দলে আপনিই বিভক্ত হইয়া গেল—কোথায় নারিকেল! মাঝে মাঝে এক একবার সন্তরণে অক্ষম মজ্জমান ব্যক্তির মুণ্ডের মত নারিকেলটি উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া দেখা দিতেছে, পর মুহূর্ত্তেই আবার কোথায় তলাইয়া যাইতেছে।

ছাদের উপর হইতে ইন্দ্রাণী, চাঁপা, জমিদার বাড়ীর লোকজন নিম্নের তাণ্ডব দেখিতে লাগিল। ছাদের উপর দাঁড়াইলে মাঠের শেষে নদীর জল দেখা যায়—ওই নদীই রক্তদহের সীমানা; জোড়াদীঘির লোকেরা যদি নারিকেল নদীর ওপারে লইয়া যাইতে পারে, তবে তাদের জয়। ইন্দ্রাণীরা বুঝিতে পারিল না, কোন্ দল জিতিতেছে, এত অল্প সময়ে বোঝা সম্ভব নয়। যারা লড়িতেছে তারাও জানে না কোন্ দলের জয় হইবে; সত্য কথা বলিতে তারা আরও কম জানে। কিন্তু এটুকু তারা বুঝিতে পারিতেছে যে, আজ দুই পক্ষই মরীয়া।

এই বিপুল তাণ্ডবে কারও চাদর উড়িয়া গেল, কারও কাপড় ছিঁড়িল কারও চুল ছিঁড়িল, অনেকেই আহত হইয়া পলাইতে আরম্ভ করিল।

এই আট দশটা উপদলের কোনখানে যে নারিকেল কেহ জানে না, তবে প্রত্যেক দলেরই বিশ্বাস তাদের জনতার কেন্দ্রেই সেই চরম ফল বর্ত্তমান। কোন দেবতা যদি মানুষের ইতিহাসের গতিকে এমন ভাবে উপর হইতে লক্ষ্য করেন, তবে তিনি মনে করিবেন, এই পৃথিবীর প্রাঙ্গণে নানাজাতির মধ্যেও এমনই এক নারিকেল কাড়াকাড়ি খেলা চলিতেছে। প্রত্যেক জাতিই মনে করে, তারাই জীবনের সত্যকে ধরিতে পারিয়াছে, তাদেরই তাহা দৈবসম্পত্তি, অন্য জাতি তা' কাড়িয়া লইতে না পারে ইহাই তাদের মৃত্যুপণ প্রয়াস।

অনেকক্ষণ পরে ইন্দ্রাণীরা আবার ছাদের উপর হইতে দেখিল, জনতা যেন ধীরে ধীরে, তিলে তিলে, প্রায় অলক্ষ্য গতিতে নদীর দিকেই চলিয়াছে; তারা বুঝিল, জোড়াদীঘির দল জিতিতেছে। ইন্দ্রাণীর মুখ কালো হইয়া গেল—পরন্তপ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া রক্তদহের লোকদের সাবধান করিয়া দিবার জন্য দুইজন বরকন্দাজ পাঠাইয়া দিল। কিন্তু জনতা ক্রমেই নদীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

মাঠের সম্মুখের অংশে এখন আর লোক নাই, কেবল ছিন্ন-চাদর, ছিন্ন-কাপড়, আর সহস্র মনুষ্যের পদাঘাতে কর্দ্দমাক্ত ভূমি; মাঝে মাঝে, এখানে ওখানে আহত ও পরিশ্রান্ত ব্যক্তিরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে। হঠাৎ বিরাট এক উল্লাস-ধ্বনিতে চমকিয়া চাহিয়া ইন্দ্রাণীরা দেখিল জনতা গিয়া নদীর জলে পড়িয়াছে; দেখিতে দেখিতে নদীর জল সহস্র নরমুণ্ডে কালো হইয়া গেল; জোড়াদীঘির লোক নারিকেল লইয়া জলে ঝাঁপ দিয়াছে।

জলের মধ্যে হাতহাতি চলিল—কিন্তু এখন জোড়াদীঘির জনসংখ্যাই বেশী—রক্তদহের দল ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। যারা সাঁতার দিতেছিল, তারা ক্রমে পরপারে উঠিতে আরম্ভ করিল;—প্রায় অধিকাংশ জোড়াদীঘির লোক পরপারে উঠিয়াছে, তখন একজন নিজের চাদর হইতে নারিকেলটি খুলিয়া দুইহাতে তুলিয়া ধরিয়া পরপারবর্ত্তী রক্তদহের অধিবাসীদের দেখাইল—সকলে মিলিয়া বিরাট জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। রক্তদহের লোকেরা আর্ত্তনাদ করিয়া নদীর তীরে বসিয়া পড়িল। কিন্তু একেবারে বসিয়া থাকিল না, তখনও জোড়াদীঘির অনেক লোক এ পারে ছিল, তারা উঠিয়া সেই হতভাগ্যদের পিটিতে সুরু করিল। হাত দিয়া, পা দিয়া, লাঠি দিয়া, যে যা দিয়া পারিল মারিল। জোড়াদীঘির অল্পসংখ্যক হতভাগ্যেরা যারা পারিল, নদীতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বাঁচাইল, যারা পারিল না, নিরুপায় ভাবে মার খাইতে খাইতে বসিয়া পড়িল, অনেকেরই মাথা ফাটিল; অনেকেরই হাত-পা ভাঙ্গিল।

সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই সব মীমাংসা হইয়া গেল—ইন্দ্রাণী মুখ লাল করিয়া, ক্রমে কালো করিয়া ছাদ হইতে অন্তর্হিত হইল। সে দিন রক্তদহের অধিকাংশ ঘরেই সন্ধ্যাবাতি জ্বলিল না।

৯

সেবার বিজয়া-দশমীর বিসর্জ্জনের সময়ে এক কাণ্ড ঘটিল; লোকে বুঝিল, বিষ সারা শরীর ব্যাপ্ত করিয়াছে, ইহার প্রতিকার শীঘ্র ও সহজে হইবার নয়।

বহুকাল হইতে একটি প্রথা চলিয়া আসিতেছে যে, জোড়াদীঘির আশে পাশে চারিদিকের বহু গ্রামের দুর্গা প্রতিমা বিসর্জ্জনের জন্য জোড়াদীঘির ঘাটে নৌকা-যোগে আসিত। জোড়াদীঘির চৌধুরী বাড়ীদের প্রতিমা তো থাকিতই—তা ছাড়া ছোট বড়, মাঝারি নানা আকারের প্রায় পঞ্চাশ-ষাটখানি প্রতিমা জুটিত,—তার মধ্যে রক্তদহের প্রতিমাও একখানি।

উপযুক্ত লগ্ন উপস্থিত হইলে সকলের আগে জোড়াদীঘির চৌধুরীদের প্রতিমা বিসর্জ্জিত হইত, তারপরে অন্য সকলের। জোড়াদীঘির প্রভাব, প্রতিপত্তি ও বংশের প্রাচীনতাই বোধ করি ইহার কারণ। এই রকম বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, কতদিন কেহ বলিতে পারে না, এমন কি অশীতিপর বৃদ্ধেরাও নয়।

সেবারও যথা নিয়মে দূর-দূরান্তের প্রতিমা জোড়াদীঘির ঘাটে আসিয়া ভিড়িতে লাগিল; জোড়াদীঘির অত্যুচ্চ প্রতিমা বাইশ জন জোয়ান জেলের স্কন্ধে বাহিত হইয়া জোড়া-দেওয়া নৌকার উপর আসিয়া উঠিল; দেখিতে দেখিতে প্রশস্ত নদী নানা বর্ণের নানা আকারের প্রতিমায় ভরিয়া গেল—নদীর জল বিচিত্র ছায়াপাতে খচিত হইয়া উঠিল।

এই উপলক্ষে জোড়াদীঘির নদীর দুই তীরে প্রকাণ্ড মেলা বসিত; ছেলে বুড়ো, যুবক-যুবতী, হিন্দু-মুসলমানে প্রায় পনেরো বিশ হাজার লোক

জমিয়া যাইত। সেবারও তেমনই মেলা বসিয়াছে; নদীর পারে রাশি রাশি আখ, পাতার বাঁশী, মাটির রংকরা পুতুল আর মিঠাইয়ের দোকান। সকলেরই পরণে নূতন কোরা-কাপড়, অনেকের গায়ে চাদর, কিন্তু অধিকাংশই খালি গায়ে; বিবাহিত মেয়েদের সিঁথিতে চওড়া করিয়া সিঁদুরের দাগ—মুখে হাসি ও কৌতূহল।

নদীতে প্রতিমার নৌকা ছাড়াও অসংখ্য নৌকা; অনেকগুলি বড় বড়, তাতে রং-করা হাঁড়ি, পাতিল, কলসী; আখের নৌকাও আছে; বড় বড় পান্সীতে ছইয়ের উপরে গ্রামান্তর হইতে আগত দর্শকের দল; যাহাদের একটু অবস্থা ভাল সতরঞ্চি পাতিয়া বসিয়া গান-বাজনা করিতেছে; হোঃ হোঃ করিয়া হাসিতেছে, মাঝে মাঝে সিদ্ধি ও সুরা পান করিতেছে। বহু ছিপ-নৌকা বাচ খেলিবার জন্য আসিয়াছে; আঠার, কুড়ি, ত্রিশ জন করিয়া যুবক এক সঙ্গে একতালে বৈঠা মারিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারাইয়া দিবার জন্য প্রাণপাত করিতেছে; মাঝে মাঝে বড় নৌকায় বাধা প্রাপ্ত হইয়া নৌকা ডুবিতেছে—সকলে সাঁতরাইয়া তীরে উঠিতেছে, তাহাতেও আনন্দ কম নয়।

একখানি প্রকাণ্ড বজরায় জোড়াদীঘির বাবুরা উপবিষ্ঠ; দর্পনারায়ণ এবং তাঁর শরীক ভাই রঘুনাথ ও বিশ্বনাথ; দুইজন বরকন্দাজ খোলা তলোয়ার ও ঢাল লইয়া পাহারা দিবার ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান আর আলিবর্দ্দি সর্দ্দার প্রকাণ্ড পাগড়ী বাঁধিয়া বন্দুক হাতে করিয়া বাবুদের নিকট উপস্থিত। অন্যান্য বার স্বয়ং উদয়নারায়ণও আসিতেন—কিন্তু এবার তিনি আসেন নাই, ক্রমেই তিনি অশক্ত হইয়া পড়িতেছেন; এবার তিনি চৌধুরী বাড়ীর চার তলায় চিলেকোঠার কাছে দাড়াইয়া প্রতিমা বিসর্জ্জন দেখিবেন বলিয়াছেন। তাঁর সঙ্গে বনমালাও আছে। সত্য কথা বলিতে কি, চারতলা হইতে নদী দেখা যায় না, তবে কোলাহল শোনা যায়, গাছপালার মাথাগুলি দেখা যায়।

নদীতে আর একখানি বজরায়, সেখানিও বড়, রক্তদহের জমিদার পরন্তপ

ন্যায়—এবারে রক্তদহের জাঁমজমক একটু বেশী; বহুদিন রক্তদহের জমিদার আসিতে পারেন নাই, জমিদার কেহ ছিল না, একমাত্র মালিক ছিল ইন্দ্রাণী, স্ত্রীলোক তো প্রতিমার সঙ্গে আসিতে পারে না, কাজেই তার প্রতিনিধি স্বরূপ দেওয়ানজী আসিতেন; দেওয়ানজী আসিয়া জোড়াদীঘির বাবুদের বজরায় উঠিয়া দেখা-সাক্ষাৎ করিতেন—উদয়নারায়ণকে বিজয়ার প্রণাম করিয়া তবে বাড়ী ফিরিতেন। এবার সব অন্য রকম; রক্তদহের বজরা জোড়াদীঘির বজরার কাছে ভিড়িল না, কোন তরফ হইতে কোনরূপ সম্ভাষণ হইল না; প্রত্যেকে নিজের নিজের বজরায় সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল।

ক্রমে সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসিল—বিসর্জ্জনের জন্য প্রতিমাগুলি ঘাটের কাছে আসিয়া জমিতে লাগিল; প্রতিমার অঙ্গ হইতে তাঁতের ধুতি ও শাড়ী খোলা আরম্ভ হইল; ফুল, বেলপাতা ও ঘট সংগৃহীত হইয়া নৌকার এক-পাশে স্তূপীকৃত হইল; ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজে নিকটবর্ত্তী গাছের ডাল হইতে কাকের দল চীৎকার করিয়া বারে বারে উড়িতে আরম্ভ করিল—মেলার সেই পনের বিশ হাজার লোক বিসর্জ্জনের চরম মুহূর্ত্তের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। জোড়াদীঘির পুরোহিত ভট্টাচার্য্য প্রতিমার নৌকায় ছিলেন, সঙ্গে বাণীবিজয়ও ছিল।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—বাণী, সময় তো আসন্ন। বাণী বড় ব্যস্ত ছিল, সে বলিল—আজ্ঞে প্রতিমার বস্ত্রাদি সংগ্রহ করেছি—এখন আদেশ দিতে পারেন, কিন্তু একটি বিষয়ে বড়ই গোল বেধেছে। ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্যাপার কি?

বাণীবিজয় বলিল—আজ্ঞে, এই নাস্তিককে (এই বলিয়া সে প্রতিমা বাহক জেলের সর্দ্দারকে দেখাইয়া দিল) কিছুতেই বোঝাতে পারছি না যে, কলা-বউয়ের শাড়ী পুরোহিতের প্রাপ্য—

তাকে অর্দ্ধপথে থামাইয়া দিয়া জেলের সর্দ্দার বলিল—ঠাকুর আজ

বছরকার দিনে মিথ্যা কথা বল না। ভট্টাচাজ মশায়, শাড়ী আপনার পাওনা হলে আমি নেব কেন? ঠাকুর মশাই বলছিল শাড়ীখানা তার পাওনা, শাস্তরে নাকি লিখেছে!

বাণীবিজয় দমিবার পাত্র নয়, সে হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া উঠিয়া (তার পেটে আজ প্রচুর পরিমাণে সিদ্ধি পড়িয়াছে) বলিল, রামকান্ত শাস্ত্র পড়নি বলেই এমন কথা বলছ! শাস্ত্র পড়লে জানতে যে বিষ্ণু সেই কৃষ্ণ; যে রাম সেই রাবণ, বাবা রামকান্ত, গুরু-শিষ্যে কোন ভেদ নাই!

ভট্টাচার্য্য দেখিলেন, শাড়ীখানা বুঝি কূট-তর্কের ফাঁক দিয়া বাণীবিজয়ের হাতে গিয়া পড়ে. তিনি বলিলেন—বাণীবিজয়, তুমি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছ, তোমার সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত!

ইহা শুনিয়া বাণীবিজয় ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল বলিল শাস্ত্র-পিতা, তোমার মুখে এমন দুরূহ বাণী! এ প্রাণ আর রাখব না। রাঙা মায়ের সঙ্গে এ পোড়া-দেহ নদীর জলে যাক্। এই বলিয়া সে ছো মারিয়া রামকান্তের হাত হইতে শাড়ীখানা লইয়া নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ভট্টাচার্য্য হায় হায় করিয়া উঠিলেন। রামকান্ত তাঁকে শান্ত হইতে বলিয়া বলিল—ঠাকুরের পেটে আজ মহাদেবের প্রসাদ কিছু বেশী পড়েছে, জল থেকে উঠলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ভট্টাচার্য্য যেন আপন মনেই বলিল—তা তো যাবে, কিন্তু শাড়ীখানা গেল।

জোড়াদীঘির নৌকাতে যখন এই সব ঘটনা চলিতেছে, তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে রক্তদহের দল এক কাণ্ড করিয়া বসিল। রক্তদহের জমিদারের ইঙ্গিতে জোড়াদীঘির প্রতিমা বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে, দক্তদহের প্রতিমা জলে নিক্ষিপ্ত হইল।

১

এই ব্যাপার দেখিয়া সুবৃহৎ জনতার কোলাহল মুহূর্ত্তের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া গেল ; তারা যেন ইহা দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না—নিজেদের চক্ষুকে যেন তাদের অবিশ্বাস হইল ! সামাজিক এই রীতি-বিপর্য্যয় তাদের কাছে চন্দ্র-সূর্য্যের পথচ্যুতির মত অসম্ভব, অবিশ্বাস্য কাণ্ড !

শুধু এক মুহূর্ত্ত মাত্র, তার পরেই যেন নরকের সহস্র দ্বার খুলিয়া গেল ! কে কোথা হইতে ইঙ্গিত করিল জানা গেল না, কেহ বলে জোড়াদীঘির বাবুদের নৌকা হইতেই বন্দুকের গুলিতে হুকুম হইল, কেহ বলে রক্তদহের বজরা হইতে আদেশ আসিল, কেহ বলে তাদের পিছন হইতে কে যেন উচ্চকণ্ঠে হুকুম করিল, কিন্তু সকলেই বলে তারা পিছন হইতে বিষম চাপ অনুভব করিল, সেই বেগে তারা আগুয়ান হইয়া আসিল। তখন এক বিষম ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি, মারামারি বাধিয়া গেল। জনতা যেন এক-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—মার, মার রক্তদহের শালাদের মার ! দেখিতে দেখিতে স্তূপীকৃত আখের বাশি লোকের হাতে লাটি হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল ; সেই লাঠি আন্দাজের উপরে ভর করিয়া সকলে রক্তদহের লোকদের মাথা লক্ষ্য করিয়া চালাইতে লাগিল—অল্প সময়ের মধ্যেই আখের টুকরায় মাঠ-ঘাট নদীর জল ভরিয়া গেল ; আখের রাশির চিহ্নমাত্র রহিল না।

জোড়াদীঘির লোকদের রাগিবার কারণ একটি মাত্র নয়, সে দিন নারিকেল কাড়াকাড়ি করিতে ভিন্ গাঁয়ে গিয়া তারা মার খাইয়া আসিয়াছিল, সে কথা ভুলিতে পারে নাই ; আজ নিজেদের গাঁয়ে এমন সুযোগ ছাড়িয়া দিবার পাত্র নয়। ইক্ষুদণ্ডের আয়ু ফুরাইতে না ফুরাইতে রাশি রাশি বংশদণ্ড আসিয়া পড়িল, সেই বংশদণ্ডের সঙ্গে জোড়াদীঘির জমিদারদের লাঠিয়ালরাও আসিল। এই লাঠিয়ালদের দল সকলে জোড়াদীঘিতে থাকে

না—জমিদারির মধ্যে নানাস্থানে ছড়াইয়া থাকে; প্রয়োজন হইলে সদরে আসিয়া জুটে; এখন পূজার সময়ে তারা আমোদ করিতে সদরে আসিয়াছিল, অপ্রত্যাশিত ভাবে কাজ জুটিয়া গেল। কিন্তু শুধু জোড়াদীঘির লোক বা লাঠিয়াল নয়, আশ-পাশের যে-সব গ্রাম হইতে বহু হাজার লোক আসিয়াছিল তারাও জোড়াদীঘির সঙ্গে যোগ দিল; নানাভাবে তারা জোড়াদীঘির বাবুদের কাছে ঋণী; যারা সে ঋণ অনুভব করে না, তারাও যোগ দিল। মারিবার সুযোগ পাইলে কে ছাড়ে, বিশেষ প্রতিপক্ষ যদি দুর্ব্বল হয়।

নদীর ভাটি অংশে রক্তদহের লোকেরা দাঁড়াইয়াছিল; তারা হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া পলাইতে লাগিল; যারা পলাইতে পারিল না, জলে ঝাঁপ দিল; নিস্তার সেখানেও নাই; এইমাত্র যারা ছিপ লইয়া বাচ খেলিতেছিল, তারাও দেখিতে দেখিতে নৌসেনা হইয়া উঠিয়া বৈঠা দিয়া, লগি দিয়া সাঁতারু ব্যক্তিদের মাথায় আঘাত করিতে লাগিল, কেহ ডুব সাঁতার দিয়া পালাইল, কেহ কেহ সত্যই ডুবিল।

দর্পনারায়ণ বজরার উপরে ছিল; সে এই ব্যাপার দেখিয়া আলিবর্দ্দিকে হুকুম করিল—গুলি কর! আলিবর্দ্দি বুঝিল কোন্ দিকে; সে বন্দুক উঠাইয়া গুলি করিল, ঠিক সেই সময়ে নৌকা টাল খাইল, তার হাত কাঁপিয়া গেল। দূরে বজরার ছাদে বসিয়া পরন্তপ বন্ধুবান্ধব লইয়া সিদ্ধি পান করিতেছিল, একটি গুলি আসিয়া সিদ্ধির ভাঁড় ভাঙিয়া দিল; পরন্তপ বুঝিল দ্বিতীয় গুলির অপেক্ষা করিলে মাথা ভাঙিবে; সে ভিতরে গিয়ে হুকুম দিল নৌকা স্রোতে ছাড়িয়া দাও—যে যেখানে আছ দাঁড়ে বসিয়া শীঘ্র পালাও। পরন্তপের বজরা স্রোতের মুখে ছুটিল, কিন্তু বেশী দূর যাইবার পূর্ব্বেই আট দশখানা ছিপ আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিল। প্রথম দু'একখানা ছিপের উপর দিয়া বজরা চলিয়া গেল, কিন্তু সংখ্যা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। পরন্তপ ছাদের উপরে আসিয়া দাঁড়াইল। সৌভাগ্যক্রমে আততায়ীদের হাতে বন্দুক ছিল না, তারা লাঠি ছুড়িয়া মারিতে লাগিল;

বেঙা চৌকিদার প্রভুর পাশে লাঠি লইয়া দাঁড়াইয়া আঘাত বাঁচাইয়া যাইতে লাগিল। বেঙা যে এমন সুদক্ষ লাঠিয়াল পরন্তপ তাহা জানিত না।

ছিপের লোকেরা ক্রমে বজরা বাহিয়া উঠিবার উপক্রম করিল; পরন্তপ পালাইবার সুযোগ খুঁজিতে আরম্ভ করিল, এমন সময়ে কিছু দূরে একখানি নৌকা দেখিতে পাইল, তার মনে হইল সেখানা রক্তদহের লোকদের। তখন পরন্তপ বেঙাকে অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া ছিপ অতিক্রম করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল—বেঙাও সঙ্গে সঙ্গে জলে পড়িল। ছিপের লোকেরা বজরা পাইয়াই সন্তুষ্ট হইল—তাকে আর অনুসরণ করিল না। পরন্তপ ও বেঙা সেই নৌকায় চাপিয়া প্রবল স্রোতের টানে জোড়াদীঘির ঘাট হইতে বহুদূরে গিয়া পড়িল। এদিকে ছিপের লোকেরা বজরায় উঠিয়া বজরার জিনিসপত্র ভাঙ্গিল, তার পরে বজরা ভাঙ্গিল এবং অবশেষে তাহা ডুবাইয়া দিয়া অত্যুল্লাসে চীৎকার করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে দেখা গেল বহু লোক গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে, তাদের সকলেই রক্তদহের নয়; কয়েকজন নিহত হইয়াছে, তাদের দেহ জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। অন্যান্য প্রতিমা বিসর্জ্জন অনুষ্ঠান করিয়া আর হইল না, মারামারির সময়ে স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিমাগুলির অধোগমন ঘটিয়াছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নদীর তীর খালি হইয়া গেল, তখন দেখা গেল সেই শূন্য মাঠ আখের টুকরা, ভাঙা হাঁড়ি-কুড়ি, মাটির পুতুল আর ছিন্ন ধুতি চাদরে কীর্ণ।

নদীর ঘাটে দর্পনারায়ণ, দেওয়ানজী এবং তার শরীক তরফের দুই ভাই বিশ্বনাথ ও রঘুনাথ দাঁড়াইয়াছিল।

দেওয়ানজী বলিল—খোকাবাবু, কর্ত্তা যেন এ কথা জানতে না পারেন, তা হলে আর রক্ষা থাকবে না।

দর্পনারায়ণ বলিল—না, তাঁর কানে উঠিয়ে লাভ নেই। কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই চাপা দিলে চলিবে না। এর একটা প্রতিকার চাই।

রঘুনাথ বলিল—প্রতিকার তো আমাদের হাতেই—

দর্পনারায়ণ বলিল—দেখ, তোমাদের কথাই আমার মনে হচ্ছিল। কাল সকালে একবার তোমরা দুজন আমার বৈঠকখানায় এস; আমরা ছাড়া দেওয়ানজী ও আলিবর্দ্দি থাকবে; কি করা যায় ভাবা যাবে।

রঘুনাথ ও বিশ্বনাথ উভয়েই ইহাতে সম্মতি জানাইল। তখন সকলে বিজয়ার সম্ভাষণাদি প্রথামত নিজেদের মধ্যে সারিয়া অন্যত্র সম্পন্ন করিবার জন্য চৌধুরী-বাড়ীর দিকে চলিল।

১১

রঘুনাথের গলা সকলের উপরে উঠিয়াছে, সে তারস্বরে বলিতেছে—মেজ-দা, তুমি বুঝতে পারছ না, জোড়াদীঘির চৌধুরীদের গালে চুণকালি পড়ল!

মেজ-দা বুঝিতে পারিয়াছে, রঘুনাথ নিজেকে বুঝাইবার জন্যই বলিতেছে, মেজদাকে নয়; নিজেকে নিজে সম্মোহিত করে তোলা তার পক্ষে আবশ্যক।

বিশ্বনাথ অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাবে বলিল—রঘু, আমার বুঝতে বাকী নেই। এখন প্রতিকারটা কি?

রঘুনাথ বাহুবল বোঝে, কিন্তু প্রতিকার বোঝে না। তার ধারণা অপমানিত হইলে যারা প্রতিকার চিন্তা করে তারা ভীরু; নিজে সে চিন্তা করে নাই, কাজেই ব্যহত হইয়া প্রশ্নটাকে বীর রসের সঙ্গে আবৃত্তি করিল—প্রতিকার কি?

এতক্ষণ দর্পনারায়ণ কোন কথা বলে নাই; সে বলিল—সেই কথাই তো চিন্তা করবার সময় এসেছে। অপমানের প্রতিকার যদি কেবল মন্ত্রনা হত, তা হলে এই তিন দিনে তা ক্ষালন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপ'র তো তা নয়!

আসল কথা, আজ তিন দিন ধরিয়া তারা ক্রমাগত শলা-পরামর্শ

করিয়াও এই অপমানের কোন কিনারা করিতে পারে নাই। নানা মুনির নানা মত, তার মধ্যে কোনটা যে গ্রাহ্য, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই।

বৈঠকখানার ফরাসের উপর দর্পনারায়ণ, বিশ্বনাথ, রঘুনাথ ও রামজয় লাহিড়ী; তক্তপোষের নীচে মেঝেতে আলিবর্দ্দি সর্দ্দার। এই পাঁচজনকে লইয়া মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন গত তিন দিন ধরিয়া চলিতেছে; তবে তারা একটি ব্যাপারে সফলতা লাভ করিয়াছে; সেদিনকার ঘটনার কোন সংবাদ উদয়নারায়ণের কানে পৌছায় নাই;

কয়েকমাস আগে হইলে ইহা সম্ভব হইত না। দর্পনারায়ণকে জমিদারির ভার দেওয়ার পর হইতে উদয়নারায়ণ বিষয়কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন; আর বড় একটা বৈঠকখানাতেও আসেন না! তেতালার নিজের ঘরটিতে মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া জীবনের শেষ কয়েকটি দিন কাটাইয়া দিবার তাঁর ইচ্ছা। বিশেষ, দৃষ্টি ও শ্রুতিশক্তি তাঁর ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে; নেহাৎ পরিচিত লোককেও প্রথমে চিনিতে পারেন না; দর্পনারায়ণের কণ্ঠস্বরও সব সময় তাঁর পক্ষে শোনা অসম্ভব! তিনি এই অপমান জানিতে পারিলে এত দিন যাহা হয় একটা কাণ্ড করিয়া বসিতেন। রঘুনাথের কথাই সত্য হইত, প্রতিকার চিন্তা করিয়া তিনি মন্ত্রনা-সভা বসাইতেন না; রঘুনাথ নিজেও ইহা জানিত, তাই সে বলিল,—আজ বড়কর্ত্তা অথর্ব্ব হয়ে পড়েছেন বলেই তোমরা এত মন্ত্রনা করবার সময় পাচ্ছ। কিন্তু মনে রেখ লোহা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে হাতুড়ি মেরে লাভ নেই।

দর্পনারায়ণ বলিল—রঘুনাথ, তুমি কেন মনে কচ্ছ লোহা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। এ তাপ সহজে যাবার নয়, জোড়াদীঘি বা রক্তদহের এক বংশ থাকতে নয়।

সত্য কথা বলিতে কি, দর্পনারায়ণ ও পরন্তপের গুপ্ত রহস্য এরা কেউ

জানে না, তাই ব্যাপারটাকে একটা সাময়িক উৎপাত বলিয়া মনে করিতেছিল।

রঘুনাথ বলিল—আবার ঠাণ্ডা হতে কি লাগে! তিন দিন তিন রাত পেরিয়ে গেল। আশে-পাশের গাঁয়ের লোক সব যে মুখ 'চেপে হাসছে! বলছে, জোড়াদীঘির চৌধুরীদের আর সেদিন নেই। বলছে, থাকত কর্ত্তার বয়স, আর থাকত স্বরূপ সর্দ্দার। তারপরে খানিকটা দম ধরিয়া থাকিয়া বলিল—তোমাদের তো শুনতে হয় না, আমার যে লজ্জায় মাথা কাটা গেল।

দেওয়ান রামজয় লাহিড়ী এতক্ষণ নির্ব্বাক শ্রোতা মাত্র ছিল, এবার বলিল—ছোটবাবু, আসল কথাটা তোমরা ভুলে গিয়েছ; দুটো প্রস্তাব প্রথমে হয়েছিল—এখন ঠিক কর, তার মধ্যে কোনটা কর' উচিত।

এই বলিয়া সে প্রস্তাব দুইটির বর্ণনা সুরু করিল—আমাদের প্রথম প্রস্তাব ছিল যে, রক্তদহের লক্ষ্মীপুরের হাট লুট 'করতে হবে; আর দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল হাট-ঘাট নয়, একেবারে খাস রক্তদহের জমিদার-বাড়ী চড়াও করে শিক্ষা দিয়ে আসতে হবে। এখন ঠিক কর এর মধ্যে কোনটা করা উচিত। আমরা কেউ বলিনি যে অপমানের শোধ দেওয়া হবে না।

—এর মধ্যে আবার ঠিক করবার কি আছে? তারা আমাদের গাঁয়ে এসে, আমাদের ঘাটে এসে, আগে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়ে চৌধুরী-দের মুখ নীচু করে দিয়ে গেল—আর আমরা যাব তাদের হাট লুট করতে! ডাকাত না কি আমরা!—রঘুনাথ বলিতে বলিতে বসিয়া থাকিতে পারিতেছিল না—বারংবার আসন ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিতেছিল।

দর্পনারায়ণ বলিল—আমার মনে হয় প্রথমে হাট লুট দিয়েই আরম্ভ করা উচিত—তারপরে—

—তারপরে ডাকাত নাম নিয়ে চুপ করে ঘরে বসে থেক।

দর্পনারায়ণ রঘুনাথের উষ্মাতে হাসিয়া ফেলিল, বলিল—চুপ করে বসে থাকার কথাতো বলিনি। বলছিলাম, তার পরে বাড়ী লুট করলেই হবে।

কিন্তু দেখ,—রঘুনাথ বলিল—পরামর্শ করতে করতে ওরা আরও অনেক সর্ব্বনাশ করবে। পরন্তপ রায় সহজ লোক নয়।

রঘুনাথের কথা অসম্ভবরূপে ফলিয়া গেল।

তাদের মন্ত্রণা চলিতেছে, এমন সময়ে চর-রুইমারির প্রধান বৃদ্ধ বদন মণ্ডল কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া হাজির হইল!

হঠাৎ আবার এ কি!

দর্পনারায়ণ প্রথমে কথা বলিল—কি মণ্ডল, ব্যাপার কি?

বদনের কান্না থামেই না। অনেক বার জিজ্ঞাসার ফলে সে বলিল—দাদাবাবু আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।

একসঙ্গে পাঁচজনে জিজ্ঞাসা করিল—কি সর্ব্বনাশ? কি ব্যাপার? কোথায় হল? কে করল?

বদন আবার কাঁদিতে লাগিল।

রঘুনাথের উত্তরই তার উত্তর হইল। রঘুনাথ বলিল,—রক্তদহের জমিদার! কি করেছে বল?

বদন ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। তারপরে তার নিকট হইতে যাহা নির্গত হইল, তার মধ্য হইতে অশ্রু বাদ দিলে ঘটনা এইরূপ দাঁড়ায়।

বদন মণ্ডল ও চার পাঁচজন লোক মিলিয়া চর-রুইমারির খাজনার টাকা সদরে আনিতেছিল। খাজনায় নজরে প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা তাদের সঙ্গে ছিল। রক্তদহের গ্রামের ঘাটে নদী পার হইয়া বিশ্রাম করিতেছিল, এমন সময়ে গ্রামের লোক প্রায় বিশ পঁচিশজন জুটিয়া গেল। প্রথমে তারা ভদ্র ভাবেই টাকাটা চাহিয়াছিল; শেষে মারামারির উদ্যোগ করিল। ইহারাও ছাড়িবার পাত্র নয়, পাঁচজনে লাঠির জোরে পঁচিশজনকে হঠাইয়া দিল! কিন্তু এমন সময় স্বয়ং

রক্তদহের জমিদার আরও প্রায় পঞ্চাশজন লোক লইয়া উপস্থিত হইয়া তাদের নিকট হইতে টাকা কাড়িয়া লইল। তারা অক্ষত থাকিতে দেয় নাই। এই পর্য্যন্ত বলিয়া বদন গায়ের চাদর খুলিয়া দেখাইল, লাঠির আঘাতের কাল-শিরা দাগ।

দর্পনারায়ণ বলিল—তোমার সঙ্গের আর সকলে কোথায়?

বদন বলিল—দেউড়িতে। সকলেরই মাথায় চোট লেগেছে?

দর্পনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিল—আলিবর্দ্দি আজ কি বার রে?

আলিবর্দ্দি এতক্ষণ পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়াছিল; সে প্রভুর মনের ভাব বুঝিয়া বলিল,—শুক্রবার দাদাবাবু। আজই লক্ষ্মীপুরের হাট।

রঘুনাথ এতক্ষণে নিজের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতে চলিয়াছে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া বলিল—আজ শুক্রবারের গো-হাট!

দর্পনারায়ণ বলিল—আলিবর্দ্দি তোর দল ঠিক আছে?

আলিবর্দ্দি বলিল,—সংবাদ দিয়ে তাদের আজ তিন দিন হল আনিয়ে রেখেছি।

—কত লোক আছে?

—দেড় শ হবে; গাঁ থেকেও শ খানেক জুটবে।

—লাঠি কত? শড়কি-ই বা কত?

আলিবর্দ্দি একটু ভাবিয়া বলিল, তা আধাআধি হবে।

—পারবি?

—হুকুম করে' দেখ।

—যা তবে! কাজ সেরে আজ রাত্রেই ফেরা চাই।

আলিবর্দ্দি সেলাম করিয়া বাহির হইতে যাইবে, এমন সময়ে রঘুনাথ বলিল, আলিবর্দ্দি, লক্ষ্মীপুরের হাটের ইজারাদার মদন বৈরাগীর মাথা চাই। লোকটা প্রতিমা বিসর্জ্জনের প্রধান উদ্যোগী ছিল রক্তদহের প্রতিমার নৌকায় লোকটাকে আমি লক্ষ্য করেছি। তার

সে হাসি এখনও আমি ভুলতে পারছি না। সেই দাঁত-দুপাটি আনতে হবে।

আলিবর্দ্দি একটু ফিরিয়া প্রশ্ন করিল—শুধু দাঁত না মাথাও?

রঘুনাথ বলিল—দাঁতের সঙ্গে মাথা!

আলিবর্দ্দি আভূমি নত সেলাম করিয়া বাহির হইয়া গেল।

১২

বিজয়া-দশমীর পরে প্রায় দুইমাস চলিয়া গিয়াছে; বিসর্জ্জন ব্যাপার লইয়া জোড়াদীঘি ও রক্তদহের মধ্যে যে বিবাদের সূত্রপাত দেখা গিয়াছিল, তা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে; থামিবার কোন লক্ষণ নাই; বরঞ্চ ব্যাধির বিষ সমগ্র শরীরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জোড়াদীঘির লাঠিয়ালেরা রক্তদহের লক্ষ্মীপুরের হাট লুট করিবার পরে বিবাদটা আর কেবল জমিদারদের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া নাই প্রজারা নিজ নিজ জমিদারদের পক্ষ লইয়া নিজেদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ করিয়াছে। প্রতিদিন নূতন নূতন লুঠ-তরাজ দাঙ্গাহাঙ্গামার খবর দুই জমিদার বাড়ীতে পৌঁছিতে লাগিল, এবং জমিদারগণও সাহস ও অর্থ দিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

শেষে এমন অবস্থা হইল যে, রক্তদহ ও জোড়াদীঘির প্রজাদের ধন-প্রাণ অপর পক্ষের আক্রমণে বিপন্ন হইয়া পড়িল; রক্তদহের এলাকায় কোনক্রমে জোড়াদীঘির প্রজা আসিয়া পড়িলে সে মার না খাইয়া ফিরিত না, অনেক সময় প্রাণহানি পর্য্যন্ত ঘটিত, আবার রক্তদহের প্রজাদেরও জোড়াদীঘির এলাকায় আসলেই সেই বিপদ।

এই ব্যাধির মূল কোথায়, তা কেবল পরন্তপ ও দর্পনারায়ণ জানিত, কাজেই তারা ইহাতে বিস্মিত হইল না, তারা যেন প্রতিদিন ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। অন্য সকলে ভাবিল, ইহা জোড়াদীঘি

ও রক্তদহের বংশানুক্রমিক স্বাভাবিক বিবাদ মাত্র। কিন্তু এই একান্ত ভাবে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ সম্পূর্ণ ভাবে দলগত হইয়া উঠিল; ইহাই মানুষের ধারা।

জমিদারদের বিবাদের অংশ লইয়া প্রজারা যখন মারামারি আরম্ভ করিল, তার ফল দাঁড়াইল এই যে, দুইগ্রামের মধ্যবর্ত্তী গ্রাম-সমূহে চাষ-আবাদ একরূপ বন্ধ হইয়া গেল। সে বছর রবিশস্য যথাসময়ে বোনা হইল না; যাহা বা হইল, তাহাও কাটিবার লোকের অভাবে মাঠে শুকাইয়া গেল। জোড়াদীঘি হইতে যে পাকা সড়ক রক্তদহের দিকে গিয়াছে, তাতে পথিকের চলা বন্ধ হইল; পাকা পথে আগাছা জন্মিয়া গেল। এক একদিন জোড়াদীঘির জমিদার বাড়ীর লোকেরা অনেক রাত্রে ছাদের উপর হইতে দেখিতে পাইত, দূরে—কতদূরে ঠিক বুঝিবার উপায় নাই, অগ্নি-শিখা! গ্রামে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে? কোন্ গ্রাম বোঝা যাইত না, তবে কে এই কাণ্ড করিয়াছে, তাতে কারও সন্দেহ থাকিত না।

এই বিবাদের ফলে জোড়াদীঘির চৌধুরীদেরই ক্ষতি বেশী হইতে লাগিল। ইহার বিশেষ কারণও ছিল। চৌধুরীদের বড় সম্পত্তি চলন বিলের মধ্যে। এখন, এই চলন বিলের মধ্যে যাইতে হইলে, কি জলপথে কি স্থলপথে, রক্তদহ হইয়া যাইতে হয়। কাজেই জোড়াদীঘির জমিদার বাড়ীর সঙ্গে চলন বিলের সম্পত্তির যোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন হইল। প্রজারা জমিদার বাড়ীতে আসিতে সাহস করিতনা; খাজনার টাকা ঠিক সময়ে পৌঁছিত না; প্রায়ই মাঝপথে প্রতিপক্ষ লুটিয়া লইত। শেষে রক্তদহের লোক চলন বিলে গিয়ে জোড়াদীঘির সম্পত্তি হইতে জোর করিয়া খাজনা আদায় করিতে আরম্ভ করিল।

এই সংবাদ জোড়াদীঘি পৌঁছিলে দর্পনারায়ণের পক্ষে আর শান্ত হইয়া থাকা সম্ভব হইলনা।

সে একদিন আলিবর্দ্দিকে ডাকিয়া বলিল—আর তো চুপ করে' থাকা যায় না।

আলিবর্দ্দি বলিল—কেন যে চুপ করে' আছ দাদাবাবু তা তো বুঝি না। তুমি হুকুম করনি বলেই আমরা বসে আছি।

দর্পনারায়ণ বলিল আমি দেখছিলাম ওরা কতদূর যায়।

আলিবর্দ্দি হাসিয়া বলিল,—শয়তানকে ছেড়ে দিলে সে বেহস্ত পর্য্যন্ত যাবে; এ আর কে না জানে।

দর্পনারায়ণ বলিল, তুই এক কাজ কর! গাঁয়ে গাঁয়ে আজই খবর পাঠিয়ে দে, যেখানে যত লাঠিয়াল আছে, শড়কিবাজ আছে, এখানে এসে জুটুক। সঙ্গে যেন লাঠি, শড়কি আনে; যারা না আনবে তাদের আমরা দেব।

আলিবর্দ্দির মুখ উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

দর্পনারায়ণ বলিয়াই চলিল ওদের বাড়ী লুঠ করে শিক্ষা দিয়ে আসতে হবে, নইলে থামবে না। তারপরে তার দিকে তাকাইয়া বলিল—কিরে পারবি তো?

আলিবর্দ্দি কোন কথা বলিল না, কেবল উৎসাহে বুকের উপরে চাপড় মারিল।

—তবে যা, কাছারী থেকে লিখন লিখিয়ে নিয়ে সব গাঁয়ে গাঁয়ে পাঠিয়ে দে—অন্ততঃ চার পাঁচশো লোক চাই।

মন আনন্দাতিশর্য্যে পূর্ণ হইলে কথা কম বাহির হয়, আলিবর্দ্দির কথা বলিবার মত মনের অবস্থা নয়; সে তাড়াতাড়ি দর্পনারায়ণকে মস্ত একটা সেলাম করিয়া কাছারীর দিকে চলিয়া গেল।

চৌধুরী বাড়ীর প্রকাণ্ড আঙিনা লোকে ভরিয়া গিয়াছে; দশ দিন হইল ক্রমাগত প্রজার দল আসিতেছে; বিভিন্ন পরগণা হইতে, দূরের গ্রাম হইতে, কাল রাত্রে শেষ দল আসিয়া পৌছিয়াছে। ইহারা সকলেই চৌধুরীদের প্রজা। কিন্তু প্রজা বলিয়াই ইহাদের আহ্বান করা হয় নাই, ইহাদের অধিকাংশ বিখ্যাত লাঠিয়াল, অনেকেই বিখ্যাত শড়কিবাজ।

চৌধুরীদের জমিদারির মধ্যে দুইটি পরগণা লাঠিয়াল ও শড়কিবাজের জন্য বিখ্যাত। জোড়াদীঘি হইতে দশ ক্রোশ উত্তরে শুকানগাড়ি পরগণা—এখানকার প্রজারা বিখ্যাত লাঠিয়াল; ইহাদের মত দুর্দ্দান্ত, পরাক্রান্ত লাঠিয়াল উত্তর-বঙ্গে কম আছে। আবার জোড়াদীঘি হইতে দশ-ক্রোশ পূবে চলনবিলের মধ্যে বিখ্যাত শড়কিবাজদের বাস, ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা একবার নবাবের ফৌজকে আক্রমণ করিয়া হঠাইয়া দিয়াছিল। সে অনেকদিনের কথা, নবাব আলিবর্দ্দির সময়ে নৌকায় করিয়া একদল নবাবী ফৌজ মুর্শিদাবাদ হইতে বড়ল নদী দিয়া, চলনবিল হইয়া ঢাকা যাইতেছিল। নিজামতী নৌ-বাহিনী চলনবিলে আসিয়া পৌছিলে শড়কিওয়ালাদের সঙ্গে সামান্য কারণে বিবাদ বাধিয়া ওঠে। ফৌজের সঙ্গে শড়কিওয়ালাদের একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়—অধিকাংশ নৌকা ডুবিয়া যায়—অনেকে ডুবিয়া মরিল, অনেকে শড়কির ঘায়ে মরিল, অধিকাংশ প্রাণভয়ে পলাইল। নবাবের কাণে এই খবর পৌছিলে তিনি এই ভীরু সৈন্যদলকে তাড়াইয়া দেন, তাদের অধ্যক্ষের কাণ কাটিয়া ছাড়িয়া দেন, এবং এই শড়কিওয়ালাদের চলনবিলের মধ্যে পাঁচখানি গ্রাম জায়গীর দান করেন। আলিবর্দ্দি খাঁ কি ভাবে জনপ্রিয় হইতে হয় জানিতেন। কালক্রমে শড়কিওয়ালাদের উত্তর পুরুষ অনেকটা হীনবল

হইয়া পড়িলে তারা চৌধুরীদের অধিকারে আসে—কিন্তু এখনও ইহাদের যে প্রতাপ আছে, আর নাম তো শীঘ্র লোপ হইতে চায় না, তাতে সকলেই ইহাদের ভয় করিয়া চলে।

চৌধুরীদের আহ্বান পাইয়া শুকনাগাড়ির লাঠিয়াল ও চলন্নবিলের শড়কিওয়ালার সদলবলে আসিয়াছে,—অনেকদিন তারা এমন দাঙ্গা করিবার সুযোগ পায় নাই—তাদের সকলেরই ধারণা হইয়াছে কলির চার পোয়া পূরিয়া আসিতেছে, নতুবা বাহুবল প্রকাশের সত্যযুগ চলিয়া যাইবে কেন!

আজই দলবল লইয়া রক্তদহের জমিদার বাড়ী আক্রমণ করিতে রওনা হইতে হইবে। আলিবর্দ্দি অতিশয় ব্যস্ত ভাবে এদিকে ওদিকে ঘুরিতেছে; আঙিনার একপাশ দিয়া প্রজার দল বসিয়া গিয়াছে, তারা পেট ভরিয়া দই-চিড়া ও সন্দেশ খাইয়া লইতেছে; যাদের খাওয়া শেষ হইয়াছে, তারা কাছারীতে গিয়া নিজ নিজ মর্য্যাদা অনুসারে পারিশ্রমিক টাকা গুনিয়া লইয়া ট্যাঁকে গুঁজিতেছে; স্বয়ং দর্পনারায়ণ দেওয়ানজীর কাছে বসিয়া টাকা দিতেছেন।

এমন সময়ে আলিবর্দ্দি আসিয়া দর্পনারায়ণকে সেলাম করিয়া বলিল—দাদবাবু, এ দিকের কাজ সব শেষ হয়েছে। দর্পনারায়ণ খুসি হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সকলের খাওয়া হয়েছে?

আলিবর্দ্দি বলিল—আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাইয়েছি।

—বেশ। দেওয়ানজী সকলে বখশিস পেয়েছে?

দেওয়ানজী ক্রমবর্দ্ধমান সুদীর্ঘ ফর্দ্দের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—নাম তো অনেকগুলো দেখছি, কত লোক হবে রে আলিবর্দ্দি!

আলিবর্দ্দি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—তা শুকানগাড়ি আর চলনবিলের দুই দল ধরলে শ' পাচেক হবে বই কি। দর্পনারায়ণ আলিবর্দ্দিকে বলিল—আচ্ছা তুই গিয়ে সকলকে তৈরী হতে বল—

আমরা আসছি। এই বলিয়া সে উঠিতে যাইবে, এমন সময় তিনু পাটনি ও শ্রীকান্ত ছুতার আসিয়া দর্পনারায়ণকে প্রণাম করিয়া বলিল—দাদাবাবু আমাদের একটা দরখাস্ত আছে।

দর্পনারায়ণ হাসিয়া বলিল—আজ নারে; ফিরে এসে হবে।

ইহা শুনিয়া তারা হাসিয়া বলিল—তা হয় না দাদাবাবু! ফিরে এসে আর দরখাস্ত করে' কি হবে?

—আচ্ছা তবে বল—বলিয়া দর্পনারায়ণ পুনরায় ভাল করিয়া বসিল।

তারা দুইজনে আরম্ভ করিল—দাদাবাবু, এ কি তোমার বিচার! রক্তদহের বদমায়েসরা এসে আমাদের গাঁয়ের অপমান করে' গেল—আর আমরা কিছু করতে পারব না।

দর্পনারায়ণ যেন একটু বিরক্তই হইল; বলিল—তোরা কি চোখ বুজে থাকিস্ নাকি? সেই জন্যেই তো চলেছি।

শ্রীকান্ত বলিল—কিছু যদি মনে না কর দাদাবাবু, তবে বলি—এ লোকজন তো তোমার! তোমাকে অপমান করেছে, তার জন্যে তুমি চলেছ। কিন্তু আমাদেরও তো অপমান হয়েছে, আমরা কি করলাম।

এবার দর্পনারায়ণ একটু খুসী হইল, জিজ্ঞাসা করিল—তোরা কি করতে চাস্?

দুইজনে একসঙ্গে বলিল—আমরা তোমার সঙ্গে যাব।

—তোরা দুইজন গিয়ে আর কি বেশি ফল হবে?

এবার শ্রীকান্ত একা বলিল—আমি একা মানে? গাঁয়ে কি পঁচিশ ঘর ছুতোর নেই।

তিনুও হটিবার লোক নয়, সে বলিল—জোড়াদীঘির জেলেদের মাছ খেয়ে আট দশখানা গাঁয়ের লোক মানুষ। এ গাঁয়ে কত ঘর জেলে আছে মনে কর দাদাবাবু!—তারপর একটু থামিয়া নিজেই নিজের কথার উত্তর দিল—পঞ্চাশ ঘর।

দর্পনারায়ণ তাদের কথা শুনিয়া বলিল—বেশ বুঝলাম তোরা অনেক লোক। কিন্তু তোদের অস্ত্রশস্ত্র কিছু আছে?

—নেই?—তিনু পাটনী গর্জ্জন করিয়া উঠিল। আমরা ঢাল তলোয়ার বুঝিনে! মাছমারা 'কুচ' দিয়ে—বুঝলে না দাদাবাবু, এই এমনি করে ছুঁড়ে—এই বলিয়া সে ছুড়িবার ভঙ্গী করিল। কিন্তু আর কোন কথা বলিল না—তার ধারণা তার ভঙ্গীই যথেষ্ট; কথায় আর এমন কি বেশী প্রকাশ করিবে?

তিনু থামিলে শ্রীকান্ত আরম্ভ করিল—আচ্ছা দাদাবাবু, মানুষ বেশি শক্ত, না বাহাদুরী কাঠ?

—কেন রে?

—তাই বল না আগে! সে প্রশ্ন করিল করিল বটে, কিন্তু উত্তরের জন্য না থামিয়া বলিল—আমরা ছুতোর, কাঠকাটা আমাদের ব্যবসা, আর মানুষকে কিছু করতে পারব না? তবে যদি রক্তদহের ব্যাটারা কাঠের চেয়েও শুকনো হয়—সে আলাদা কথা! এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

দর্পনারায়ণ দেরী হইতেছে দেখিয়া বলিল—আচ্ছা তোরা যা। তৈরী হয়ে সব আয়। হাতিয়ার পত্তর সঙ্গে নিস্।

এই বলিয়া সে তাদের বিদায় করিয়া দিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, সেখানে রঘুনাথ ও বিশ্বনাথ ছাড়া বাণীবিজয় উপস্থিত। তাকে লক্ষ্য করিয়া দর্পনারায়ণ বলিল—পণ্ডিত মশায় আপনি তো যাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে?

বাণীবিজয় বলিল—বাবু সাহেব (দর্পনারায়ণ যদিও তার ছাত্র, তবু সে জমিদার; কাজেই সে ভাবিয়া ভাবিয়া এই সম্বোধনটি আবিষ্কার করিয়াছে; বাণীবিজয় প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী, সে অযথা অর্থ ও পরমার্থকে মিশাইয়া ফেলিয়া জটিলতার সৃষ্টি করে না) রণবিদ্যায় অবশ্য আপনার

নৈপুণ্য আছে, কিন্তু একটি বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক। গ্রাম অরক্ষিত রেখে আপনারা যাচ্ছেন, কাজেই আমাকে অবস্থান করতে হ'ল।

দর্পনারায়ণ বলিল—উত্তম বলেছেন, তা হলে আপনার উপর গ্রামের ভার দিয়ে যাচ্ছি।

বাণীবিজয় বলিল—অবশ্যই কর্ত্তব্য পালন করব, কারণ গীতাতেই সেরূপ আদেশ আছে। কিন্তু স্মরণ রাখবেন আমি একক।

দর্পনারায়ণ বলিল—তা হ'লে একা থেকেই বা কি করবেন?

রঘুনাথ তাকে বাধা দিয়া বলিল—পণ্ডিত মশায় আপনি একাই একশ'। ভেবে দেখ মেজ-দা, কৌরবরা নারায়ণী সেনা নিয়েছিল, কিন্তু অর্জ্জুন নিয়েছিল একা নারায়ণকে। বাণীবিজয় হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

দর্পনারায়ণ ও তার দুই ভাই বৈঠকখানার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া আঙিনার লোকদের দেখিতেছে, এমন সময়ে দেউড়ির বাহিরে তুমুল ঢাকের শব্দ উঠিল। ব্যাপার কি? সকলে জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে রমেশ হাড়ি, (পাঠক বোধ হয়, এই নেশাখোর লোকটাকে ভোলেন নাই) তার দল লইয়া অনেকগুলা ঢাক ও জয়-ঢাক বাজাইতে বাজাইতে প্রবেশ করিল। হঠাৎ সম্মুখে দর্পনারায়ণকে দেখিয়া ঢাক রাখিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—প্রণাম হই দাদাঠাকুর। এই বলিয়া সে উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু খানিকটা উঠিয়াই আবার পড়িয়া গেল।

কেহ কেহ বলিল—বেটা নেশা করেছে।

রমেশ মাটিতে মুখ রাখিয়াই বলিল—ও কথা বলনা বাবা। এই বলিয়া উঠিতে গিয়া আবার পড়িল—উঁহু এখনো শেষ হয় নি! একে জমিদার, তায় বামুন, তায় আবার লড়াই করতে চলেছেন। ওরে মধু! —এই বলিয়া সে ছেলেকে ডাকিয়া বলিল, তোরা কি কচ্ছিস্!

মধু বলিল, তাদের প্রমাণ করা শেষ হইয়াছে।

—আচ্ছা তবে আমাকে টেনে তোল। মধু ও বিধুর আকর্ষণে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া ঢাক ঘাড়ে তুলিয়া রমেশ বলিতে আরম্ভ করিল—বাবা এতবড় ব্যাপার আর সিদ্ধিগণেশকেই ভুলে গেলে। বাজনা ছাড়া কাজ হয়। বরঞ্চ দুটো বর্শা, শড়কি, ঢাল, তলোয়ার কম করে নাও। কিন্তু জয়ঢাক না হলে চলবে কেন? তবেই তো নাম জয়ঢাক। উঁহু, তোমরা যেন বাবু বিশ্বাস করছ না। বাজা তো বাজা একবার—এই মধু, এই বিধু।

পিতার আদেশে মধু, বিধু ও অন্য সকলে ঢাক ও জয়ঢাকে কাঠি দিল। বিরাট বাজনায় আঙিনা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। রমেশ, যে-রমেশ প্রণাম করিতে গিয়া বিনা সাহায্যে উঠিতে পারে না, কি আশ্চর্য্য, সে অতবড় একটা ঢাক ঘাড়ে করিয়া বিষম লাফালাফি সুরু করিল, অথচ পড়িবার নামটি পর্য্যন্ত করিল না।

দর্পনারায়ণ তাদের থামাইয়া দিয়া বলিল—কি, তোরা সঙ্গে যাবি এই তো?

রমেশ বলিল—না।

—তবে কি আবার?

রমেশ জনতাকে দেখাইয়া বলিল—এরা আমাদের সঙ্গে যাবে আমরা যাব আগে আগে বাজাতে বাজাতে, এরা আসবে পিছনে কিন্তু যখন লড়াই আরম্ভ হবে, এরা যাবে আগে, আমরা থাকব পিছনে আর আড়ালে।

—আড়ালে কেন রে?

—বল কি দাদাবাবু! শড়কি লেগে ঢাক ফুটো হয়ে গেলে বাজাব কি? কি বলিস্ রে? এই বলিয়া সে তার দলের দিকে তাকাইল। সকলেই দৃষ্টিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

দর্পনারায়ণ বলিল—আচ্ছা তবে চল।

অনুমতি পাইয়া রমেশ ও তার দল-বল পুনরায় বিকট উৎসাহে বাজাইতে আরম্ভ করিল।

দর্পনারায়ণ আলিবর্দ্দিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আলিবর্দ্দি সব তৈরি তো? আলিবর্দ্দি সম্মতি জানাইলে কি ভাবে যাত্রা করিতে হইবে দর্পনারায়ণ তা বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

—সকলের আগে যাবে শড়কিওয়াদের দল; তারপরে যাবে লাঠিয়ালেরা; তুই থাকবি শড়কিওয়ালা ও লাঠিয়ালদের মধ্যে। আমরা তিনজন ঘোড়ায় চড়ে যাব লাঠিয়ালদের পরে। আর আমাদের পরে আসবে গাঁয়ের ছুতোর আর জেলের দল।

আলিবর্দ্দি জিজ্ঞাসা করিল—আর রমেশদের বাগুভাণ্ড।

—বেশ, তারা যাবে সকলের আগে। বাজনা কিন্তু থামতে দিস্ নে।

আলিবর্দ্দি হুকুম পাইয়া দলের মধ্যে গিয়াছে, এমন সময়ে পুনরায় দেউড়ির বাহিরে রাম শিঙার তীব্র-ধ্বনি শোনা গেল। সকলে জিজ্ঞাসু হইয়া উঠিল—এ আবার কি?

এমন সময়ে প্রকাণ্ড এক রাম-শিঙা বাজাইতে বাজাইতে আব্বর প্রবেশ করিল—হাতে তার সেই দাঁড়কাক। তাকে দেখিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল—তার নিজের হাসি সকলকে ছাপাইয়া শোনা গেল।

আব্বরকে দেখিয়া রমেশ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; বলিল—দুষমণ, দাদাবাবু, দুষমণ!

দর্পনারায়ণ ধমক দিয়া বলিল—চুপ কর! তারপরে তাকে ইসারায় কাছে ডাকিয়া বুঝাইয়া দিল—তুই যাবি সকলের আগে শিঙা বাজাইতে বাজাইতে।

আদেশ শুনিয়া রমেশ বিরক্ত হইলেও আপত্তি করিতে পারিল না।

এই সব আয়োজনে বেলা দশটা বাজিয়া গেল। তখন সেই ছোট সৈন্যবাহিনী দেউড়ী অতিক্রম করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিল।

প্রথমে শ'দুই শড়কিওয়ালা মাল-কোঁচা মারিয়া কাপড় পরা; বাঁ হাতে ছোট একখানি করিয়া বেতের ঢাল—ডান হাতে দীর্ঘ শড়কি; তার তীক্ষ্ণ-ফলা রৌদ্রে চকচক করিতেছে।

শড়কিওয়ালাদের পরে প্রায় শ'দুই লাঠিয়াল। পাকা বাঁশের কালো লাঠি তাদের হাতে; খালি গায়ে শীতের রোদ পিছলিয়া পড়িতেছে। এই দুই দলের মাঝে পঞ্চাশোত্তীর্ণ আলিবর্দ্দি সরল, সন্নত, বলিষ্ঠ দেহ; এক হাতে তার লাঠি, অপর হাতে বন্দুক।

লাঠিয়াল-বাহিনীর পরে তিনটি ঘোড়াতে রঘুনাথ, বিশ্বনাথ ও দর্পনারায়ণ মাঝখানে। তাদের প্রত্যেকের কোমরবন্ধে তলোয়ার—এক হাতে বন্দুক, অপর হাতে ঘোড়ার লাগাম।

সব শেষে চলিয়াছে গাঁয়ের ছুতোর, জেলে ও অন্যান্য লোক। তাদের অস্ত্রশস্ত্রের স্থিরতা নাই; যে যাহা পাইয়াছে, লইয়াছে; কাস্তে, কুড়ুল, কোদাল, লাঠি, বর্শা, কুচ, শাবল, খোন্তা, লাঙল, জীর্ণ তলোয়ার, ঢেঁকির মুগুর পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই; জনতার অসংখ্য হাতে জনতার উপযুক্ত অস্ত্র! অনেকে শুধু হাতেই চলিয়াছে, লুট-তরাজ তাদের ইচ্ছা, কাজেই অস্ত্র বহিয়া হাতকে বেহাত করা উচিত নয়।

আর সকলের আগে চলিয়াছে রমেশ হাড়ীর ঢাক, জয় ঢাক ও ঢক্কা। বাজনার তালে তালে পা ফেলিয়া শড়কিওয়ালা ও লাঠিয়ালেরা চলিয়াছে; জনতা যেমন খুসি পা ফেলিতেছে; আর মাঝে মাঝে ঢাকের বাজনাকে ছাঁপাইয়া উঠিতেছে আব্বরের শিঙ্গার শব্দ। মূক বালকের মনের তীব্র ইচ্ছা যেন এতদিন পরে ওই তীব্র শব্দের মধ্যে রূপ পাইয়াছে।

জোড়াদীঘির রাস্তা দিয়া এই দীর্ঘ জনতা হিংস্র, চঞ্চল সরীসৃপের মত রক্তদহের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে জনতার কোলাহল কমিয়া আসিল—বাজনার শব্দও ক্ষীণ হইয়া আসিল—কেবল মাঝে

মাঝে আব্বরের শিঙ্গার শব্দ দ্বিগুণিত বেগে ধ্বনিত হইতে লাগিল। তার যেন ক্ষীণতা নাই। সেই শব্দ শ্মশানের ইঙ্গিত বহিয়া বুকের মধ্যে গিয়া চমকাইয়া তুলিতে লাগিল। মুখ যখন মুখর হয়—তখন এমনিই হয়।

সৈন্যবাহিনী জোড়াদীঘি ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে হঠাৎ গ্রামখানা অত্যন্ত নীরব ম্লান বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

১৪

সেদিন নারিকেল কাড়াকাড়িতে রক্তদহের পরাজয়ে ইন্দ্রাণী সেই যে শয়নঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, তারপর হইতে তার মনের চাঞ্চল্য কমে নাই; সমুদ্রের উপরে তরঙ্গের আন্দোলন হয়, ভিতরে শান্ত; ইন্দ্রাণী ঠিক বিপরীত; তার আন্দোলন যা কিছু সব ভিতরে, বাহিরে তার শৈল-গাম্ভীর্য্য।

সে অনেকদিন পরে আর একবার নিজের জীবনের মানচিত্রখানা সম্মুখে মেলিয়া দিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। মানুষের জীবনের বর্ত্তমানটা অত্যন্ত অশরীরী, তার প্রেতোপম দেহ ধরা-ছোঁয়া যায় না; কিন্তু অতীতের দিকে তাকাইলে দেখা যায় সেখানে বর্ত্তমানের কঙ্কাল স্তূপীকৃত। এত কঙ্কাল ওই সূক্ষ্মশরীরের মধ্যে ছিল!

সে নিজের ইচ্ছায়, স্বভাবের বিরুদ্ধে পরন্তপকে বিবাহ করিয়াছিল; ভাবিয়াছিল, সে আর কিছু না হোক, বীর পুরুষ; কিন্তু প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল অভীষ্টের দিকে তার বীরবর এক পদও অগ্রসর হইল না। শুধু তা-ই নয়, চাঁপার হাতে কি দারুণ অপমানের সে কারণ হইয়া উঠিয়াছে! সে স্বচক্ষে গভীর-রাত্রে, ফুলের মালা গলায় তাকে চাঁপার শয্যায় নিদ্রিত দেখিয়াছে! প্রতি রাত্রে তার মত্ত বীভৎসতা দুরূহ অভীষ্টের খাতিরে সহ্য করিতেছে।

পরন্তপ যখন প্রতিহিংসার একটি অঙ্গুলিও উত্তোলন করিল না, তখন সে নিজে রক্তদহের লোকদের দিয়া জোড়াদীঘিকে নারিকেল কাড়াকাড়িতে আহ্বান করিয়াছিল; তার বড় ভরসা ছিল, জোড়াদীঘি পরাজিত হইবে, কিন্তু সেখানেও জোড়াদীঘিরই জয়।

যেদিকে সে তাকায়, চাপা, পরন্তপ, দর্পনারায়ণ, নিজের মন, এই চারি সত্বা জতুগৃহের চারি দেয়ালের মত দাহ্য পদার্থে পূর্ণ; একদিকে আগুন ধরিয়া যাইতেই চারিদিকে অগ্নিসন্তাপ আরম্ভ হইল। মনের মধ্যে এ কি জৌহর ব্রত! শত শত অগ্নিশিখা কোন্ সহস্রবাহু দৈত্যের অসংখ্য তপ্ত আঙ্গুলির মত তাকে তীব্র যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিল। বাহিরের আগুন জলে নেভে, কিন্তু মনের আগুন! মরিলে? কিন্তু ইন্দ্রাণী তো মরিতে রাজি নয়। বিশেষ, মানুষের মৃত্যু আছে, ইন্দ্রাণীর মত জন্ম-পাষাণীর আবার মৃত্যু কেমন করিয়া সম্ভব?

কিন্তু হঠাৎ সমস্ত পরিপ্রেক্ষিতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল—অতর্কিতে, অভাবিত ভাবে। শ্লেষ-রসিক বিধাতা এমন কত বিস্ময় মানুষের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখেন।

পরন্তপ যে প্রতিমা বিসর্জ্জনের এমন একটা মতলব আঁটিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ইন্দ্রাণী জানিত না। বিজয়ার গভীর-রাত্রে পরন্তপ যখন সিক্ত-বস্ত্রে বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল—ইন্দ্রাণী ভাবিয়াছিল অতিরিক্ত মদ্যপানে কোথাও জলে পড়িয়া গিয়া এমন ঘটিয়াছে। কিন্তু সব ঘটনা শুনিয়া সে স্বামীর পদতলে মাথা নত করিয়া প্রণাম করিল—সে প্রণাম কেবল বিজয়া-দশমীর বাহ্য সংস্কার নয়, এমন ভক্তিভরে প্রণাম ইন্দ্রাণী কোন মানুষকে এর আগে আর করে নাই। এক মুহূর্ত্তে পরন্তপ তার চোখে লোকাতীত বীরত্বে ভূষিত হইয়া দেখা দিল—নিজেকে বীরপত্নী বলিয়া সে গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিল।

তারপর হইতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া চলিল; দিনের

মধ্যে যাদের দু'চার মুহূর্ত্ত ছাড়া দেখা হইত না, এখন তারা সর্ব্বদা এক সঙ্গে থাকে, একত্র বসিয়া মন্ত্রণা করে। তাদের এই ঘনিষ্ঠতা এত আকস্মিক, এত স্বভাব বিরুদ্ধ ও এতই সম্পূর্ণ যে, স্বয়ং চাঁপা ঠাকুরাণী ভয় পাইয়া গেল। তবে কি তার কৌশল ব্যর্থ হইল। ইন্দ্রাণীর মনকে নিষ্পেষিত করিবার জন্য বিবাহের দ্বার দিয়া যে নকল প্রেমের গিল্টি করা লোহার শিকল সে গড়িয়া তুলিতেছিল; যে শিকলে সে-দিনের রাত্রির ঘটনার সে একটি মাত্র গ্রন্থি আটিয়া দিয়াছিল, তাহা কি এমন করিয়াই ব্যর্থ হইতে চলিল। পরন্তপ তার আয়ত্তাতীত হইয়া যায় ভাবিয়া সে ভীত হইয়া উঠিল। কিন্তু তার ভয় পাইবার কোন কারণ ছিল না। সংসারের পথ বড় বিচিত্র, পরম শত্রুদ্বয়েরও পথ মাঝে মাঝে এক জায়গায় আসিয়া কিছুক্ষণের জন্য মিশিতে পারে; আর সান্নিধ্য না ঘটিলে শত্রুতা সাধন করিবে কি উপায়ে! গলা টিপিয়া মারিতেও যে কণ্ঠালিঙ্গন আবশ্যক। সত্য কথা বলিতে কি, জীবনের পথে ইন্দ্রাণী ও পরন্তপের গতি কিছুকালের জন্য সমান্তরাল ভাবে চলিয়াছে; সমান্তরাল পথ ঘনিষ্ঠ হইলেও নিতান্তই পর, কোন কালেই তারা মিলিবে না। স্বামী-স্ত্রী ক্রমেই নিকটতর হইতে ও চাঁপা ক্রমেই ভীততর হইতে লাগিল।

কিছুকাল এমনই চলিল।

১৫

ইন্দ্রাণী ও পরন্তপের মন্ত্রণার ফলে কি হইল, পাঠক তাহা খানিকটা জানেন। বিজয়া-দশমীর ঘটনার কয়েক দিন পরে জোড়াদীঘির লোক আসিয়া রক্তদহের হাট লুট করিয়া গেল; তার পরে দুই মাস ধরিয়া এই অঞ্চলে যে লুট-তরাজ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারামারি ও অগ্নিকাণ্ড চলিয়াছে, তার কিছু আভাস পাঠকদের দিয়েছি।

অঘ্রাণ মাসের শেষে একদিন পরন্তপ সংবাদ পাইল, জোড়াদীঘির চৌধুরীরা বহু শড়কি ও লাঠিয়াল লইয়া তাদের বাড়ী শীঘ্রই লুটিতে আসিবে। তখনই রক্তদহের প্রজাদের সংবাদ পাঠাইয়া দেওয়া হইল; যেখানে যত জানাশোনা লাঠিয়াল, শড়কিওয়ালা ছিল, তাদের ডাকিয়া পাঠান হইল; রক্তদহে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল।

এ দিকে পরন্তপ লোকজন লইয়া জমিদার-বাড়ী আক্রান্ত হইয়া যাতে বিপন্ন না হয়, তার ব্যবস্থায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

সে কালের অধিকাংশ জমিদার-বাড়ীর ন্যায় রক্তদহের জমিদার-বাড়ীও অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল। তার দুই দিকে বেষ্টন করিয়া বড়ল নদী, নদী ও বাড়ীর মাঝে এত সামান্য স্থান যে সেখানে বেশি লোক দাঁড়াইতে পারে না। কাজেই সে দিক হইতে আক্রমণের বড় ভয় নাই, দক্ষিণ দিকটাতে একটা বড় দীঘি পরিখার মত বাড়ীটাকে রক্ষা করিতেছে; কেবল পশ্চিম দিকে উচ্চ প্রাচীর ছাড়া অন্য কোনো বাধা নাই। এই দিকেই বড় একটা মাঠ; পাঠক এর পরিচয় আগে পাইয়াছেন। পশ্চিম দিকেই বাড়ীর দেউড়ি।

পরন্তপ অন্য তিন দিকের জন্য তত চিন্তিত না হইয়া পশ্চিম দিকটা সুরক্ষিত করিবার জন্য উদ্যোগী হইল; দেউড়ীর পরেই প্রকাণ্ড আঙিনা, আঙিনার তিন দিকে কাছারী, তোষাখানা ও বৈঠকখানা; সে অস্থায়ী ভাবে কাছারীর সেরেস্তা অন্দরমহলে পাঠাইয়া দিয়া এই আঙিনাটাকে লাঠিয়াল ও শড়কিওয়ালাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিল। দেউড়ীর প্রকাণ্ড কাঠের দরজা নূতন করিয়া মেরামত করা হইল; প্রাচীরের উপরের খানিকটা গাঁথনি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া কাচের টুকরা বসাইয়া দিয়া নূতন করিয়া গাঁথা হইল; আর প্রাচীরের বাহিরের দিকে এক মানুষ গভীর করিয়া দীর্ঘ গড়খাই খনন করিয়া দিল।

ক্রমে দূরদূরান্তর হইতে লাঠিয়াল ও শড়কিওয়ালারা আসিয়া পৌঁছিতে

লাগিল। পরন্তপ বিশেষভাবে এই দিক হইতেই আক্রান্ত হইবে ভাবিয়া প্রতিরোধের ব্যবস্থায় লাগিয়া গেল। কাছারী, বৈঠকখানা ও তোষাখানার দোতালা ও তেতালার ছাদের উপর শড়কিওয়ালাদের স্থান হইল; লাঠিয়ালেরা আঙিনায় থাকিবে; যদি জোড়াদীঘির লোক দেউড়ি ভাঙিয়া প্রবেশ করে, তখন তারা ঠেকাইবে; কিংবা রক্তদহের আক্রমণের সময় আসিলে লাঠিয়ালের দল বাহির হইয়া পড়িবে।

বৈঠকখানার ছাদের উপরে রাশীকৃত থান ইট সংগৃহীত হইল; ভাঙা ইটও যথেষ্ট, বরঞ্চ বেশিই; কারণ অর্দ্ধ-সত্য ও ভাঙা ইট তর্কযুদ্ধে অধিক দূর যায়; খেজুরের কাঁটা, ঝামা-ইট, ভাঙা শিশি-বোতল স্থানে স্থানে জমা করা হইল; অন্য তিন দিকেও এই সব বাঙ্গালী অস্ত্রের ব্যবস্থা করা হইল, কিন্তু তুলনায় অনেক কম।

পরন্তপ ও বেঙা সব পরিদর্শন করিয়া ফিরিতে লাগিল। লাঠিয়াল ও শড়কিওয়ালাদের আহারের ও বাসের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল; কে কোন্ সময় কোথায় দাড়াইবে তা দেখাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল; আর দেউড়ি হইতে বাড়ীর অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা দীর্ঘ দড়ির সঙ্গে গোটা কয়েক ঘণ্টা বাঁধিয়া সতর্ক করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইল। গ্রামের সুস্থ সবল লোকদের পরন্তপ নিজের সৈন্যদলে গ্রহণ করিল; সে জানিত যে, অন্যান্য শিশু ও স্ত্রীলোকদের উপরে কোন অত্যাচার হইবে না।

সব শেষে এতগুলি লোকের একমাস চলিতে পারে এই মত চাল, ডাল, সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া পরন্তপ জোড়াদীঘির সৈন্যবাহিনীর জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল।

একদিন, দুইদিন, চারদিন যায়—জোড়াদীঘির লোকদের দেখা নাই; সকলেই কেমন নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতে লাগিল। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে দূরে ঢাকের বিকট শব্দে ও ও শিঙার তীক্ষ্ণ-ধ্বনিতে রক্তদহ চমকিত হইয়া উঠিল; ছাদের উপরে সকলে উঠিয়া দেখিল, দূরে গ্রামের

মাঝে অসংখ্য লোক; ম্লান আলোতে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে যত লোক তার বেশি প্রতীয়মান হইল। পরন্তপের আদেশে প্রকাণ্ড দেউড়ি সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল; লাঠিয়াল ও শড়কিওয়ালারা ছাদের উপরে যে যার স্থানে গিয়া দাঁড়াইল। অত বড় বাড়ীখানা নিস্তব্ধ, নির্জ্জন হইল আর জোড়াদীঘির সৈন্যবাহিনী বহু ঢাকের বিকট শব্দে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল, আর রক্তদহ নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া সেই শব্দ শুনিতে থাকিল।

১৬

পরদিন প্রাতঃকালে ছাদের উপর হইতে পরন্তপ দেখিল, বহুশত লোক তার বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। উত্তর-পূব দিকে বেশি লোক নাই, কারণ সে দুই দিক নদীর দ্বারা সুরক্ষিত; দক্ষিণ দিকটাতে দীঘি—কাজেই সেদিকেও লোক কম, কেবল দীঘির পরপারে গোটা দুই বড় তাঁবু খাটানো হইয়াছে, অনুমানে বুঝিল ও দুটি দর্পনারায়ণের জন্য; পশ্চিম দিকে ফাঁকা মাঠ—সেইখানেই লোকের বেশী ভিড়।

পরন্তপও এইরূপ হইবে অনুমান করিয়া সেই ভাবেই ব্যবস্থা করিয়াছে; তারও অধিকাংশ লোকের ব্যবস্থা এই কাছারীর আঙিনাতে। বাড়ীতে যে কয়েকটা বন্দুক ছিল, সেগুলি একত্র করিয়া দেউড়ি রক্ষার জন্য নিযুক্ত করিল, কেবল নিজের কাছে একটা রাখিল।

তারপরে সে বেঙা ও অন্যান্য সর্দ্দারদের ডাকিয়া কি ভাবে আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে হইবে, সেই উপদেশ দিতে আরম্ভ করিল। প্রথমেই সে বেঙাকে চারিদিকে ঘুরিয়া পাহারা দিবার জন্য নিযুক্ত করিল।

বেঙা বলিল—মোতির মা বলেছিল, ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে; এত বড় একটা লড়াই আরম্ভ হ'ল—কিন্তু বেঙা চৌকিদার সেই চৌকিদার।

পরন্তপ উপদেশ করিল পাঁচজন লোক পাঁচটি বন্দুক লইয়া দেউড়ির কাছে থাকিবে; পালাক্রমে তারা হাত বদল করিবে। অযথা গুলি ছুড়িতে

নিষেধ করিয়া দিয়া বলিয়া দিল, জোড়াদীঘির লোক যখন দেউড়ি আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিবে, তখন দরজা ও প্রাচীরে ফাঁক দিয়া গুলি করিয়া সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে হইবে। সে বলিল—এই কাজটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কাঠের দেউড়ি ভাঙা তেমন কঠিন নয়, আর দেউড়ি ভাঙিয়া ফেলিলে রক্তদহের পরাজয় সুনিশ্চিত। পরন্তপ তাদের আশ্বাস দিল, তারা যদি দেউড়ি আটকাইয়া রাখিতে পারে—তবে সে জোড়াদীঘির অন্য আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ভার লইতেছে। ইতিমধ্যে রক্তদহের আরও লোক আসিবার কথা; তারা আসিয়া জোড়াদীঘির লোকদের আক্রমণ করিলে, তখন জমিদার-বাড়ীর লোকেরাও দেউড়ি খুলিয়া দিয়া জোড়াদীঘির সৈন্যদের উপরে পড়িবে; দুই দলের পেষণে জোড়াদীঘির অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিবে।

যারা বন্দুক দিয়া দেউড়ি রক্ষার ভার পাইয়াছিল, তারা প্রাণপণে দেউড়ি রক্ষা করিবে। তখন পরন্তপ অন্যান্য লোকদের সম্বোধন করিয়া বলিল—যতক্ষণ জোড়াদীঘিরা শড়কি বা অন্য কোন অস্ত্র দিয়া আক্রমণ করিবে, তোমরা ছাদের আলিসার আড়ালে আত্ম-গোপন করিয়া থাকিবে অযথা আত্মপ্রকাশ করিয়া বিনষ্ট হইও না। ওদের লোক যদি প্রাচীর বাহিয়া উঠিতে চেষ্টা করে, তবেই খেজুরের কাঁটা, ইট বা শড়কি ছুড়িয়া তাদের প্রতিরোধ করিবে।

পরন্তপ আঙিনায় দাঁড়াইয়া লোকজনের সঙ্গে এই সব কথা বলিতেছিল হঠাৎ কতগুলো উড়ো শড়কি আসিয়া নিকটে পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে জোড়াদীঘির ঢাক ও শিঙা বাজিয়া উঠিল। সকলে বুঝিল, জোড়াদীঘি আক্রমণ করিয়াছে; তারা সরিয়া গিয়া ছাদের উপরে ও ঘরের মধ্যে আশ্রয় লইল; বন্দুকধারীরা অতি সাবধানে দেউড়ি রক্ষায় মন দিল।

জোড়াদীঘির লোকেরা পশ্চিম দিক হইতে উড়ো শড়কি ছুড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। এগুলি ছুড়িবার একটু বিশেষ রীতি আছে; উড়ো

শড়কি দীর্ঘ হয় না,—আকারে অনেকটা ধনুকের তীরের মত, সম্মুখে খানিকটা তীক্ষ্ণ ফলা। দুই সারি লোক দাঁড়াইয়া যায়; একদল সম্মুখে; একসারি পিছনে; পিছনের লোকেরা বসিয়া থাকে; সম্মুখের দল দাঁড়াইয়া; যারা বসিয়া থাকে, তারা শড়কি লইয়া সম্মুখের লোকের ডান পায়ের কাছে দেয়—আর সে বুড়ো ও মাঝের আঙ্গুলে চাপিয়া শড়কি ধরিয়া বেগে সম্মুখে নিক্ষেপ করে; অভ্যস্ত পায়ের বেগে নিক্ষিপ্ত শড়কি ধনুশ্চ্যুত তীরের শক্রর মত উপরে গিয়া পড়ে—মানুষের উপর গিয়া পড়িলে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করিয়া ফেলে।

প্রায় একশ লোক এই ভাবে শড়কি নিক্ষেপ করিতেছে, একশ লোক শড়কি যোগাইয়া দিতেছে আর রাশি রাশি শড়কি গিয়া রক্তদহের জমিদার-বাড়ীর ইতস্তত পড়িতেছে—ভয়ে কেহ বাহির হইতে পারিতেছে না।

প্রায় এক ঘণ্টা এইরূপ চলিলে জোড়াদীঘির একদল লাঠিয়াল গিয়া দেউড়ির উপরে পড়িল, অমনি পরন্তপের শিক্ষা অনুযায়ী একসঙ্গে পাঁচটি বন্দুকের আওয়াজ হইল; ধোয়া সরিয়া গেলে দেখা গেল, জোড়াদীঘির একজন লাঠিয়াল নিহত ও তিন-চারজন আহত হইয়াছে। নিহত ও আহতদের উঠাইয়া লইয়া আক্রমণকারীরা সরিয়া গেল।

দুপুরের সময় দুই দলই আহারাদিতে ব্যস্ত থাকায় আক্রমণ বন্ধ রহিল; বিকালের দিকে আবার আক্রমণ আরম্ভ হইল; কিন্তু কোন পক্ষেরই বিশেষ যে একটা ফল লাভ ঘটিল তাহা নহে। রাত্রিতে দুই পক্ষই ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, কেবল কয়েকজন করিয়া প্রহরী জাগিয়া থাকিল।

১৭

তিন চার দিন এইভাবে চলিল, কিন্তু কোন পক্ষের জয় পরাজয় ঘটিল না, বরঞ্চ উভয় পক্ষের মধ্যে তুলনায় জোড়াদীঘিরই ক্ষতির পরিমাণ বেশি বলিয়া মনে হইল।

তারা প্রত্যেক দিন একবার করিয়া দেউড়ি আক্রমণ করিয়াছে, আর প্রতি বারে অনেক কয়জন লোক হতাহত হইয়াছে। দর্পনারায়ণ বুঝিল, এ ভাবে হতাহতের সংখ্যা বাড়িয়া চলিলে সকলে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে, এবং পরন্তপকে সাজা না দিয়াই ফিরতে বাধ্য হইতে হইবে।

তখন সে অন্য উপায় চিন্তা করিল। আলিবর্দ্দিকে ডাকিয়া বিশ পঁচিশখানা মই সংগ্রহ করিতে হুকুম দিল এবং বলিয়া দিল, এই সব মই দেয়ালে লাগাইয়া একসঙ্গে বিশ পঁচিশ জন করিয়া লোক দেয়াল টপকাইয়া ভিতরে পড়িবে। সে হিসাব করিয়া আলিবর্দ্দিকে বুঝাইয়া দিল—এই উপায় অবলম্বন করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে একশ লাঠিয়াল বাড়ীর মধ্যে গিয়া পড়িতে পারিবে।

বিকাল বেলার দিকে মই সংগ্রহ হইল। পশ্চিম দিকের দেয়ালের উত্তর কোণে মই লাগান হইল; সেখানে বাছা বাছা শ'খানেক লাঠিয়াল লাঠি লইয়া উপস্থিত হইল; দেয়ালের দক্ষিণ অংশে রমেশ হাড়ির বাজনা জোরে বাজিয়া উঠিল; বাড়ীর মধ্যের লোক সেই দিক হইতে আক্রমণ হইবে ভাবিয়া সেখানে গিয়া প্রস্তুত হইল; এ দিকে মই বাহিয়া লাঠিয়ালেরা উঠিয়া প্রথম দল বাড়ীর মধ্যে লাফাইয়া পড়িল; কিন্তু ততক্ষণে রক্তদহের লোকেরা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া যথাস্থানে আসিয়া হাজির হইল; পরন্তপ বন্দুকধারীদের ডাক দিল। প্রাচীরের উপরে দ্বিতীয় দলের মাথা যেমনই জাগিয়া উঠিয়াছে, একসঙ্গে পাঁচটা বন্দুকেই মৃত্যু উদ্গীরণ করিল; অধিকাংশ লোক আহত হইয়া বাহিরে পড়িয়া গেল; তারপর আর কেহ মই বাহিয়া উঠিতে সাহস করিল না। তখন রক্তদহের বহুশত লোক মিলিয়া জোড়াদীঘির প্রথম দলের বিশ জনের উপরে পড়িয়া অধিকাংশকে নিহত করিল; দু'এক জনকে কৃপাপরবশ হইয়া প্রাণে মারিল না। অতঃপর বাড়ীর ভিতরে আসিয়া

পড়িলে কি দশা হইবে, তা বুঝাইয়া দিবার জন্ম মৃতদেহগুলি প্রাচীর পার করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল। জোড়াদীঘির লোকেরা রক্তদহের নৃশংসতায় শিহরিয়া উঠিল।

সে রাত্রে দর্পনারায়ণের তাঁবুতে দর্পনারায়ণ, রঘুনাথ, বিশ্বনাথ ও আলিবর্দ্দিকে লইয়া মন্ত্রণা-সভা বসিল। দর্পনারায়ণ বলিল—দেখ, আমরা আজ চার পাঁচ দিন ধরে এসেছি, কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। শুধু তা-ই না, আমাদের হতাহতের সংখ্যা প্রতিদিন বেড়ে চললে বেশী দিন আর লোকদের ধরে রাখা যাবে না, এখন উপায় কি?

রঘুনাথ বলিল—মেজদা কথাটা তুলে ভালই করেছ। আমি তোমার তাঁবুতে আসবার সময় লাঠিয়ালদের মধ্য দিয়ে আসছিলাম—অন্ধকারে ওরা আমাকে চিনতে পারেনি। ওদের কথা কিছু কিছু কানে গেল। যা'শুনলাম খুব আশার কথা নয়।

আলিবর্দ্দি তার কথার সূত্র ধরিয়া বলিল—ছোটবাবু ঠিকই বলেছেন; এ রকম ভাবে চললে লাঠিয়ালেরা আর বেশীদিন থাকতে চাইবে না; কাজেই যা করতে হয় তাড়াতাড়ি করা দরকার।

দর্পনারায়ণ বলিল—সব জিনিসটাকে আমি ভেবে দেখেছি; প্রথমত, আমরা ওদের না হারিয়ে ফিরতে পারি না; দ্বিতীয়ত, হারাবার ব্যবস্থা দু'এক দিনের মধ্যেই করতে হবে। এখন কি করে' এ সম্ভব বল।

বিশ্বনাথ এতক্ষণ কথা বলে নাই, চুপ করিয়া শুনিতেছিল—এবার সে বলিল—দেখ শড়কি বা লাঠি দিয়ে মানুষ মারা যায়, কিন্তু দেয়াল ভাঙ্গা যায় না; বন্দুক দিয়েও দেওয়াল ভাঙ্গা অসম্ভব। অথচ দেয়াল না ভাঙতে পারলে ওদের কিছু করা যাবে না।

রঘুনাথ—কিন্তু দেয়াল ভাঙ্গা কি করে সম্ভব! মজুর লাগিয়ে দিয়ে—?

বিশ্বনাথ—দেয়ালের খানিকটা অংশ বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি না?

কথাটা অত্যন্ত সহজ হইলেও কারও মনে হয় নাই। এতক্ষণে একটা উপায় পাওয়া গিয়াছে ভাবিয়া সকলে উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

আলিবর্দ্দি বলিল—সহজ বটে দাদাবাবু, কিন্তু তা'তে যে পরিমাণ বারুদ লাগবে, তত বারুদ কোথায়?

এ কথাটাও খুব সহজ, কিন্তু কারও মনে উদয় হয় নাই।

তখন সকলে মিলিয়া স্থির করিল, দেয়াল উড়াইয়া দেওয়া ছাড়া উপায় নাই; এ কাজ আবার প্রচুর বারুদ না হইলে সম্ভব নয়, অতএব একজনকে বারুদ আনিতে এখনই নাটোরে পাঠান আবশ্যক। দর্পনারায়ণের আদেশে তখনই দুই জন ঘোড়সোয়ার টাকা লইয়া নাটোর অভিমুখে রওনা হইয়া গেল। কিন্তু সকলেই বুঝিল, তারা দুই দিনের আগে ফিরতে পারিবে না।

এমন সময়ে জোড়াদীঘি হইতে একজন ঘোড়সোয়ার দেওয়ানজীর জরুরি চিঠি লইয়া আসিল। চিঠি পড়িয়া সকলে একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। উদ্বেগের কথাই বটে। দেওয়ানজী লিখিতেছেন—"আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাইলাম রক্তদহের প্রায় দুই তিন শত লাঠিয়াল ধুলোউড়ি হইতে আসিতেছে। তারা দুই চার দিন মধ্যেই রক্তদহ পৌঁছিবে। তাদের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই যা কর্ত্তব্য করিবেন নতুবা পরাজয় সুনিশ্চিত!

চিঠি পড়া হইলে সকলে কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল; প্রত্যেকে নিজের নিজের চিন্তার সূত্র ধরিয়া চলিতে লাগিল।

দর্পনারায়ণ সকলের আগে কথা বলিল—অতএব দেখা যাচ্ছে আমাদের হাতে দুই তিন দিন সময় আছে। এর মধ্যে যদি ওদের হারাতে পারি ভাল—নতুবা আর দেরি হলে ওরাই আমাদের হারাবে। তখন

ভিতরের লোকও বাইরে আসবে। দুই দলের চাপে, বাড়ী থেকে এতদূরে, আমাদের প্রাণ বাঁচানো কঠিন হয়ে উঠবে।

এমন সময়ে রমেশ দুই ছেলেকে সঙ্গে লইয়া তাঁবুতে প্রবেশ করিল।

দর্পনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিল—কে রে রমেশ, এত রাত্রে কি মনে করে?

রমেশ জোড় হাত করিয়া বলিল—হুজুর নালিশ আছে!

—কার বিরুদ্ধে?

রমেশ গদগদ হইয়া বলিল—ভগবানের বিরুদ্ধে।

সকলে বুঝিল রমেশ কিছু বেশি নেশা করিয়াছে।

রমেশ বলিল—হুজুর, ভগবান্ কেন আমাকে লেজ দিল না?

বিস্মিত দর্পনারায়ণ বলিল—সে কি রে?

রমেশ কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া বলিল—সে আবার কি? আমাকে এতদিন দেখছ—বল আমার লেজ আছে কি নেই?

বিশ্বনাথ বলিল—থাকলেই ঠিক হত।

রমেশ নিজের চিন্তার সায় পাইয়া সগর্ব্বে বলিল—তবে? কিন্তু লেজ ছাড়া কি এসব কাণ্ড হয়?

—কি কাণ্ড আবার?

—কি যে বল দাদাবাবু! লঙ্কাকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড, রামায়ণ পড়নি! এই বলিয়া সে বসিয়া পড়িয়া হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে গিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

—আমি কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি দাদাবাবু, ভোর রাত্রের স্বপ্ন, মিথ্যা হবার নয়, যে আমার লেজ গজিয়েছে, আর তাতে সাড়ে বত্রিশ গজ কাপড় জড়িয়ে—ওই যে দেখছ—ওই যে—এই বলিয়া সে এক দিকে আঙ্গুল তুলিয়া দেখালে—সবাই সে দিকে তাকাইল, কিন্তু রমেশ তাদের ভুল ভাজিয়া দিয়া বলিল—নাঃ, এ যে তাঁবুর মধ্যে তাই দেখা যাচ্ছে না

—ওই যে জমিদার-বাড়ী ওর মধ্যে লঙ্কাকাণ্ড করে বেড়াচ্ছি। আগুন, আগুন, দাউ দাউ করছে। এই বলিয়া সে পুত্রদ্বয়ের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি বলিস্ রে মধু—কি বলিস্ রে বিধু?

তারা গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

বিশ্বনাথ বলিল—তোরা বাপ-বেটা মিলে একসঙ্গে স্বপ্ন দেখেছিস্ না কি?

রমেশ বলিল—স্বপ্ন কেন? এই দেখ না—এই বলিয়া সে তার চাদরের অর্দ্ধদগ্ধ প্রান্ত দেখাইল।

তার কথায় তিন জনে হাসিতে লাগিল! রমেশ বলিল তা জানি তোমরা কি জন্য হাসছ? ভাবছ বেটা কল্কের আগুনে পুড়িয়ে এখন গল্প বলতে এসেছে।

কিছুক্ষণ থামিয়া আবার বলিল—তা তোমাদের আর দোষ দিই কেন? সবাই ওই কথা বলছে!

এই বলিয়া সে ছেলেদের দিকে ফিরিয়া বলিল—চল্ রে মধু, চল্ রে বিধু, এরা কেউ বিশ্বাস করবে না!

একটু থামিয়া আবার বলিল—করবে, করবে, যখন দাউ দাউ, চারিদিকে লঙ্কাকাণ্ড!

পুত্রদের লক্ষ্য করিয়া বলিল—সবগুলো ঢাক সঙ্গে নিস আর লম্বা লম্বা দড়ি সঙ্গে নিস্।

তারপর নিজেকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে বলিতে তাঁবু হইতে বাহির হইয়া গেল—বাবাঃ লেজ নেই বলেই কি আমি বানরের অধম! বানরের থাকবার মধ্যে তো বেশি একটা লেজ! আচ্ছা দেখাই যাক্।

রমেশ বাহির হইয়া গেলে দর্পনারায়ণরা নিজের নিজের তাঁবুতে গিয়া শয়ন করিল।

রাত্রি তখন গভীর। শত্রু মিত্র সকলেই সুপ্ত। কেবল রমেশরা

তিনজন জাগ্রত। তারা পাঁচ সাতটা ঢাক ঘাড়ে করিয়া অন্ধকারে নীরবে রক্তদহের প্রাচীরের নির্জ্জন এক অংশে গিয়া দাঁড়াইল। তার পরে একটার উপরে আর একটা ঢাক সাজাইয়া সিঁড়ির মত তৈয়ার করিয়া প্রাচীরের প্রায় সমান করিল। ঢাকগুলি যাতে পড়িয়া না যায়, সেই জন্য একটার সঙ্গে আর একটা দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিল।

এই রকমে উদ্যোগ-পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে প্রথমে রমেশ ঢাকের সিঁড়ি বাহিয়া প্রাচীরের উপরে গিয়া বসিল; তার পরে মধু উঠিল, তার পরে বিধু। সকলে প্রাচীরের উপরে উঠিয়া দড়ি দিয়া বাঁধা সেই ঢাকের সিঁড়ি টানিয়া তুলিয়া প্রাচীর ডিঙাইয়া ভিতরের দিকে স্থাপন করিল। তখন আবার আগের মত পর্য্যায়ক্রমে সিঁড়ি বাহিয়া তিন জনে নামিয়া গেল। নামা শেষ হইলে ঢাকের বাঁধন খুলিয়া ফেলিল।

রক্তদহের জমিদার-বাড়ী রমেশের অপরিচিত নয়, মাঝে মাঝে সে বাজনা বাজাইতে আসিয়া থাকে। যে দিকটায় তারা নামিয়াছিল, সে দিকটা নির্জ্জন; সেখানে কাছারীর পাশে একটা অপরিষ্কার গলির মত আছে; লোকজন বড় কেউ সেখানে আসে না; তারা তিনজনে ঢাকগুলি লইয়া সেখানে গেল—দেখিল, ছোট একটা অন্ধকার ভগ্নপ্রায় কুঠুরি আছে; তিন জনে সেই কুঠুরির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঢাকগুলি রাখিয়া বসিয়া পড়িল। তারা হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, কিছুক্ষণ জিরাইয়া লইয়া রমেশ বলিল—কাল রাত পর্য্যন্ত এখানে লুকিয়ে থাকতে হবে। তার পরে কাল রাতে হবে লঙ্কাকাণ্ড।

বিধু বলিল—খাব কি? রমেশ বলিল—ওই ছোট ঢাকটা কাট তো। এই বলিয়া সে একখানা ছুরি ফেলিয়া দিল। ঢাকের চামড়া কাটিতেই ভিতর হইতে চিড়া, মুড়ি, পাটালি গুড় বাহির হইয়া পড়িল।

রমেশ নিজের বুদ্ধিতে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া বলিল—খুব খা আর

ঘুমো, কিন্তু সাবধান কথাবার্ত্তা বলিস্ নে, কি বাইরে যাস্‌নে। তা হলে আমি আর বাঁচাতে পারব না!

এই বলিয়া সে শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে বলিল—দেখ যখন আমার নাক ডাকবার শব্দ হবে, আমাকে জাগাস্ নে, আমার মুখটা ফাঁক করে এক টুকরো গুড় পুরে দিবি! বুঝলি! ভুলিস নে! তোরা পালা করে জেগে থাক। আমি একটু চোখ বুজলাম! এই বলিয়া সে ঘুমাইতে আরম্ভ করিল—মধু বিধু পালা করিয়া জাগিয়া রহিল।

১৮

পরদিন দর্পনারায়ণ তার অসন্তুষ্ট সৈন্য ও সঙ্গীদলের মধ্যে একমাসের বেতন আগাম বিলি করিয়া দিল; যারা মরিতে প্রস্তুত তারাও অর্থ পাইলে খুসী হয়। অর্থাভাবই অনর্থের মূল; মানুষে বোধ করি শ্লেষ করিয়া বলে, অর্থই অনর্থ।

আজ আর আক্রমণ করা হইল না; নাটোর হইতে বারুদ না আসিয়া পৌছান পর্য্যন্ত নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকা ছাড়া উপায় নাই। দর্পনারায়ণ তাঁবুতে বসিয়াছিল—এমন সময় আব্বর আসিয়া উপস্থিত হইল।

দর্পনারায়ণ ইসারায় জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপার কি রে?

সে রামশিঙাটি প্রভুর পদতলে রাখিয়া হাতে ভঙ্গীতে বক দেখাইতে সুরু করিল।

দর্পনারায়ণ জানিত—ইহা করুণ-রসের চিহ্ন। কিন্তু এই যুদ্ধ ব্যাপারের মধ্যে হঠাৎ করুণার কারণ সে বুঝিতে পারিল না। তখন আব্বর তার সঙ্গী দাঁড়কাকটার মাথায় চড় মাড়িতে লাগিল; কাকটা যত চীৎকার করে—সেও অবোধ্য ভাষায় তত চীৎকার করে—আর হাত দিয়া আকাশে উড়িয়া যাইবার ভঙ্গী করে।

দর্পনারায়ণ তার ভাষা কিছু কিছু বুঝিতে পারে। কিন্তু তার কাছেও আজ ইহা স্পষ্ট হইল না। বিশেষ তার মন খারাপ ছিল; সে যেন একটু বিরক্তির সঙ্গেই আব্বরকে বিদায় করিয়া দিল। আব্বর বাহিরে যাইবার সময় হোঃ হোঃ শব্দে অট্টহাসি হাসিয়া চলিয়া গেল—সেই অনৈসর্গিক হাসি মর্শ্মের মত কঠিন, তুষারের মত শুভ্র, সোপানাবলীর মত ক্রমোচ্চ।

শীতের দিন দেখিতে দেখিতে শেষ হইয়া আসিল; সন্ধ্যার কিছু আগে আব্বর ঘুরিতে ঘুরিতে রক্তদহের জমিদার-বাড়ীর উত্তর দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল। আগেই বলিয়াছি জমিদার-বাড়ীর সে দিকটা অরক্ষিত; কারণ সে দিকে নদী ও বাড়ীর মধ্যে স্থান এত অল্প পরিসর যে, সেখানে আক্রমণের কোন আশঙ্কা নাই।

আব্বর সেখানে আসিয়া উচ্চ দেওয়ালের দিকে তাকাইয়া কি যেন খুঁজিতে লাগিল; দেখিল, দেওয়ালের উপরে বা ছাদে কোন লোক নাই। কিছুক্ষণ পরে সে যা খুঁজিতেছিল পাইল; একস্থানে দোতালার গায়ে একটি জানালা আছে; কিন্তু সেটা এত উঁচুতে যে, সেখানে উঠিবার সম্ভাবনা নাই। আব্বর এই জানালাটা দু'দিন আগে দেখিয়া গিয়াছে এবং মনে মনে একটা মতলব আঁটিয়াছে—আজ প্রভুকে তা জানাইবার জন্য তাঁবুতে গিয়াছিল। প্রভু তার মনোভাব বুঝিল না বটে, কিন্তু তার ধারণা প্রভু তার ইসারা বুঝিয়াছে এবং খুসী হইয়া বিদায় দিয়াছে। বোবা হইবার, নির্ব্বোধ হইবার সুবিধাও আছে।

সে সৈন্যদলের মধ্য হইতে দু'টি জিনিষ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল—একখানা ভাঙ্গা তলোয়ার আর একটা লম্বা দড়ি। প্রথমে সে তলোয়ারখানাকে কোমরে বাঁধিল; তারপরে দাঁড়কাকটার মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করিল। কাকটা অন্য সময়ে চীৎকার করে এখন চুপ করিয়া রহিল—তখন সে কাকের পায়ে দড়ির এক প্রান্ত বাঁধিয়া সেই জানালার লোহার শিক দেখাইয়া দিল। কাকটা দড়ি লইয়া উড়িয়া জানালার কাছে কিছুক্ষণ পাখা ঝট্‌পট্ করিয়া

উড়িল, তারপরে জানালার এক শিকের ভিতর দিয়া গলিয়া আর এক শিক দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া আবার কিছুক্ষণ পাখী ঝট্‌পট্‌ করিয়া উড়িল; তারপরে শো করিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া আব্বরের হাতে বসিল। আব্বর দড়ির দুই মাথা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। এখন দড়ি বাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেই ছাদের উপরে ওঠা যাইবে। তারপরে সন্ধ্যার অন্ধকারে ছাদ হইতে বাড়ীর মধ্যে নামিয়া দেউড়ি খুলিয়া দিবে—প্রভুর কাজ সহজ হইয়া যাইবে। বোবার মনেও উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে!

সে চারিদিকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া কাকাটকে ঘাড়ের উপর বসাইয়া লইয়া দুই হাত দিয়া দড়ি বাহিয়া উঠিতে লাগিল। এতক্ষণ কাকটা চুপ করিয়াছিল—কিন্তু এইবার উচ্চস্বঃরে ডাকিতে আরম্ভ করিল। কি তীক্ষ্ণ উচ্চ সে শব্দ! আব্বর দুর্বোধ্য ভাষায় যত তাকে থামিতে ইঙ্গিত করিল—ততই সে তীক্ষ্ণতর, তীব্রতর ধ্বনিতে ডাকিতে থাকে। আব্বর ধীরে ধীরে উচ্চে উঠিতেছে; ক্রমে সে একহাত দিয়া জানালার শিক ধরিল; এইবার এক পা জানালার চৌকাঠের সঙ্গে বাধাইয়া দিল—ছাদ আর কতকটা উঁচুতে দেখিবার জন্য মাথা তুলিয়া উপরে চাহিল—ছাদ বেশী উঁচুতে নয়, কিন্তু ও কি! সন্ধ্যার অন্ধকারে ছাদের কার্নিশের উপরে! ও কার বিকট মুখ তার দিকে তাকাইয়া আছে! তার মাথার চুল ও দাড়ি শাদা; চোখ দুটো ছোট আর লাল, মুখে শাদা দাঁতের সারি, না স্থির বৈদ্যুত হাসি! আব্বর চমকিয়া গেল! তখন তার নামিবার উপায় নাই—আর মাথার উপরে ওই অদ্ভুত মুখ! সে মুখ কথা বলে না, কেবল একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। আব্বর একহাত দিয়া জানালার শিক ধরিয়া, এক পা জানালার চৌকাঠে বাধাইয়া শূন্যে ঝুলিতেছে, আর মাথার উপরে, শঙ্কাজনক নৈকট্যে—ওই ভীষণ নারকীয় মুখ!

আব্বর অন্য হাত দিয়া কোমর হইতে তলোয়ারখানা খুলিয়া লইল—এইবার সে নারকীয় মুখ হইতে শব্দ বাহির হইল—সে কি হাসি! আব্বরের হাসির মত তাহা কঠিন, সরল, শুভ্র নয়; এ যেন হাসির রুদ্রাক্ষের মালা—

ঝিনি সুতায় গাঁথা; খানিকটা হাসি, খানিকটা নিস্তব্ধতা; আবার এক ঝমকা হাসি, আবার নিস্তব্ধতা; এ যেন গুটি-কাটা হাসি!

হাসি থামিলে মুখ কথা বলিল—ওরে দুষমণ! আবার তলোয়ার বের করা হচ্চে! বেটা বোবার আস্পর্দ্ধা দেখ!

কথা শুনিয়া বোঝা গেল—ও আর কেহ নয় বেঙা চৌকিদার। পরন্তপ তাকে বাড়ী ঘুরিয়া দেখিবার ভার দিয়াছিল; সন্ধ্যাবেলায় যথানিয়মিত ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ কাকের সন্দেহজনক শব্দে এ দিকে আসিয়া শূন্যপানে আব্বরকে দেখিতে পাইয়াছে। আব্বরকে সে ইতিপূর্ব্বে চোখে দেখে নাই, কিন্তু তার কথা লোকের মুখে শুনিয়াছে। প্রথমে সে একটু অবাক হইয়া গিয়াছিল; দুষমণ অখ্যাতি যার আছে, তাকে এই রকম ভাবে দড়ি বাহিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে উঠিতে দেখিলে কে না ভীত হয়? বেঙা ভাবিতেছিল জানালার শিকে দড়ি বাঁধিল কেমন করিয়া! সে ভাবনা পরে হইবে, আপাততঃ দুষমণকে শিক্ষা দিতে হইবে। সে কার্নিশের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া এক হাতে তলোয়ার বাহির করিল।

আব্বর সেই অন্ধকারেও বুঝিতে পারিল—লোকটার হাতের উজ্জ্বল পদার্থ তলোয়ার ছাড়া আর কিছু নয়। সেও তলোয়ার লইয়া প্রস্তুত হইল। তখন সেই অন্ধকারে, একজন শূন্যে ঝুলিয়া, আর একজন শূন্যে ঝুকিয়া পড়িয়া, একজন অদ্ভুত, আর একজন কিম্ভুত, দুইজনে তলোয়ার চালাইতে লাগিল। তারা কেহই তলোয়ার খেলিতে জানে না, সেইজন্যই তাদের আঘাত মর্ম্মান্তিক হইতে লাগিল। যারা তলোয়ারে নিপুণ, তারা মরিবার আগেও সে নৈপুণ্য একবার না দেখাইয়া পারে না, কিন্তু ইহারা তলোয়ারের শিল্পকলা জানে না, কেবল আঘাত করিতেই জানে! আব্বরের আঘাতে বেঙার শরীর হইতে রক্ত টপ টপ্ করিয়া আব্বরের মাথায় পড়িতে লাগিল; আবার বেঙার আঘাতে আব্বরের রক্ত টপ্‌টপ্ করিয়া শূন্যে পড়িতে লাগিল—মাটিতে বোধ হয় পড়িতে ছিল না, কারণ কাকটা উড়িয়া উড়িয়া তাহা পান করিতে ছিল!

আব্বর আঘাত করিল, বেঙা আঘাত করিল, কেহ কারো আঘাত প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল না—কেবল আঘাত, আর কেবল রক্তপাত। দুইজনেই নিস্তব্ধ।

আব্বরের তলোয়ারখানা বোধ হয় কিছু বেশি লম্বা ছিল, তাই বেঙাই অধিক আহত হইতেছিল। রক্তে তার গা ভাসিয়া যাইতেছে, মুখ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে; সে দেখিল এমন ভাবে বেশিক্ষণ চলিলে তার পরাজয় সুনিশ্চিত। তাই সে ঝুঁকিয়া পড়িয়া আব্বরের পায়ের উপরে জোরে আঘাত করিল; জানালার চৌকাঠ হইতে পা খসিয়া গেল। সে শূন্যে ঝুলিয়া তলোয়ার চালাইতে লাগিল। বেঙা আবার ঝুঁকিয়া পড়িয়া তার হাতে আঘাত করিল; শিক হইতে হাত খুলিয়া গেল। তবু দড়ি ধরিয়া আব্বর লড়িতে লাগিল. কিন্তু বহুক্ষণ লড়িয়া, রক্তপাতে সে ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল, বেঙা তার মাথায় বার দুই আঘাত করিল, আব্বর আর পারিল না; হাত হইতে দড়ি ফসকাইয়া গেল; একবার, এই শেষবার সেই বিকট অদ্ভুত হাসি হাসিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। মাটিতে পড়িয়া একবার আপাদ-মস্তক শিহরিয়া উঠিয়া নিঃসাড় হইয়া গেল। বেঙা ভাল করিয়া ঝুঁকিয়া দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মোতির মার উদ্দেশ্যে কি বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। জানালার শিকে বাঁধা দড়িটা খুলিয়া লইবার কথা তার মনে হইল না!

আব্বরের প্রাণহীন দেহ সেই নির্জ্জন স্থানে পড়িয়া রহিল; মুখে গায়ে শত ক্ষতচিহ্ন; তার চিরসাথী দাঁড়কাকটা সেই ক্ষতস্থানে ঠোঁট দিয়া পরমতৃপ্তি সহকারে রক্তমাংস আহার করিতে লাগিল; এতদিন পরে তার মুখে সাড়াশব্দ নাই! আব্বরের ওষ্ঠাধরে কিন্তু সেই শব্দহীন হাসির ভঙ্গী; মানুষটির মৃত্যুশোকে মূর্ত্তিমতী হাসি যেন ওষ্ঠাধরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

রমেশ শেষ রাত্রে ঘুমাইতে আরম্ভ করিয়াছিল—আর মধু ও বিধু পাশে বসিয়া তার নাসিকাগর্জ্জন থামাইবার জন্য তার ঈষন্মুক্ত মুখের মধ্যে পাটালি গুড়ের টুকরা ভরিয়া দিতেছিল। নাক ডাকিতে স্বরু করে, এক টুকরা গুড় মুখের মধ্যে পড়ে, নিদ্রিত রমেশ জাগ্রত লোকের মত তাহা দিব্য চুষিতে আরম্ভ করে; আবার গুড় পড়ে! এমনই করিয়া সারা দিনে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে প্রায় আড়াই-সের গুড় গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিয়াছে। বাপ ঘুমাইয়া পড়িলে ছেলেদের ইচ্ছা ছিল গুড়টুকু তারা চিড়া দিয়া খাইবে, কিন্তু বাপের, নাসিকাধ্বনি থামাইতেই সবটুকু গুড় গেল, তারা সারা দিন বসিয়া শুক্‌না চিড়া চর্ব্বণ করিয়াছে। সন্ধ্যাবেলা যখন গুড় ফুরাইল, তখন নিজের নাকের শব্দে জাগিয়া উঠিল; উঠিয়াই তার সে কি রাগ!

—বটে, বটে সব টুকু গুড় শেষ করেছিস, বেলা এখনও···

মধু, বিধু বাপের রাগের দৈহিক প্রমাণ অনেকবার পাইয়াছে, সেই জন্য তারা ঐক্যতানে বলিয়া উঠিল—না, বাবা সূর্য্য অনেকক্ষণ পাটে বসেছে রাত প্রায় এক প্রহর।

রমেশ উঁকি মারিয়া দেখিল বাহিরে অন্ধকার। কাজেই সে শান্ত হইল; বলিল—তা বটে। তোদের দোষ নেই।

দেখি চিড়ে কিছু আছে, না তাও শেষ করেছিস।

মধু চিড়া দেখাইয়া দিল—অনেক ছিল। রমেশ বলিল, শুকনো চিড়ে তোরা আর খাস্‌নে ছেলেমানুষ আবার অসুখ করবে, দে।

এই বলিয়া সে চিড়ার পুটুলী টানিয়া লইয়া নাবালক পুত্রদ্বয়কে অসুখ হইতে বাঁচাইবার জন্যই যেন কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতার মত পরম আগ্রহে খাইতে লাগিল। পুত্রদ্বয় সবিস্ময়ে দেখিল, কথায় শুকনো চিড়ে ভেজে না; এ প্রবাদ

অপবাদ মাত্র। অল্প সময়ের মধ্যে চিড়া অন্তর্হিত হইল। চিড়া ফুরাইলে রমেশ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল—ছেলেদের ফাঁড়া কাটিয়া গেল ভাবিয়া, ক্ষুধা মিটিয়াছে বলিয়া নয়।

এইবার সে কাজের কথা আরম্ভ করিল—বলিল—দেখ আর একটু রাত হোক এখনও দু'চারজন লোক জেগে আছে, মনে হচ্ছে। সকলে ঘুমুলে—বুঝলি তখন দেখিস্ কি মজা হয়। ততক্ষণ এক কাজ কর, ওই ঢাক কয়টার চামড়া কেটে ফেল।

তিন জনে মিলিয়া ঢাকের চামড়া কাটিয়া ফেলিল, ভিতর হইতে শুক্‌নো, শোলা, কিছু বারুদ, আলকাতরা মাখানো ন্যাকড়া বাহির হইল; চক্‌মকি আর শোলা বাহির হইল। সেগুলি এক জায়গায় স্তূপাকার করিয়া সাজাইয়া রমেশ বলিল, ওরে বানর দুটো বুঝলি কি হবে, এগুলো দিয়ে।

তাদের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আবার বলিল, লঙ্কাকাণ্ড রে লঙ্কাকাণ্ড! আমি হব হনুমান আর তোরা দু'জন আমার বাচ্চা!

মধু ঈষৎ আপত্তি করিল, বাবা হনুমানের তো বাচ্ছা ছিল না।

রমেশ বলিল, ওটা শাস্তরের ভুল! বাচ্ছা ছিল না তো এত হনুমান এলো কোত্থেকে!

তার পরে একটু থামিয়া বলিল, শাস্তর মেনেই চলা ভাল। তোরা দুইজন জাম্বুবান আর অঙ্গদ!

মধু. বিধু এই নূতন পদমর্য্যদা অনুসারে গম্ভীর হইয়া বসিল।

ক্রমে রাত নিশুতি হইল, জমিদার-বাড়ী নিস্তব্ধ হইয়া গেল, তখন তিন জনে সেই সব দাহ্য পদার্থ বহন করিয়া বাহির হইল। তারা যেখানে আশ্রয় লইয়াছিল, তার কিছুদূরে কয়েকখানা খড়ের চালা ছিল; তাতে সারা বছরের জন্য কাঠখড়ি, লক্‌ড়ি সঞ্চয় করিয়া রাখা হইত, সে দিকে লোকজন থাকিবার কথা নয়।

রমেশ, মধু ও বিধু সেইখানে গিয়া লক্‌ড়ির তলে, চালে দাহ্য পদার্থ সযত্নে

সাজাইয়া চকমকি ঠুকিয়া আগুন ধরাইয়া দিল। দাহ্য পদার্থ ও শুক্‌নো কাঠ অগ্নিস্পর্শ মাত্রে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! তারা তিন জনে ছুটিয়া গিয়া সেই গুপ্ত ঘরে আশ্রয় লইল।

আগুন জ্বলিয়া উঠিল, স্তূপীকৃত লক্‌ড়ি জ্বলিয়া উঠিল, খড়ের চাল জ্বলিয়া গেল, ক্রমে বাঁশের গাঁট ফাঠার শব্দে জমিদার-বাড়ী বারংবার চমকিয়া উঠিল।

আগুনের আলোতে, ধোঁয়াতে, বিশেষ গাঁট ফাঁটার শব্দে বাড়ীর লোকজন কোলাহল করিয়া জাগিয়া উঠিল। তখন বড় মহামারি পড়িয়া গেল। লোকজন উঠিতেছে, ছুটিতেছে, কোলাহল করিতেছে, কেহ প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতেছেনা, সকলেই পরস্পরকে প্রশ্ন করিতেছে—আগুন? কে লাগাইল? কেমন করিয়া লাগিল? কেমন করিয়া নিভান যায়? ওরে কর্ত্তাকে ডাক, দেওয়ানজীকে খবর দে! হায়! হায়! ইত্যাদি।

আগুন ক্রমে বাড়িয়াই চলিল, প্রথমে যেখানে লাগিয়াছিল, সেখানে স্ফুলিঙ্গ ক্রমে অন্যান্য ঘরের চালায় লাগিতে আরম্ভ করিল, দেখিতে দেখিতে বৃহৎ বাড়ী অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হইল।

আগুনের আলোতে, ধোঁয়ায়, বাঁশ ফাটার শব্দ ও লোকের কোলাহলে প্রাচীরের বাহিরে চৌধুরীদের ক্ষুদ্র সৈন্যদল জাগিয়া উঠিল—তারাও প্রথমে বুঝিতে পারিল না কেমন করিয়া কি হইল। দর্পনারায়ণরা তিন ভাই ও আলিবর্দ্দি সবিস্ময়ে এই ব্যাপার লক্ষ্য করিল। রমেশ হাড়ির পূর্ব্বরাত্রের অভিনয়ের কথা কারও মনে পড়িল না।

প্রথমে আলিবর্দ্দি কথা বলিল, সে বলিল, দাদাবাবু, কাজ যেই করুক, আর যেমন করেই হোক, এমন সুবিধে আর হবে না, এই সময় একবার বাড়ীতে ঢুকিবার চেষ্টা করলে হয় না!

আলিবর্দ্দির কথা শুনিয়া, সকলেই ঘটনাটাকে অন্য দিক হইতে দেখিতে আরম্ভ করিল। সকলেই স্বীকার করিল—এমন সুযোগ আর আসিবে না।

তখনই সৈন্যদলের মধ্যে প্রাচীর ডিঙাইবার হুকুম প্রচার করা হইল। সকলেই বকশিস ও লুঠের আশায় প্রাচীর লঙ্ঘন করিবার পন্থা খুঁজিতে লাগিল—আর দর্পনারায়ণরা তিন জন, আলিবর্দ্দি বাছা বাছা একদল লাঠিয়াল ও শড়কিওয়ালা লইয়া দেউড়ীর কাছে অপেক্ষা করিয়া রহিল। ইতিমধ্যে যদি প্রাচীর ডিঙাইয়া গিয়া অন্যেরা দেউড়ী না খুলিয়া দিতে পারে, তবে দেউড়ী ভাঙিয়া ঢুকিবে।

প্রাচীরের চারিদিকে লোকজন ছড়াইয়া পড়িল; একদল ঘুরিতে ঘুরিতে নদীর দিকে গেল—এ-দিকটায় তারা বড় আসে নাই, কাজেই তাদের পরিচিত নয়, কিন্তু খুঁজিতে খুঁজিতে তারা একটা জানালার সঙ্গে এক গাছা শক্ত দড়ি ঝুলিতেছে দেখিতে পাইল! এ সুবিধা ছাড়িবার পাত্র তারা নয়, দড়ি বাহিয়া একে একে তারা ছাদের উপর উঠিতে লাগিল; অল্পক্ষণের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ জন লোক ছাদের উপর গিয়া দাঁড়াইল; তখন তারা বিকট ডাক ছাড়িয়া লাঠি, শড়কি লইয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া পড়িল; কেহই লক্ষ্য করিল না, দড়ির নিকটেই আব্বরের মৃতদেহ পড়িয়াছিল।

দর্পনারায়ণদেরও বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না—তারা দেখিল বৃহৎ দেউড়ী ধীরে ধীরে খুলিয়া গেল, যে দেউড়ী ভাঙিবার এত ব্যর্থ চেষ্টা এতদিন তারা করিয়াছে। তারা বুঝিল, জোড়াদীঘির লোকেরা দরজা খুলিয়া দিয়াছে; জোড়াদীঘির লোকই বটে, কিন্তু ইহারা কেমন করিয়া আসিল!

দর্পনারায়ণ বিস্মিত হইয়া বলিল—তুই রমেশ! রমেশ দণ্ডবৎ হইয়া বলিল, আজ্ঞে না দাদাবাবু, আমি হনুমান, এরা দুইজন, নল আর অঙ্গদ!

—কি বল্‌ছিস্‌ রে?

রমেশ পুনরায় বলিল, আজ্ঞে এত বড় একটা লঙ্কাকাণ্ড করে ফেললাম তবু বিশ্বাস হল না! দর্পনারায়ণ দেখিল ইহা কথা বলিবার সময় নয়, বলিল, আচ্ছা পরে হবে, এখন যা।

আলিবর্দ্দি ও তারা চারজন বন্দুক তলোয়ার লইয়া প্রবেশ করিল, তাদের অনুসরণ করিয়া জলপ্রবাহের মত জোড়াদীঘির লোক জমিদার-বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল।

রক্তদহের সৈন্যদল এতক্ষণ আগুন নিভাইতে ব্যস্ত ছিল, এখন দেখিল নূতনতর বিপদ; জোড়াদীঘির লোক বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে; তারা আগুন ছাড়িয়া আত্মরক্ষায় নিযুক্ত হইল।

পরন্তপ সৈন্যদলকে কাছারীর আঙিনা হইতে সরাইয়া আনিয়া অন্তঃপুরের আঙিনায় সমবেত করিয়া অন্তঃপুর রক্ষা করিবার হুকুম দিল। কিন্তু ঘটনা যেমন দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছিল, তাতে ভীত, বুদ্ধিভ্রষ্ট রক্তদহের পক্ষে, বেশীক্ষণ আত্মরক্ষা করা সম্ভব নহে। প্রথমে সম্মুখ হইতে, ক্রমে চতুর্দ্দিক হইতে তারা আক্রান্ত হইতেছিল, কারণ জোড়াদীঘির যে সব লোক দেউড়ী দিয়া ঢুকিয়াছিল, তা ছাড়া প্রতি মুহূর্ত্তে বহুসংখ্যক লোক নানা স্থানে প্রাচীর ডিঙাইয়া বাড়ীর মধ্যে পড়িতে লাগিল।

দর্পনারায়ণ আলিবর্দ্দিকে আক্রমণ করিবার হুকুম দিল; চৌধুরীদের বন্দুক একসঙ্গে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। রক্তদহের বন্দুক তার প্রত্যুত্তর দিল। কয়েকবার উভয় পক্ষে বন্দুক চলিবার পরে দেখা গেল, কাজের চেয়ে অকাজই বেশী হইতেছে, দুইদলের সৈন্য এমন মিশিয়া গিয়াছে যে, নিজের বন্দুকে নিজের লোক মরিতেছে। তখন লাঠিয়ালরা অগ্রসর হইয়া অন্যদলের উপর গিয়া পড়িল—লাঠির ঠকাঠক আওয়াজ ও মাঝে মাঝে লাঠিয়ালদের বিকট চীৎকার ছাড়া আর কিছুই শ্রুত হইতে ছিল না। যার এক ঘা লাঠি লাগিতেছিল, সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছিল না—দেখিতে দেখিতে রণাঙ্গণ হতাহতে ভরিয়া গেল। রক্তদহ বীরত্বের সঙ্গে লড়িতেছে বটে, কিন্তু ভাগ্য আজ নানা ভাবে তাকে বিড়ম্বিত করিতেছে, নৈশযুদ্ধে অকস্মাৎ অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইলে জয়লাভ এক প্রকার অসম্ভব। ক্রমে রক্তদহের দল পিছু হটিতে লাগিল; সংখ্যায় তারা আততায়ীর অপেক্ষা

অনেক কম, কাজেই সকলেই বুঝিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের আর বাধা দিবার শক্তি থাকিবে না।

দর্পনারায়ণ, রঘুনাথ বিশ্বনাথ ও আলিবর্দ্দি চারজন একত্র দাঁড়াইয়া লড়াই দেখিতেছিল। দর্পনারায়ণ বলিল,—আলিবর্দ্দি এত নিরপরাধ লোক মেরে কি লাভ! আমরা তো চাই পরন্তপ রায়কে।

আলিবর্দ্দি বলিল—কিন্তু এরা থাকতে তাকে তো পাওয়া সম্ভব নয়। দাঁড়াও না, দাদাবাবু, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আলিবর্দ্দির কথাই ফলিল—ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রক্তদহের যে মুষ্টিমেয় লোক অনাহত রহিল—তাদের প্রাণ লইয়া পলায়ন ছাড়া আর গত্যন্তর রহিল না। তখন আলিবর্দ্দি ও দর্পনারায়ণ পরন্তপের সন্ধানে ভিতরে ঢুকিল; জোড়াদীঘির যারা সুস্থ ছিল, তারা লুঠ-তরাজের জন্য কাছারী ও মালখানার দিকে ছুটিল।

দর্পনারায়ণ এ বাড়ীতে কখনও আসে নাই—কাজেই সব জায়গা পরিচিত নয়, তবু তাকে অধিক সন্ধান করিতে হইল না। সে দোতলায় উঠিয়া দেখিতে পাইল, একটি ঘরের মধ্যে পরন্তপ একাকী দণ্ডায়মান। দর্পনারায়ণ প্রবেশ করিয়া বলিল—সে দিনের দেনা শোধ করিবার জন্য আজ এলাম।

পরন্তপ বলিল—এই নিন্! এই বলিয়া সে বন্দুক তুলিয়া তাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল। তার হাতের কাছেই যে একটা বন্দুক ছিল, দর্পনারায়ণ তা লক্ষ্য করে নাই। গুলিটা তাকে আঘাত না করিয়া ঘাড়ের কাছ দিয়া চলিয়া গেল।

দর্পনারায়ণ বলিল—এবার আমার পালা। কিন্তু আমি বন্দুকের ভক্ত নই।

পরন্তপ বলিল—তবে কি তলোয়ারের?

দর্পনারায়ণ বলিল—ও সব দিয়ে তো জানোয়ার মারি! কিন্তু আজ আর মারব না। আপনাকে একবার জোড়াদীঘিতে নিয়ে যেতে চাই।

পরন্তপের ক্রোধ শেষ সীমায় আসিয়া পৌছিল—বলিল,—কি জোর করে!

—প্রয়োজন হলে করব বই কি। কিন্তু আশা করি সে অপ্রিয় কাজ করতে হবে না।

পরন্তপ পুনরায় শ্লেষের সঙ্গে বলিল—এখনও দেখছি আপনার প্রিয় অপ্রিয় জ্ঞান লোপ পায় নি। ধন্যবাদ!

দর্পনারায়ণ আলিবর্দ্দিকে ডাক দিল; আলিবর্দ্দির সঙ্গে আর চার পাঁচজন অনুচর গোটা দুই মশাল প্রবেশ করিলে সে বলিল,—আলিবর্দ্দি রায় মশায়কে নিয়ে আমার তাঁবুতে যা। সম্ভ্রান্ত লোক, সব সময়ে সঙ্গে চারজন আরদালী যেন থাকে, আর তুই স্বয়ং থাকবি। আর শীগ্‌গির একখানা পাল্কী জোগাড় কর গে—ওঁকে আমাদের সঙ্গে জোড়াদীঘিতে নিয়ে যেতে হবে। যা। আর আমাকে একটা মশাল দিয়ে যা—আমি পিছে পিছে আসছি।

পরন্তপ দেখিল, আপত্তি করিলে আপমানের আশঙ্কা আছে, কাজেই সে নীরবে আলিবর্দ্দি ও অনুচরদের সঙ্গে রওনা হইল।

তারা চলিয়া গেলে দর্পনারায়ণ মশাল লইয়া আপন মনে চলিতে আরম্ভ করিল; অন্তঃপুরের পথ চিনিত না, কাজেই চলিতে চলিতে এক দালান হইতে অন্য এক দালানে আসিয়া উপস্থিত হইল—এতক্ষণ সে নীচের দিকে চাহিয়া চলিতেছিল—এবার চোখ উঠাইতেই মশালের পীতাভ আলোতে দেখিল, সম্মুখের দরজায় দুই চৌকাঠ দুইহাতে ধরিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—ইন্দ্রাণী! উভয়ের চোখা-চোখি হইল। এক, দুই, তিন, পর মুহূর্ত্তেই দর্পনারায়ণের কম্পিত হাত হইতে মশাল পড়িয়া নিভিয়া গেল—সে যে-পথ ধরিয়া আসিয়াছিল, সেই পথ দিয়া দ্রুত ফিরিয়া গেল।

এ দিকে জোড়াদীঘির জনতা জমিদার-বাড়ী লুটিয়া, ভাঙ্গিয়া, চুরিয়া, ছিঁড়িয়া, পোড়াইয়া, ফেলিয়া, ছড়িয়া অনর্থ করিল। যে-যাহার লুটের মাল লইয়া জোড়াদীঘি রওনা হইল; কাহাকেও আদেশ করিবার প্রয়োজন হইল

না। দর্পনারায়ণ আট দশখানা গরুর গাড়ী করিয়া নিজেদের হতাহত লোকদের জোড়াদীঘি রওনা করাইয়া দিল এবং ভোর হইবার আগেই পরন্তপকে পাল্কীতে চড়াইয়া নিজেরা ঘোড়ায় চড়িয়া বাড়ী রওনা হইল।

রক্তদহের দেওয়ানজী গত্যন্তর না দেখিয়া নাটোরের কালেক্টারকে সংবাদ দিবার জন্য অন্যপথে দ্রুতগামী ঘোড়-সওয়ার পাঠাইয়া দিলেন।

আর আব্বরের মৃতদেহ যেখানে পড়িয়াছিল, সেইভাবেই পড়িয়া রহিল। কেহ তার সন্ধানও করিল না, কিংবা অভাবও অনুভব করিল না; দাঁড়কাকটা মাংস খাইয়া পেট ভরিলে কোথায় উড়িয়া গেল; আর সব চেয়ে বিস্ময়ের এই যে- বহুদিন পর্য্যন্ত মৃতদেহটা পড়িয়া রহিল—শিয়াল কুকুরে পর্য্যন্ত খাইবার জন্য কাছে আসিল না। বোধকরি, তারা মৃতের হাসির সঙ্গে পরিচিত নয়, কারণ, শেষ পর্য্যন্ত তার মুখে অট্টহাসির সেই নীরব ভঙ্গীটা অঙ্কিত ছিল।

২০

পরন্তপকে ধরিয়া লইয়া যাওয়ার পরে তার আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই; দেওয়ানজী অনেকবার খোঁজ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁর লোক জোড়াদীঘি পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই। জোড়াদীঘি ও রক্তদহের মধ্যবর্ত্তী স্থান সম্পূর্ণ অরাজক হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমে জমিদারদের মধ্যে রেষারেষি ছিল, কিন্তু ক্রমে সাধারণ লোক ও তার সুযোগ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন অবস্থা এমন হইয়াছে, যে যাকে পারিতেছে, মারিতেছে, লুট করিতেছে, বাড়ী-ঘরে আগুন লাগাইয়া দিতেছে, হালের গরু খুলিয়া লইতেছে, মাঠে সস্য পাইলে কাটিয়া লইয়া যাইতেছে। জোড়াদীঘির প্রজারা আর রক্তদহের প্রজার জন্য অপেক্ষা না করিয়া জোড়াদীঘির প্রজার উপরেই অত্যাচার করিতেছে, আবার রক্তদহের বেলাতেও ঠিক সেই অবস্থা।

এহেন অবস্থায় দেওয়ানজীর প্রেরিত লোক যে জোড়াদীঘি পৌছিতে পারিবে না, তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? তিনি যত গুলি লোক পাঠাইয়াছিলেন, সকলেই মার খাইয়া লুণ্ঠিত হইয়া ফিরিয়া আসিল; দেওয়ানজী পরন্তপ রায়ের কোন সংবাদ পাইলেন না।

কিন্তু দিন তিন চার পরে সংবাদ গুজব আকারে রটিতে রটিতে শেষে রক্তদহের জমিদার বাড়ীতে আসিয়া পৌছিল। দেওয়ানজী শুনিতে পাইলেন, পরন্তপ জোড়াদীঘিতে বন্দী। আরও শুনিলেন, প্রথমে তাকে সসম্মানে জমিদার-বাড়ীতে রাখা হইয়াছিল। পরন্তপ তিনি চার বার পলাইবার চেষ্টা করেন, শেষে বাধ্য হইয়া তাকে মাটির নিম্নস্থ কয়েদখানায় বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। দেওয়ানজী নিরুপায় হইয়া বসিয়া পড়িলেন। তিনি দুর্ঘনাটার পরেই নাটোরে কালেক্টারের কাছে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন, সে লোকও ফিরিয়া আসিল না!

ক্রমে সমস্ত সংবাদ ইন্দ্রাণীর কাছে পৌছিল। আজ তিন দিন হইল, স্বামীর সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে, দেওয়ানজী ইচ্ছা করিয়াই তাকে এ সব দুঃসংবাদ জানিতে দেন নাই; তাঁর ধারনা ছিল, একেবারে পন্তরপকে উদ্ধার করিয়া ইন্দ্রাণীকে খবর দিবেন। কিন্তু সে আশা নাই দেখিয়া বাধ্য হইয়া ইন্দ্রাণীকে সমস্ত জানাইলেন, এক বিন্দুও গোপন করিলেন না।

গোপন করিবার প্রয়োজনও ছিল না ঘটনা দুর্ভাগ্যের চরম সীমা পর্য্যন্ত গড়াইবে তাহা জানিত। সে দেওয়ানজীকে বিদায় করিয়া দিয়া প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনের জন্য নিজের কক্ষে গিয়া দ্বার বন্ধ করিল।

ইন্দ্রাণী একাকী অনেক দিন পরে নিজের মনখানাকে সম্মুখে বিছাইয়া দিয়া ভাবিতেছিল, পরন্তপকে সে কেন উদ্ধার করিতে চায়! পরন্তপের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ? না, এখনও তার প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হয় নাই—। তাই তাকে আবশ্যক? কিংবা নিজের অজ্ঞাতসারে সে স্বামীকে ভালবাসিতে

আরম্ভ করিয়াছে, সেইজন্য? ভালবাসার কথা মনে পড়িয়া এত দুঃখেও তার হাসি পাইল।

বহুক্ষণ ধরিয়া সে ভাবিল—কিন্তু প্রতিকারের কোন পথ তার চোখে পড়িল না। একবার জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—বাড়ীর লুণ্ঠিত, দগ্ধ চূর্ণীকৃত, অরাজক বিশৃঙ্খলা চোখের পীড়াদায়ক, জানালা বন্ধ করিয়া আবার শয্যায় আসিয়া বসিল।

ক্রমে একটিমাত্র পন্থা, যাহা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না তার চোখে পড়িল। ইহা সব চেয়ে কঠিন, কিন্তু ইহা ছাড়াও যে আর পথ নাই। যে দুইজন লোক তার সবঁচেয়ে বড় শত্রু, যারা বারংবার তার নারীত্বকে অপমান করিয়াছে, এখনও মনে করিতেছে, তাদের হাতেই প্রতিকারের উপায়। চাঁপা ও বনবালা।

সে ভাবিল দর্পনারায়ণের পত্নীকে যদি একখানা চিঠি দেওয়া যায়, তবে হয় তো সে দর্পনারায়ণকে ধরিয়া পরন্তপকে মুক্তি দিতে পারে। আর চিঠি চাঁপা ছাড়া কে জোড়াদীঘিতে লইয়া যাইবে। চাঁপা স্ত্রীলোক বলিয়া হয়তো পথে কেহ তাকে বাধা না দিতেও পারে! একবার সে জোড়াদীঘিতে পৌছিলে বুদ্ধি করিয়া চিঠিখানা অন্তঃপুরে জমিদার পত্নীর হাতে পৌছাইয়া দিতে পারে। চাঁপা বুদ্ধিমতী ও কৌশলী।

ইন্দ্রাণী অনেকবার ভাবিল—দেখিল, ইহা ছাড়া পথ নাই; স্বামীকে উদ্ধার করিতে হইলে, তার চরমতম দুই শত্রুর কাছে বিনীত স্বীকার করিতে হইবে।

উপায়টাকে বিশ্লেষণ করিয়া ইন্দ্রাণীর হাসি পাইল। বড় দুঃখের হাসি; বড় শ্লেষের হাসি? নিজের অবস্থা দেখিয়া হাসি; ইন্দ্রাণী বুঝিল, বিধাতা শ্লেষ-রসিক, কেমন করিয়া তিনি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্যকে বাস্তব করিয়া তোলেন; একান্ত অসম্ভবকে পূর্ণ-প্রকট করেন; কেমন করিয়া শিকারকে মুক্তি দিয়া ঘটনার নাগপাশে শিকারীকে বাঁধিয়া ফেলেন; কেমন করিয়া তিনি ইন্দ্রাণীকে দিয়া সবচেয়ে অপমানকর কাজ করাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন।

ইন্দ্রাণী যদি আর দশ জনের মত হইত, তবে হয় তো ইহাতে অনায়াসে রাজী হইত; সে যদি অসাধারণ হইত, তবে হয় তো সম্মত হইত না কিন্তু সে একেবারে বিশিষ্ট, সে ভালও নয়, মন্দও নয়, সে অদ্বিতীয়, কাজেই সে রাজী হইল; একেবারে বিনা দ্বন্দ্বে নয়; অনেকখানি আত্মসংগ্রাম করিবার পরে সে সম্মত হইল।

ইন্দ্রাণী বুঝিল, আর একবার তার মাথা নত হইল। চাঁপা প্রস্তাব শুনিয়া মনে মনে হাসিবে, যদিও কাজ করিতে সে অসম্মত হইবে না, আর দর্পনারায়ণের পত্নী! সেও হাসিবে, হয় তো সম্মত হইবে না, হয় তো কত বিদ্রূপ করিবে! কিন্তু ইন্দ্রাণীকে তো পৃথিবীর হাসি-কান্নার হিসাব করিয়া কাজ করিলে চলিবে না—সে তো পাষাণী। হিমালয়ের ঘরে একদিন মানবী জন্মিয়াছিল—আর মানুষের ঘরে সে পাষাণী হইয়া জন্মিয়াছে।

ইন্দ্রাণী মনঃস্থির করিল, তারপরে চিঠি লিখিতে ও চাঁপাকে অনুরোধ করিতে উঠিয়া গেল।

২১

বাণীবিজয় সেদিন ভোরবেলা টোলের কাছে বসিয়া দাঁতন করিতেছিল এমন সময়ে চাঁপা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ইন্দ্রাণীর চিঠি লইয়া চাঁপার জোড়াদীঘি আসিতে পুরা দু'টি দিন লাগিয়াছে; সে পুরুষ হইলে আসিতেই পারিত না, নেহাৎ স্ত্রীলোক বলিয়া কেহ বাধা দেয় নাই, বিশেষ চাঁপার মত স্ত্রীলোক। অনেক কষ্টে অনেক সন্দেহের হাত এড়াইয়া, সে কোনরূপে জোড়াদীঘি পর্য্যন্ত আসিয়াছে—সম্মুখে এখনও সবচেয়ে কঠিন কাজটি; তাকে জমিদার-পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইবে। পাছে চিঠিখানা খোয়া যায়, এই ভয়ে তাহা সে চুলের খোঁপার মধ্যে গুজিয়া রাখিয়াছে। টোলের গা দিয়া সদর রাস্তা—সে দেখিল একজন বামুন পণ্ডিত বসিয়া দাঁতন করিতেছে; চাঁপা সহজাত বুদ্ধির বলে

বুঝিল—ইহাকে দিয়া কাজ উদ্ধার হইতে পারে। চাঁপা মুচকি হাসিয়া বাণীবিজয়ের দিকে অগ্রসর হইল।

বাণীবিজয় চাঁপাকে আগে দেখে নাই—তবু সাহস করিয়া দন্তধাবনের সঙ্গে সঙ্গে গুণ গুণ করিয়া গান ধরিল—

"প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ হেরিনু
দিন যাবে আজি ভাল—"

চাঁপা আরও একটু মুচকি হাসিয়া দাঁড়াইল; বাণীবিজয়ের মাথা ঘুরিয়া গেল—তবু সে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিতে সাহস করিল না—যেন নিজের মনে বলিতে লাগিল—

"কথায় হীরার ধার, হীরা তার নাম
দাঁত ছোলা, মাজা দোলা হাস্য অবিরাম—"

চাঁপা একটা প্রণাম করিয়া বলিল—পণ্ডিত মশাই প্রাতঃ প্রণাম, আমার নাম হীরা নয়, চাঁপা।

বাণীবিজয় একটু সাহস পাইয়া বলিল—চাঁপা, চম্পকসুন্দরী! কি চমৎকার নাম!

চাঁপা আর একবার হাসির তরঙ্গ তুলিয়া বলিল—ঠাকুর শুধু নামই দেখলে!

বাণী বলিল—নাম কেন, কি মনে হচ্ছে বলবো—'অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদাম গৌরীং'—

চাঁপা বাধা দিয়া বলিল—ঠাকুর আমি মূর্খ মেয়েমানুষ—যা মনে হচ্ছে তা সোজা কথায় বল না—

বাণী সাহস পাইয়া বলিল—বলব, বলব—এই বলিয়া চারিদিকে একবার তাকাইয়া লইল।

চাঁপা বলিল—আর বলতে হবে না ঠাকুর, কেন আর দিনের আলোয় লজ্জা দেবে!

বাণীবিজয় এবার বাস্তবতায় ফিরিয়া আসিল—জিজ্ঞাসা করিল—তোমার বাড়ী কোথায়?

চাঁপা বলিল, অনেক দূরে। আর আমার মত লোকের বাড়ী-ঘরের সংবাদেই বা কি দরকার! গরীব মানুষ চাকরী খুঁজে বেড়াচ্ছি—ঠিক করে দিতে পার?

বাণী হাত নাড়িয়া বলিল, "হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়"—তা বাপু তোমার আবার চাকরীর কি দরকার?

চাঁপা বলিল—তা নইলে চলবে কি করে? শুনেছি এখানকার জমিদার মস্ত লোক; তার বাড়ীতে আমাকে নিয়ে চল না।

বাণীবিজয় মনে ভাবিল, চাঁপাকে নিজের কাছে রাখিবার সাহস ও সামর্থ্য তার নাই। তবে যদি সে জমিদার-বাড়ীতে থাকিয়া যায়, তবে, পরের খরচে প্রেমালাপ চলিতে পারে। তাই সে বলিল, খব পারি, এস, আমার ঘরে এসে একটু বিশ্রাম কর, আমি নিয়ে যাব তোমাকে জমিদার-বাড়ীতে।

চাঁপা বাণীবিজয়ের ঘরে প্রবেশ করিয়া একখানা মাদুর পাতিয়া বসিল। বাণীবিজয় যাহা ভয় করিতেছিল, ঠিক তাই ঘটিল। যেখানে বাঘের ভয় সন্ধ্যা না কি সেখানেই আসন্ন হয়, হঠাৎ, ঝড়ের গতিতে পুঁটি তার ঘরে প্রবেশ করিল, ইহার চেয়ে বোধ করি বাঘের আসাই ভাল ছিল।

সে এক মুহূর্ত্ত উভয়ের দিকে তাকাইয়া বাণীবিজয়ের দিকে অগ্রসর হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, তবে রে ঠাকুর—

বাণী শঙ্কিত হইয়া বলিল—আহা পুঁটি অলমতি ক্রোধেন (সে পূর্ব্ব অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছে, সংস্কৃত ভাষা ক্রোধ উপশমে বিশেষ কাজ করে। কিন্তু আজ কোন ফল হইল না)। বিদেশী মানুষটাকে আশ্রয় দিয়েছি—

পুঁটির উদ্দীপ্ত কণ্ঠ বলিয়া চলিল—বটে, বটে! অতিথিশালা খুলেছ তুমি! আজ তোমারই একদিন কি আমার একদিন।

এই বলিয়া সে চাঁপার দিকে চাহিয়া বলিল, বলি ভাল মানুষের মেয়ে—এ

তোমার কেমন ব্যাভার! চাঁপা এ দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত ছিল না—পথে মেয়েমানুষ বলিয়া বিপদ এড়াইয়া আসিয়াছে, এখানে মেয়েমানুষ বলিয়াই বিপদ্! সে কোন উত্তর দিবার আগেই পুঁটি একটান মারিয়া চাঁপার খোঁপা খুলিয়া দিল। ইন্দ্রাণীর চিঠিখানা মাটিতে পড়িতেই পুঁটি তুলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল…বটে, বটে আবার চিঠি লেখাও হয়েছে।

চাঁপা চিঠিখানা কাড়িয়া লইবাব জন্য পুঁটিকে আক্রমণ করিল—সে প্রাণপণ বলে চিঠি চাপিয়া ধরিয়া রহিল। দুইজনের ধ্বস্তাধ্বস্তির ফলে চিঠিখানা ছিঁড়িয়া খণ্ড হইয়া গেল।

ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া বাণী বিজয় ঘর ছাড়িয়া অন্য ঘরে গিয়া ভগবান্ বোপদেবের রচিত মুগ্ধবোধ ব্যাকবণে মনোনিবেশ করিল। হৃদয়াবেগকে প্রশমিত করিতে ব্যাকরণের মত এমন অমোঘ ঔষধ আর নাই।

চাঁপা ও পুঁটির দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতে লাগিল—পুঁটি তাকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া বিধ্বস্ত করিয়া দিল। চাঁপার আজ সম্পূর্ণ পরাজয়, এতদিনে সে তার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর দেখা পাইয়াছে। বিজয়ী পুঁটি গৃহত্যাগ করিলে, কিছুক্ষণ পরে বাণীবিজয় চাঁপাব খোঁজে ঘবে প্রবেশ করিল—দেখিল চাঁপা নাই। এদিকে ওদিকে সন্ধান করিল—কোথাও তার দেখা মিলিল না।

পুঁটি বাহির হইয়া যাইবার পরেই চাঁপাও বাহির হইয়া সোজা রক্তদহের পথ ধরিয়াছিল—চিঠিখানা নষ্ট হওয়াতে তার ফিরিয়া যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

২২

নাটোরের কালেক্টার মিঃ বার্ড মস্ত বীর। ইংরেজ মহলে তার উপনাম বোনাপার্ট-বিজয়ী। মিঃ বার্ডের জীবনে এক প্রকাণ্ড ইতিহাস আছে। ঊনবিংশ শতকের প্রথমে সে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক বড সাহেবের খানসামারূপে ভারতবর্ষে আসে এবং দশ বারো বছর কাটাইয়া প্রভুর সঙ্গে

ইংলণ্ডে ফিরিয়া যায়। সে ১৮১৫ খৃঃ অব্দের কথা, তখন নেপোলিয়ান বেলজিয়াম আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন; ডিউক অব্ ওয়েলিংটন ব্রুসেল্‌সে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছেন: দলে দলে ইংরেজ পুরুষ ও মহিলা তামাসা দেখিবার জন্য ব্রুসেল্‌সে যাইতেছে। মিঃ বার্ডও একজনের অনুচর রূপে সেখানে গিয়াছিল।

১৬ই জুন ব্রুসলেস্-এর কিছু দক্ষিণে দুইটি যুদ্ধ হয়; লিনির যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং সম্রাট ব্লুকারকে পরাজিত করিয়া খেদাইয়া দেন; তার কিছু পশ্চিমে কোয়ার্টার ব্রাস-এর যুদ্ধক্ষেত্রে ওয়েলিংটন ও মার্শাল নে'র মধ্যে লড়াই হয়। ব্লুকারের পরাজয়ে অন্যগতি ডিউক কোয়ার্টার ব্রাস ত্যাগ করিয়া ব্রুসেলসে এর দিকে পশ্চাদপসরণ করেন—(ইংরাজ পালাইতে জানে না—আর পালাইলেও ইতিহাসের পাতায় তাহা সংশোধন করিয়া লইতে জানে)। এই ব্যাপারে ব্রুসেলসের বীরহৃদয় ইংরেজ মহলে বড় ত্রাসের সঞ্চার হয়, যে যেমন ভাবে ছিল, তেমন ভাবে পালাইতে আবম্ভ করে; ইংলণ্ড-গামী জাহাজে স্থান পাওয়া ভার হইয়া ওঠে। মিঃ বার্ড এই পলায়নপর দলের অগ্রগণ্য ছিল।

ইংলণ্ডে ফিরিয়া কিছুকাল জিরাইয়া মিঃ বার্ড ভারতবর্ষে যাত্রা করিল—এবার সে একাকী, কারও অনুচর নয়। জাহাজ সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে পৌঁছিলে যাত্রীরা একটু বেড়াইয়া লইবার জন্য নামিল—কিন্তু মিঃ বার্ড অবতরণ করিল না; ব্রুসেলস্ এর অভিজ্ঞতা সে ভুলিতে পারে নাই; যদিচ নেপোলিয়ান তখন ইংলণ্ডের রাজকীয় আতিথ্যে এক ভূতপূর্ব্ব ঘোড়াশালে বন্দী—কিন্তু কি জানি কিছু বলা যায় না। মিঃ বার্ড জাহাজের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া বাইনোকিউলার সহযোগে বন্দী সম্রাটের কারাগারের ছাদ দেখিয়া লইল, তারপর একদিন সুপ্রভাতে কলিকাতা পৌঁছিল।

কলিকাতার সাহেব-মহলে সে অচিরকালের মধ্যে ওয়াটার্লু যুদ্ধের একজন আহত সৈনিক বলিয়া খ্যাত হইয়া উঠিল; পড়িয়া গিয়া কপালে চোট

লাগিয়াছিল—ফরাসী সঙ্গীনের গুঁতা বলিয়া তাহা রটনা করিয়া দিল; স্বদেশ-প্রেমিক সাহেব ও মেমগণ দলে দলে মিঃ বার্ডের পেট্রিয়টিক গুঁতা দেখিতে আসিয়া নিজেদের ধন্য করিতে লাগিল; শেষে একদিন সেই আঘাত লাঠসাহেবের নজর পড়িয়া মিঃ বার্ডের অদৃষ্টের গুণে রাজটীকায় পরিণত হইল; এত বড় একটা জাদরেল বীর খানসামাগিরি করিবে ইংরাজেরা তাহা সহ্য করিতে পারিল না; মিঃ বার্ড নাটোরের কালেক্টার নিযুক্ত হইল। সে কলিকাতা ত্যাগ করিলে কলিকাতার সান্ধ্য-মজলিস প্রত্যক্ষদর্শী বোনাপার্ট-বিজয়ীর নবনবায়মান গল্পের অভাবে নিরানন্দ হইয়া পড়িল, কিন্তু বোনাপার্ট-বিজয়ী মিঃ বার্ড নাটোরের কালেক্টার হইয়া দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

এ হেন মিঃ বার্ডের কাছে জোড়াদীঘির অত্যাচারের কাহিনী লইয়া রক্তদহের লোক আসিল এবং মিঃ বার্ড ঘোড়ায় চড়িয়া জোড়াদীঘির দস্যুকে শাসন করিবার জন্য রওনা হইবার উদ্যোগ করিল। খবর পাইয়া সাহেবের পেস্কার আসিয়া বলিল—হুজুর দু'চার জন সিপাহী নিয়ে যাওয়া ভাল; চৌধুরীরা বড় ভাল লোক নয়।

সাহেব হাসিয়া বলিল, টুমি বিউনোপার্টের নাম শুনিয়েছ? পেস্কার নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নয়—সে বলিল, আজ্ঞে নাম শুনি নাই; তবে দেখেছি, সেই যে—

সাহেব তাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, আমি টাকে জয় করিয়েসি। এই বলিয়া সে শিষ দিতে দিতে ঘোড়া ছুটাইয়া জোড়াদীঘি রওনা হইয়া গেল।

জোড়াদীঘিতে আসিয়া সাহেব দেখিল জমিদার-বাড়ীর বিশাল দেউড়ি বন্ধ; সে ঘোড়া হইতে নামিয়া চাবুক দিয়া ঘা দিয়া দরজা খুলিতে বলিল—কেহ তার কথা শুনিল না—দরজা বন্ধই রহিল। সাহেব রাগিয়া ইংরেজী ও বাংলায় তর্জ্জন করিল—দরজা তাতেও খুলিল না; বরঞ্চ ভিতর হইতে কে যেন হাসিয়া সাহেবকে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিল।

সাহেব রাগিয়া লাল হইয়া ইংরেজীতে শপথ করিয়া হিন্দুস্থানীতে শাসাইয়া ফিরিবার জন্ত ঘোড়ায় চড়িল।

এতক্ষণ গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল চুপ করিয়া ছিল, এবার তারা বোনাপার্ট-বিজয়ীর পরাজয় দেখিয়া হাততালি দিয়া সুর করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—

'হাতি পর হাওদা ঘোড়া পর জিন
জলদি যাও, জলদি যাও ওয়ারেণ হেষ্টিন'

সাহেব কোন রকমে গ্রামের বাহিরে আসিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া নাটোরে পৌছিয়া মস্ত এক রিপোর্ট লিখিয়া ফেলিল।

সাহেব লিখিল জোড়াদীঘিতে মস্ত এক brigand chief আছে; তার fortress দখল করিতে অন্তত পাঁচশত সিপাহী ও কামানের দরকার। শীঘ্র ইহা দখল করিতে না পারিলে ইহারা রাজসাহী জেলা জয় করিয়া লইবে। রিপোর্ট কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়া সাহেব রংপুরে ও মুর্শিদাবাদে সিপাহী চাহিয়া জরুরি ঘোড়সোয়ার পাঠাইল। বোনাপার্টবিজয়ী বীর সহজে নেটিভ ব্রাইগ্যাণ্ডকে ছাড়িবে না!

২৩

পরন্তপ রায়কে জোড়াদীঘির বাড়ীতে আনিয়া প্রথমে দর্পনারায়ণ সসম্মানে রাখিয়াছিল—কিন্তু পরন্তপ গোলমাল আরম্ভ করিল, মারধর সুরু করিল, শেষে পালাইতে গিয়া তিন চার বার ধরা পড়িল। তখন বাধ্য হইয়া তাকে কয়েদখানায় স্থানান্তর করা হইল। সে কালের বড় বড় জমিদার সকলেরই প্রায় কয়েদ-খানা থাকিত। দুর্দ্ধর্ষ লোকদের এই সব ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা হইত; কাকেও নিহত করার আবশ্যক হইলেও এইখানে বধ করা হইত।

চৌধুরীদের কয়েদ-খানা মাটির তলে অবস্থিত, বাহির হইতে বুঝিবার

উপায় নাই। ভিতরের হতভাগ্য বন্দী চীৎকার করিয়া মরিলেও বাহির হইতে শোনা যায় না; ইহা এমন সুকৌশলে প্রস্তুত যে, যে জানে না, সে ইহার অস্তিত্ব টের পাইবে না।

কয়েদ-খানাটি বিশ হাত; দশ হাত ছোট একটি কুঠুরী, একদিকে দেওয়ালের খুব উচুতে লোহার শিক লাগানো ছোট একটি ঘুলঘুলি; কোন রকমে বন্দীর বাঁচিয়া থাকিবার মত একটু আলো-বাতাস আসিতে পারে মাত্র, একটি মাত্র দরজা—লোহার, বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিলে পৃথিবীর সঙ্গে কয়েদ-খানার সম্বন্ধ লোপ পায়। পরন্তপ রায়কে এই ঘরে বন্ধ করিয়া দর্পনারায়ণ নিজের শয়ন-কক্ষে চাবি রাখিয়া দিল। দিনের মধ্যে তার তত্ত্বাবধানে পাচক-ব্রাহ্মণ বার দুই খাদ্য ও জল দিয়া আসিত।

রক্তদহ হইতে কয়েক গাড়ী শবদেহ আসিয়া পৌঁছিল। বাস্তুর বাগানে নিভৃততম অংশে গভীর গর্ত্ত করিয়া তাহা পুঁতিয়া ফেলা হইল, হত্যাকাণ্ডের সমস্ত চিহ্ন এইভাবে নিশ্চিহ্ন হইল।

ইতি মধ্যে বার্ড সহেব আসিবা ফিরিয়া গেল, সকলে নিশ্চিন্ত হইল; কিন্তু দর্পনারায়ণ, আলিবর্দ্দি ও দেওয়ানজী বুঝিল ইহা বিপদের কেবল সূচনা; তারা আসল বিপদের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

২৪

ইন্দ্রাণী আবার বনমালাকে চিঠি-লিখিতে বসিয়াছে। চাঁপা ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিল, চিঠিখানা হারাইয়া না গেলে সে কোন না কোন রকমে তাহা বনমালার হাতে পৌঁছিয়া দিত; ইন্দ্রাণী পুনরায় তাকে পাঠাইবে স্থির করিয়া চিঠি লিখিতেছে। বনমালার নাম ইন্দ্রাণী জানিত না; দরকারও নাই, কারণ চাঁপা গিয়া চিঠি তার হাতে দিয়া আসিবে।

ইন্দ্রাণী লিখিল—

"বোন্,

আমাকে তুমি চেন না, আমিও তোমাকে জানি না। কিন্তু রক্তদহ বলে একটা গ্রাম আছে, এতদিনে বোধ হয় তা শুনেছ; আমি রক্তদহের জমিদার-কন্যা, আবার রক্তদহেরই জমিদার-পত্নী।

তুমি জোড়াদীঘির জমিদার-পত্নী; জোড়াদীঘি আর রক্তদহের ইতিহাস নিশ্চই তুমি শুনেছ; সে ইতিহাসের মাঝখানে যে-আবর্ত্ত আজ পঙ্কিল হয়ে উঠে রক্তদহকে গ্রাস করতে চলেছে, তার সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধাকে এখন একমাত্র তুমিই বাধা দিতে পার।

আমি বয়সে তোমার চেয়ে যে খুব বেশি বড় হ'ব তা নই, কিন্তু কালের হিসাব সংসারের হিসাব নয়; বিধাতা কাউকে পাঠাইয়া দেন শুক্তির মধ্যে পুরে, তাঁর ইচ্ছা মুক্তা চিরকাল থাকুক কোমল; মানুষ তাকে টেনে বের করতেই সে কঠিন হয়ে ওঠে; আবার কাউকে পাঠিয়ে দেন কঠিন ফলের আকারে, কালক্রমে তার কঠোরতা কোমলতায় হয় পর্য্যবসিত। কাজেই; বয়সের বিচারে মাপলে তোমাকে আমার উপদেশ দেবার অধিকার নেই; কিন্তু তবুও আছে, কেন না মহাকাল আমাকে করুণা করেন নি; বহু দুঃখের অভিজ্ঞতার চাপে আমার মনের কোমল ভূস্তর প্রস্তর হয়ে উঠেছে।

তাই আজ তোমার কাছে স্বীকার করছি, এক সময়ে অভিজ্ঞতার প্রগল্‌ভতায় ভেবেছিলাম সুখ হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই দণ্ডিত মন বুঝতে পারিল, সুখ নয়, জীবনের লক্ষ্য শান্তি।

এই কথা স্বীকার করবার কারণ হচ্ছে এই যে সুখকে লক্ষ্য মনে করে যে পথে একদা চলেছিলাম, তখন জানতাম না, কিন্তু এখন বুঝেছি, সেই পথ গিয়েছিল এই ইতিহাসের আবর্ত্তের ঘাটে, শৈল-সোপান যার পতনে পিচ্ছিল, প্রচ্ছন্ন শেওলায় বিশ্বাসঘাতী স্রোত যার সর্ব্বনাশের সাগরমুখী এবং যার আবর্ত্ত শত্রু-মিত্রের তুচ্ছ মানবীয় ভেদ মানে না।

নিজে চলে যেখানে এসেছি, তার দায়িত্ব স্বীকার করি কেমন করে? ইচ্ছাও নেই, আর থাকলেই বা কি? বিধাতার দণ্ড যেমন বৃহৎ তেমনই সূক্ষ্ম-বিচারী, তার কাছে মানুষের সূক্ষ্ম বিচার অত্যন্ত স্থূল।

এইটুকু ভূমিকা। আমার স্বামী চৌধুরীদের বাড়ীতে বন্দী; দোষ তাঁর আছে; অন্তত যে কৃপাপ্রার্থী তার পক্ষে দোষ-গুণ বিচার সমীচীন নয়। বিধাতার দণ্ড থেকে কেউ বাঁচাতে পারে না, কিন্তু মানুষের দণ্ড থেকে পারে; বিধাতার দণ্ড তাঁকে লাগবেই, আর তার থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখব এমন শক্তিশালী আমি নই, তেমন ইচ্ছাও নেই; সে দণ্ড না পেলে তিনি হবেন কৃপার পাত্র। কিন্তু মানুষের দণ্ড থেকে বাঁচাতে কেন না চেষ্টা করব। তুমিও আমার অবস্থায় করতে। জানি না, তাঁর প্রতি কি বিধান হয়েছে, যদি তাঁকে বাঁচাতে পার—চেষ্টা করো। মানুষের শাস্তি থেকে তাঁকে বাঁচাতে পারলেও নিশ্চয় জেন বিধাতা তাকে ভুলবেন না; তিনি কাউকেই ভুলবেন না; আর যারা দণ্ডের যোগ্য, তাদের দণ্ড ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। জীবনে তুমি সুখ পাও, এমন প্রার্থনা করব না, কারণ আমি তোমার শত্রু সে জন্য নয়, আসল কারণ আগেই লিখেছি, যা হবার নয়, তা দিয়ে তোমাকে, যার কাছে আমি কৃপাপ্রার্থী, তাকে বঞ্চনা করবার মত আমি বিশ্বাসঘাতক নই। জীবনে শান্তি পাও। ইতি—

ইন্দ্রাণী।"

আমরা যত সহজে লিখলাম, ইন্দ্রাণী তত সহজে লিখতে পারিল না; অনেক ছিঁড়িল, অনেক ভাবিল, বহুক্ষণের পরিশ্রমে সে চিঠি তৈয়ারী করিয়া চাঁপার খোঁজ করিতে যাইবে, এমন সময়ে বেগুা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া উপস্থিত।

ইন্দ্রাণী কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই সে সুর করিয়া ধরিল—

এবার কংশ ধ্বংস হবেন
গোকুলের গোয়ালের কোণে

তারপরে খাঁটি গন্তে বলিল,—মা ঠাকরুণ—এবার মজা বুঝবে—পাখীটিরও যাতায়াতের পথ বন্ধ। বলিয়া আবার পূর্ব্বোক্ত গান ধরিল।

ইন্দ্রাণী বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপার কি?

—আর ব্যাপার। আমি আর বলি কেমন করে?

থাকত মোতির মা, বলত!

—মোতির মা যখন নেই তখন তুই-ই বল।

তারপরে বেঙার কাছ থেকে ইন্দ্রাণী যাহা সংগ্রহ করিল, তার মধ্যে হইতে সুর, পাঁচালী ও অনুপস্থিত মোতির মার অভিজ্ঞতা বাদ দিলে দাঁড়াইল এই যে,—নাটোরের কালেক্টার সাহেব পাঁচশত (বেঙার বর্ণনা কিছু কম হওয়া আশ্চর্য্য নয়) সিপাহী আনিয়া চৌধুরী-বাড়ী ঘেরাও করিয়াছে—বাড়ীর ভিতরে বাহিরে যাতায়াতের পথ একেবারে বন্ধ!

সংবাদ শুনিয়া ইন্দ্রাণীর আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। সে ভাবিল, এই চিঠি লইয়া যাইবার যেটুকু আশা ছিল, তাহাও গেল। মনে হইল, অকস্মাৎ অতর্কিত ভাবে বিপন্ন হইয়া দর্পনারায়ণ পরন্তপের উপরে মারাত্মক কিছু করিয়া বসিতে পারে। সে বুঝিল—পুলিশ আসিয়া পড়াতে তার সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে।

তার মনে হইল, এই চিঠি বনমালার হাতে পৌঁছান আগের চেয়েও বেশী দরকার, কিন্তু কে লইয়া যাইবে? চাঁপা মেয়েমানুষ হইলেও তাকে প্রবেশ করিতে দিবে না—আর তার যাইতেও সময় লাগিবে।

হঠাৎ তার মনে পড়িল। বেঙা বনমালার লোটন পায়রাটি চুরি করিয়া আনিয়াছিল; সে বলিয়াছিল এ পায়রা ছাড়া পাইলেই আবার বনমালার কাছে উড়িয়া যাইবে; ইন্দ্রাণী তাকে সযত্নে খাঁচায় পুরিয়া রাখিয়াছিল। তার মনে হইল—এই পায়রা ছাড়া চিঠি পাঠাইবার আর উপায় নাই।

ইন্দ্রাণী পায়রাটি খাঁচা হইতে বাহির করিয়া আনিয়া তাকে একটু আহার্য্য দিল, তার গায়ে যত্নে হাত বুলাইল, তারপর চিঠিখানা ভাঁজ করিয়া লাল

রেশমী সুতা দিয়া সন্তর্পণে তার পায়ের সঙ্গে ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিল। তখন সে পায়রাটিকে লইয়া পশ্চিমের ছাদে গিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে ভগবানের নাম স্মরণ করিল; তার পরে দুই বাহু উর্দ্ধে আন্দোলিত করিয়া পায়রাটি আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিল—পায়রাটা শোঁ করিয়া অনেক উচ্চে উঠিয়া গিয়া ঠিক ইন্দ্রাণীর মাথার উপরে কয়েকবার পাখা ঝটপট করিয়া উড়িল তারপরে তীব্রবেগে জোড়াদীঘির দিকে সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারের মধ্যে বিন্দুলীন হইয়া মিলাইয়া গেল। পায়রাটি সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টির অতীত হইলে ইন্দ্রাণী ছাদ হইতে ঘরে ফিরিয়া আসিল।

২৫

সেদিন সন্ধ্যায় বনমালা তেতালার শয়ন-কক্ষে একাকী বসিয়াছিল; কিছুদিন হইতে তার মনের অবস্থা ভাল ছিল না; একটার পরে একটা অশান্তির ঢেউ চৌধুরী-পরিবারকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল—সে একাকী বসিয়া তার তরঙ্গ গনণা ছাড়া আর কি করিতে পারে।

তার স্বামী ও দেবরেরা রক্তদহের বাড়ী লুঠ করিতে গিয়াছিল; সেখান হইতে তারা বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে; রক্তদহের জমিদারকে ধরিয়া আনিয়া কয়েদখানায় বন্দী করিয়া রাখিয়াছে; তারপরে সে শুনিয়াছিল, কালেক্টর সাহেব আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে; অবশেষে গত কল্য হইতে সাহেব সিপাহী লইয়া আসিয়া বাড়ী ঘেরাও করিয়াছে। দেউড়ি এখনও খুলিয়া দেওয়া হয় নাই; তবে সে শুনিয়াছে সিপাহীরা গুলি চালাইলে দেউড়ি খুলিয়া দেওয়া হইবে; রাজশক্তিকে প্রতিরোধ করা চৌধুরীদের কর্ত্তব্য নয় এবং সম্ভবও নয়।

পশ্চিমের বিলীয়মান আলোকের পটে, ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে বনমালা যেন তার জীবনের ও চৌধুরীদের ইতিহাসের আভাস দেখিতে পাইতেছিল—এমন সময়ে তার কোলের উপরে কি যেন আসিয়া পড়িল

—সে একেবারে চমকিয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই তার বিস্ময় আনন্দে পর্য্যবসিত হইল; তার পায়রাটি কোথা হইতে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিল? পাখীটি বনমালার কোলে বসিয়া তার বুকের উপরে মুখ ঘসিয়া ক্রমাগত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। বনমালা হাতে করিয়া পাখায় হাত বুলাইয়া, গালের উপর চাপিয়া ধরিয়া আদর করিতে লাগিল; হঠাৎ তার হাতে কি যেন বাধিল; তাকাইয়া দেখে; একখানা কাগজ ভাঁজ করিয়া তার পায়ে বাঁধা; কাগজখানা খুলিয়া দেখিল, একখানা চিঠি; তার বিস্ময় বাড়িল বই কমিল না, সে ঘরের মধ্যে উঠিয়া আলো জ্বালাইয়া এক নিঃশ্বাসে চিঠিখানা পড়িয়া ফেলিল।

পায়রা দিয়া চিঠি পাঠাইবার বুদ্ধি স্থির হইলে ইন্দ্রাণী পুনশ্চ দিয়া লিখিয়াছিল :—

ভাই, একদিন আমাদের চাকর বৈরাগী সেজে তোমাকে দেখতে গিয়েছিল, ফিরে আসবার সময় সুযোগ পেয়ে তোমার পায়রাটি চুরি করে এনেছিল। সে জন্য তাকে বকেছিলাম; কিন্তু আজ মনে হচ্ছে এর মধ্যেও অদৃষ্টের ইঙ্গিত ছিল, নইলে এই চিঠি আজ তোমাকে পাঠাতাম কেমন করে?"

চিঠির 'পুনশ্চ' অংশ পড়িয়া বনমালার কাছে পায়রা চুরির ইতিহাস স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে অনেক বার রক্তদহের জমিদার-কন্যার রূপ ধ্যানে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে, শুনিয়াছে, সে অহঙ্কারী, দাম্ভিক, আজ এমন অনায়াসে তার পরাজয়-স্বীকারে বনমালার আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল— কিন্তু হইতে পারিল না; কিংবা আনন্দিত হইয়াছিল, বুঝিতে পারিল না; নতুবা এমন করিয়া তার অনুরোধ রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিত না।

বনমালা চিঠিখানা পাঁচ সাত বার পড়িয়া স্থির করিল, রক্তদহের জমিদারকে বাঁচাইতে হইবে; সেই অদৃশ্যা, অহঙ্কারিণী পত্র-লেখিকার মিনতিকাতর দুই চোখ বারংবার তার মনে পড়িতে লাগিল, বনমালা স্থির করিল, স্বামীকে না জানাইয়া সে বন্দী জমিদারকে ছাড়িয়া দিবে। ভাল

কাজ করিতে আবার অনুমতির কি আবশ্যক? ইহাতে তার স্বামীরও কল্যাণ হইবে।

কয়েদখানার চাবি শয়ন ঘরেই থাকিত; সে চাবিটি লইল, চিঠিখানা লইল এবং বাম হাতে একটি প্রদীপ লইয়া কয়েদখানার দিকে প্রস্থান করিল।

কয়েদখানার দিকে লোকজন ছিল না—বনমালা সকলের অলক্ষিতে কয়েদখানার দরজায় গিয়া দাঁড়াইল এবং নিশব্দে রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া ফেলিল।

কিন্তু পরন্তপ তাকে দেখিতে পাইল না, সে তখন পিছন ফিরিয়া মাটিতে অর্দ্ধ-প্রোথিত একটা নর-কঙ্কালের উপর লাথি মারিতেছিল, পায়ের আঘাতে একটা হাড় ছিট্‌কাইয়া পড়িল—পরন্তপ তা দেখিয়া হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর সে নিজের মনে বকিতে লাগিল—

একটা, আর একটা। এই তো আমার উপযুক্ত শয্যা। নরকঙ্কালের শর-শয্যা। যত মানুষ গিয়াছে আজ তারা কঙ্কাল বিছিয়ে আমার জন্য শয্যা রচনা করে রেখেছে!

একখানা অস্থি হাত দিয়া তুলিয়া দেয়ালের উপর ঠুকিতে ঠুকিতে পুনরায় বলিতে লাগিল—আর দেরি নেই, সময় হ'য়ে এল; পাতো বিছানা—আমি আসছি!

পরন্তপকে দেখিয়া চিনিবার উপায় নাই, এই কয়দিনে এমনই তার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; মাথার চুল্ রুক্ষ হইয়া অবিন্যস্ত হইয়াছে; মুখে দাড়ি কণ্টকিত, চক্ষু রক্তবর্ণ; গায়ের সজ্জাতেও যেন ভাগ্যহীনতার আভাস। কণ্ঠস্বর ভগ্ন ও গম্ভীর, যেন কোন কবরের মধ্য হইতে উঠিতেছে। কয়েদখানায় নিক্ষিপ্ত হইবার পর হইতে তার ধারণা হইয়াছে, মৃত্যু তার নিশ্চিত; আর মৃত্যুর চিহ্ন এখানে এমন অবিরল যে, মৃত্যু ছাড়া আর কিছু ভাবিবারই উপায় নাই। এই আর্দ্র, সিক্ত, ভূগর্ভনিহিত, অন্ধকার, নির্জ্জন কক্ষ মৃত্যুর প্রতীক। না ইহাই মৃত্যু। উপরের ওই লোকালয়, আলো, বায়ু, হাসি, গান, প্রাণের চাঞ্চল্য, জীবন; আর, এই লোকচক্ষুর অতীত কারাগার মৃত্যু। মৃত্যুর পরে

মানুষ এই রকম এক বিভীষিকা-লোকে জাগিয়া ওঠে। তার এক একবার ভুল হইয়াছে, সে সত্যই মরিয়া আছে, না জীবিত।

হঠাৎ পরন্তপের কি রোখ চাপিল, সে দেঁয়ালে আঘাত করিতে লাগিল; ইটের গাথুনি হইতে অনেক কষ্টে দু'এক খানা ইট খসাইয়া সবেগে মাটিতে নিক্ষেপ করিল; একখানা স্থুল অস্থি উঠাইয়া লইয়া প্রাণপণে দেয়ালের উপর আঘাত করিতে লাগিল; জীর্ণ অস্থি বহু খণ্ড হইয়া ছড়াইয়া পড়িল; সে পুনরায় হাঃ হাঃ করিয়া উন্মাদের হাসি হাসিল, এই পরিশ্রমে সে ধুঁকিয়া পড়িয়াছিল, হাত দিয়া কপালের ঘাম মুছিতে লাগিল।

বনমালা নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল—বন্দীকে ডাকিতে তার সাহস হইল না। বন্দী যে অপরাধী সে বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল না, কিন্তু এখন তার অবস্থা চোখে দেখিয়া মন গলিয়া গেল। এই লড়াইয়ে বহু লোক মরিয়াছিল, সে জানিত; সে জানিত আরও অনেক লোক আহত হইয়াছিল, কিন্তু তাতে এত দুঃখ হয় নাই; কিন্তু এখন একটা লোকের দুঃখ দেখিয়া বহু অদৃষ্ট লোকের পুঞ্জীভূত দুঃখ সে ভুলিয়া গেল—এমন কি, এই লড়াইয়ের ন্যায়পরতায় পর্য্যন্ত তার অবিশ্বাস জন্মিল। মানুষ এমনই অদ্ভূত জীব! ইন্দ্রিয়ের অগোচর অভিজ্ঞতা তার কাছে মিথ্যারই সামিল। বনমালা যেমনটি ছিল নীরবে দাড়াইয়া রহিল, অজ্ঞাতসারে তার চক্ষুপ্রান্তে অশ্রু জমিয়া উঠিতে লাগিল।

পরন্তপ আগের মতই নিশ্চল দেয়ালকে লক্ষ্য করিয়া যেন বলিতে লাগিল —জীবনের প্রান্তে মৃত্যু সুনিশ্চয়! কিন্তু সে মৃত্যু যদি আসে ক্লান্তদেহে, শয্যাপার্শ্বে, ম্লান দীপালোকে, সেবা-রত, স্নেহ-কোমল হস্ত দু'খানির তত্ত্বাবধানের অবকাশ এড়িয়ে, তবে আর সে মৃত্যু মৃত্যু নয়, বিভীষিকা নয়, ক্ষোভের নয়। আর এই মৃত্যু—অন্ধকার কক্ষে, নির্জ্জনে, নিঃসঙ্গে উঃ কী ভীষণ!

এই কথা স্মরণ করিয়া সে যেন আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। আবার বলিয়া চলিল—মৃত্যু, তিলে তিলে, পলে পলে, অনাহারে, কদমে। না, না,

তার চেয়ে ঘাতকের খড়্গ অনেক ভাল! এক আঘাতে অনেক দুঃখের পর্য্যবসান!

সে থামিল; মনে হইল দ্বার খুলিয়া কেহ দাঁড়াইয়াছে, সে যেন জানিতে পারিয়াছে; সে ঘুরিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, কে এসেছ, আমার ঘাতক!—কাছে আসিয়া দীপহস্তা বনমালাকে দেখিয়া প্রেত-দৃষ্টের মত চমকিয়া উঠিল! বনমালাও এবার তাকে দেখিল; সে বিস্ময়ে কাঠ হইয়া না গেলে চমকিয়া উঠিয়া তার হাতের দীপ পড়িয়া যাইত; কিন্তু কাষ্ঠ-পুত্তলিকার হাত হইতে দীপ পড়িল না। দীপের আলো পরন্তপের মুখে পড়িল, আর উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে নিষ্পলক চাহিয়া রহিল!

পরন্তপ দেখিল—পলাশীর মাঠের সেই রমণী, বনমালা দেখিল—পলাশীর মাঠের সেই উদ্ধত যুবক; পরন্তপ লক্ষ্য করিল—তার বধূ-বেশ, বনমালা দেখিল—সেই যুবক দুর্দ্দশাপন্ন; পরন্তপ বুঝিল—আজ আর তার নিস্তার নাই, বনমালা ভাবিল ইহাকে কখনই সে উদ্ধার করিবে না।

পরন্তপ প্রথমে কথা বলিল; জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কে?

বনমালা বলিল—আমি চৌধুরী-বাড়ীর পুত্রবধূ!

পরন্তপ আবার জিজ্ঞাসা করিল—আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি।

বনমালা সংক্ষেপে বলিল—সে কথা ভুলে যান!

পরন্তপ বলিল—ভুলব! ভুলতে ত চাই! কিন্তু আমি ভুললেও যে ভগবান ভোলেন না! ভগবান্ আছেন!—সে যেন নিজের মনেই কথাগুলি বলিল!

—না, না, ভগবান আছেন সুনিশ্চিত। তা নইলে আজ এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে দণ্ডের আয়োজন তিনি করবেন কেন? ভগবান আছেন, নইলে অসহায়ের হাতে বজ্র দেন কে? পাপের প্রায়শ্চিত্ত এমন অমোঘ হয়ে দাঁড়ায় কার আজ্ঞায়? মৃত্যু এবার সুনিশ্চিত। এই বলিয়া সে ক্ষোভে, দুঃখে, বিস্মিত ত্রাসে দুই হাত দিয়া মাথার চুল ছিঁড়িতে লাগিল।

পরন্তপ যখন এই সব কথা বলিতেছিল, বনমালা ভাবিতেছিল, এই দুর্ব্বৃত্তকে উদ্ধার করিয়া কাজ নাই ; দণ্ড যার প্রাপ্য, ভগবান যদি তাকে দণ্ডের জন্য আনিয়া থাকেন, তবে মুক্তি দিবার তার কি অধিকার আছে? সে একবার ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল, কিন্তু অমনি ইন্দ্রাণীর অদৃশ্য চক্ষু-যুগল তার মনে পড়িল, সে আবার দাঁড়াইল।

পরন্তপ বলিতে লাগিল—আজ তোমার দণ্ড দেবার দিন, সুযোগ করায়ত্ত ; ছেড়ো না আমাকে, আমি প্রস্তুত। কি দণ্ড আজ্ঞা কর।

বনমালা কথা বলিতে পারিল না।

—শুধু—এই অনুরোধ, জানি অনুরোধের অধিকার আমার নেই—তবু বলছি! তিলে, তিলে, পলে, পলে কারাগারের বিষাক্ত বায়ুতে আমাকে মরতে দিও না—যেমন ওই সব হতভাগ্য নর কঙ্কাল। তোমার ঘাতক আছে, সৈন্য আছে, খড়্গ আছে, বন্দুক আছে তারই এক আঘাতে এক, গুলিতে। শাস্তির মধ্যেও তারতম্য আছে ; দণ্ডাদেশেও দয়ার স্থান আছে। মুহূর্ত্তের দণ্ডবিধানে তুমি কৃপা কর।

এই বলিয়া সে দ্রুত ছুটিয়া আসিয়া বনমালার পায়ের কাছে পড়িল।

বনমালা বলিল—আপনি বাহিরে চলুন। বিস্মিত পরন্তপ বলিল—বাহিরে? একটু থামিয়া বলিল—তবে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর! কারাগার নয়—ঘাতক!

বনমালা আবার বলিল—বাইরে চলুন—তাড়া আছে।

পরন্তপ যন্ত্র-চালিতের মত তাকে অনুসরণ করিয়া বাইরে আসিল ; বনমালা আবার বলিল—আমার সঙ্গে আসুন। পরন্তপ তাকে অনুসরণ করিয়া চলিল ; বনমালা তাকে সঙ্গে করিয়া ক্ষীণ দীপালোকিত পথ দিয়া অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া বাস্তুর বাগান অতিক্রম করিয়া চৌধুরী-বাড়ীর প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল।

পরন্তপ জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় তোমার ঘাতক?

বনমালা বলিল—আপনি মুক্ত।

সে মূঢ়ের মত আবৃত্তি করিল—আপনি মুক্ত।

বনমালা বলিল—আপনি মুক্ত। এই পথ দিয়ে সোজা বের হয়ে চলে যান, অন্য পথ ধরবেন না ; তাতে ক্ষতি হবে। কিছু দূর গেলেই বিলের ধারে গিয়ে পড়বেন—সেখানে রক্তদহ যাবার পথ পাবেন, রাত্রি থাকতেই রক্তদহে গিয়ে পৌঁছোবেন—নইলে আবার ধরা পড়বার আশঙ্কা আছে।

সে যেন কিছুই বুঝিতে পারিল না।

বনমালা বলিল—তাড়াতাড়ি চলে যান ; বিলম্বে বিপদ হতে পারে।

পরন্তপ শুধু বলিল—মুক্তি কেন ?

বনমালা তাকে ইন্দ্রাণীর চিঠিখানা দিয়া বলিল,—এই কাগজখানা পড়ে দেখবেন, সব বুঝতে পারবেন। আমি চললাম আপনার আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

এই বলিয়া সে অন্তঃপুরের পথ ধরিল। পরন্তপ এক মুহূর্ত্ত কাগজখানা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া যখন বুঝিল, তার মুক্তি যথার্থ—বিদ্রূপ নয়, তখন সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া দ্রুত চৌধুরী-বাড়ী ত্যাগ করিয়া মাঠের মধ্যে নামিয়া পড়িল।

২৬

চৌধুরী-বাড়ীর বৈঠকখানায় মন্ত্রণা-সভা বসিয়াছে ; বার্ড সাহেব বহু সিপাহী লইয়া বাড়ী ঘেরাও করিয়াছে ; গুজব রটিয়াছে যে কামান আসিতেছে ; আসিয়া পৌঁছিলেই বাড়ী আক্রান্ত হইবে।

অনেক পরামর্শের পর স্থির হইল, দেউড়ি খুলিয়া দেওয়াই উচিত, কিন্তু তার আগে সাহেবের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি লইতে হইবে যে, বাড়ীতে অযথা কোন অত্যাচার হইবে না।

তখন রাত্রি একপ্রহর অতীত হইয়াছে, আলিবর্দ্দি সর্দ্দার একটি মশাল হাতে করিয়া দেউড়ির দালানের উপর উঠিয়া কোম্পানীর ফৌজকে সম্বোধন করিয়া বলিল, সাহেব কোম্পানীর সঙ্গে বিবাদ করা আমাদের ইচ্ছা নয়, সে শক্তিও নাই, আমরা দেউড়ি খুলে দিতে রাজী আছি, কিন্তু তার আগে সাহেবের কাছ থেকে জবান চাই বাড়ীর মধ্যে কোন অত্যাচার হবে না। যদি হয়, বাড়ীতে আমাদের এখনো আড়াইশ লাঠিয়াল আছে, এ কথা মনে রাখতে বলি।'

বার্ড সাহেব জাত-ইংরেজ, কোথায় কতখানি বল প্রকাশ করিতে হয় জানে; সে প্রতিশ্রুতি দিল অযথা অত্যাচার করা হইবে না।

বিশাল দেউড়ি খুলিয়া গেল!

বার্ডসাহেব সশস্ত্র পঁচিশ জন সিপাহী লইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চৌধুরীদের কয়েদখানা কোথায়? সেকালের বড় বড় জমিদারদের প্রায় সকলেরই কয়েদখানা থাকিত, কাজেই সাহেবের প্রশ্ন অসঙ্গত হয় নাই, বিশেষ, তারপাশেই রক্তদহের একজন লোক ছিল, সে লোকটাই কয়েদখানার সংবাদ দিয়াছিল।

এতক্ষণে দর্পনারায়ণ ও আলিবর্দ্দির চমক ভাঙ্গিল; তারা বুঝিল সাহেব আসিবার পূর্ব্বে পরন্তপকে মুক্তি দেওয়া উচিত ছিল; গোলমালে কথাটা কারও মনে পড়ে নাই; কিন্তু তখন আর হায় হায় করা বৃথা, সকলে সাহেবকে কয়েদখানার দিকে লইয়া চলিল।

কয়েদখানার ঘরে উপস্থিত হইয়া সাহেব ও দর্পনারায়ণ উভয়েই বিস্মিত হইল; বোধ করি দর্পনারায়ণেরই বিস্ময় অধিক হইল; সাহেব নিশ্চিত সংবাদ পাইয়াছিল, রক্তদহের জমিদার কয়েদখানায় বন্দী; কিন্তু নিজের চক্ষে সে দেখিল, কয়েদখানা শূন্য; দর্পনারায়ণ ভাবিল, পরন্তপ গেল কোথায়? মুক্তি পাইল কেমন করিয়া; সাহেব নিজের মনে চিন্তা করিয়া

বলিল, হুম্! তারপর হাতের ছড়ি দিয়া রক্তদহের লোকটার পিঠে কয়েক ঘা বসাইয়া দিয়া বলিল, নিকালো শালা ইউ লায়ার।

কিন্তু ইহাতে চৌধুরীদের ভাগ্য প্রসন্ন হইল না, চৌধুরীদের কর্ত্তৃক সাহেবের বৃটিশ প্রেষ্টিজ অপমানিত হইয়াছে; বোনাপার্ট-বিজয়ী লাঞ্ছিত হইয়াছে; সাহেব সেই নষ্ট প্রেষ্টিজ উদ্ধার করিবার আশায় ফিরিয়া গিয়া চৌধুরীদের বৈঠকখানায় বসিল, সাহেবের আদেশকে অমোঘ করিয়া তুলিবার জন্য পঁচিশ জন সশস্ত্র সিপাহী সঙ্গীন খাড়া করিয়া চারিদিকে দাঁড়াইয়া রহিল।

২৭

পরন্তপ বিলের ধারে গিয়া রক্তদহের পথ ধরিল, শীতের রাত্রে পথ নির্জ্জন, সে দ্রুত পথ চলিতে লাগিল; কিন্তু প্রাণপণে চলিয়াও ভোর হইবার পূর্ব্বে রক্তদহে পৌছিতে পারিল না; পথ কম নয়, শরীর দুর্ব্বল। দিনের বেলা পথ চলার তার সাহস ছিল না, স্থান অরাজক, তাই সে কোথাও আত্মগোপন করিবার ইচ্ছা করিল।

গ্রামের নাম লক্ষ্মীপুর; রক্তদহ এখান হইতে বেশি দূর নয়, সে স্থির করিল, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এখানে লুকাইয়া থাকিয়া রাত্রি প্রথম প্রহরের মধ্যেই বাড়ী পৌছিবে।

পথের ধারে একটা জঙ্গল ছিল; সেখানে প্রবেশ করিয়া দেখিল, পুরাণো একটা দীঘির পাড়ে একটা জীর্ণ-মন্দির; সে প্রাণ ভরিয়া দীঘির জল পান করিল; জঙ্গল হইতে কিছু ফলমূল সংগ্রহ করিয়া খাইল; তারপরে মন্দিরের মধ্যেই শুইয়া পড়িল; অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমাইয়া পড়িল।

যখন তার ঘুম ভাঙ্গিল, দেখিল সন্ধ্যা আসন্ন; বিলম্ব না করিয়া আবার পথ চলিতে লাগিল।

রাত্রি দেড় প্রহরের সময় সে রক্তদহের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, কাহারো সাথে সে দেখা করিবার আগে সে বরাবর ইন্দ্রাণীর কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল।

ইন্দ্রাণী তখন অন্ধকারে একাকী বসিয়াছিল,—স্বামীকে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল, কিন্তু পরন্তপের চোখে তাহা ধরা পড়িল না।

পরন্তপ তার কাছে গিয়া বলিল—ইন্দ্রাণী আমি এসেছি।

ইন্দ্রাণী অত্যন্ত সাধারণ ভাবে বলিল—শরীর ভাল তো? তার কণ্ঠস্বরে হৃদয়াবেগের লেশমাত্র ছিল না।

পরন্তপ চমকিয়া উঠিল! এ কি! এত বিপদের পরে সাক্ষাতের এই কি কণ্ঠস্বর। সে পুনরায় বলিল—ইন্দ্রাণী অনেক বিপদ কাটিয়ে এসেছি; ফিরবার কোন আশা ছিল না, ইন্দ্রাণী শুধু বলিল—জানি!

পরন্তপ মূঢ়ের মত অনুবৃত্তি করিল—জানি! তারপরে বলিল—আমি ফিরে আসাতে তুমি সুখী হওনি?

পাষাণী বলিল—অসুখী হইনি।

পরন্তপ বিস্মিত হইয়া বলিল—বটে? আমাকে মুক্তি দেবার জন্যে চিঠি দিয়েছিলে কেন?

ইন্দ্রাণী আবেগহীন-কণ্ঠে বলিল—চিঠি লিখেছিলাম কেন? তবে শোন—এই সর্ব্বনাশের খেলায় তোমাকে আমিই নামিয়েছিলাম, তোমার বিপদের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার, সেইজন্যে কর্ত্তব্য পালন মাত্র করেছি।

ব্যাকুল-কণ্ঠে প্রশ্ন হইল—ইন্দ্রাণী তুমি কি আমায় ভালবাস না?

অতি সংক্ষিপ্ত একটি উত্তর—না।

—কিন্তু আমি যে তোমাকে ভালবাসি ইন্দ্রাণী—

—অনাবশ্যক।

ভাবান্দোলিত-কণ্ঠে পরন্তপ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—তুমি পাষাণী, পাষাণী!

ইন্দ্রাণী দাঁড়াইয়া উঠিয়া সংযত-কণ্ঠে বলিল—এতদিনে তুমি আমাকে বুঝেছ। আমি পাষাণী—সত্যিই পাষাণী।

তারপরে শূন্য-গহ্বরের মধ্য হইতে উত্থিত ধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল—আমি পাষাণী আমার হৃদয় নাই, হৃদয়াবেগ নাই; ভালবাসা নাই, ভালবাসার আবশ্যক নাই; আমাকে কেউ ভালবাসতে পারে না, আমিও কাউকে ভালবাসি না; আমার সংসার নাই, সাংসারিকতা নাই। যে-বিধাতা মানুষ গড়েন, আমি তাঁর সৃষ্টি নই; যিনি গড়েছেন পাহাড়-পর্ব্বত, নদী-সমুদ্র, অরণ্য-কান্তার, আমি তাঁরই রচনা; মানুষের সংসারে আমি প্রক্ষিপ্ত; আমি লোকাতীত লোকোত্তর; আমার শত্রু নাই, মিত্র নাই, আত্ম নাই, পর নাই; আমার দ্বেষ নাই, প্রেম নাই; আমার হিংসা নাই, ঈর্ষ্যা নাই; আমি পুরুষ নই, নারী নই; আমি পাষাণী। আমি পাষাণী। পাষাণের মত নিঃসঙ্গ, নির্জ্জন, নির্জ্জীব, নিস্তব্ধ; বাসনার অতীত, সুখ-দুঃখের উর্দ্ধে; আমার প্রাণ নাই, কাজেই মৃত্যুও নাই; আমি ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ কিছু নই; আমার ন্যায় নাই, অন্যায় নাই; সত্য নাই, মিথ্যা নাই; আমি মানুষ নই, কাজেই মানুষের মাপকাঠি আমার কাজে পরাঙ্মুখ; আমি অলৌকিক, আমি পাষাণী।

স্থির সংযত কণ্ঠে এই কথাগুলি বলিতে বলিতে ইন্দ্রাণী অন্ধকারের মধ্যে প্রস্থান করিল।

মূঢ় পরন্তপ একাকী দাঁড়াইয়া রহিল।

২৮

বার্ড সাহেব চৌধুরীদের সহজে ছাড়িলেন না; যদিও পরন্তপ রায়কে বে-আইনীভাবে বন্দী করিয়া রাখিবার অভিযোগ প্রমাণিত হইল না, তবু তারা নিস্তার পাইল না। বে-আইনী দাঙ্গা এবং সাহেবকে দেউড়ির

রাত্রি দেড় প্রহরের সময় সে রক্তদহের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, কাহারো সাথে সে দেখা করিবার আগে সে বরাবর ইন্দ্রাণীর কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল।

ইন্দ্রাণী তখন অন্ধকারে একাকী বসিয়াছিল,—স্বামীকে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল, কিন্তু পরন্তপের চোখে তাহা ধরা পড়িল না।

পরন্তপ তার কাছে গিয়া বলিল—ইন্দ্রাণী আমি এসেছি।

ইন্দ্রাণী অত্যন্ত সাধারণ ভাবে বলিল—শরীর ভাল তো? তার কণ্ঠস্বরে হৃদয়াবেগের লেশমাত্র ছিল না।

পরন্তপ চমকিয়া উঠিল। এ কি! এত বিপদের পরে সাক্ষাতের এই কি কণ্ঠস্বর। সে পুনরায় বলিল—ইন্দ্রাণী অনেক বিপদ কাটিয়ে এসেছি; ফিরবার কোন আশা ছিল না, ইন্দ্রাণী শুধু বলিল—জানি!

পরন্তপ মূঢ়ের মত অনুবৃত্তি করিল—জানি! তারপরে বলিল—আমি ফিরে আসাতে তুমি সুখী হওনি?

পাষাণী বলিল—অসুখী হইনি!

পরন্তপ বিস্মিত হইয়া বলিল—বটে? আমাকে মুক্তি দেবার জন্যে চিঠি দিয়েছিলে কেন?

ইন্দ্রাণী আবেগহীন-কণ্ঠে বলিল—চিঠি লিখেছিলাম কেন? তবে শোন—এই সর্ব্বনাশের খেলায় তোমাকে আমিই নামিয়েছিলাম, তোমার বিপদের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার, সেইজন্যে কর্ত্তব্য পালন মাত্র করেছি।

ব্যাকুল-কণ্ঠে প্রশ্ন হইল—ইন্দ্রাণী তুমি কি আমায় ভালবাস না?

অতি সংক্ষিপ্ত একটি উত্তর—না।

—কিন্তু আমি যে তোমাকে ভালবাসি ইন্দ্রাণী—

—অনাবশ্যক।

ভাবান্দোলিত-কণ্ঠে পরন্তপ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—তুমি পাষাণী, পাষাণী!

ইন্দ্রাণী দাঁড়াইয়া উঠিয়া সংযত-কণ্ঠে বলিল—এতদিনে তুমি আমাকে বুঝেছ ! আমি পাষাণী—সত্যিই পাষাণী !

তারপরে শূন্য-গহ্বরের মধ্য হইতে উত্থিত ধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল—আমি পাষাণী আমার হৃদয় নাই, হৃদয়াবেগ নাই ; ভালবাসা নাই, ভালবাসার আবশ্যক নাই ; আমাকে কেউ ভালবাসতে পারে না, আমিও কাউকে ভালবাসি না ; আমার সংসার নাই, সাংসারিকতা নাই। যে-বিধাতা মানুষ গড়েন, আমি তাঁর সৃষ্টি নই ; যিনি গড়েছেন পাহাড়-পর্ব্বত, নদী-সমুদ্র, অরণ্য-কান্তার, আমি তাঁরই রচনা ; মানুষের সংসারে আমি প্রক্ষিপ্ত ; আমি লোকাতীত লোকোত্তর ; আমার শত্রু নাই, মিত্র নাই, আত্ম নাই, পর নাই ; আমার দ্বেষ নাই, প্রেম নাই ; আমার হিংসা নাই, ঈর্ষ্যা নাই ; আমি পুরুষ নই, নারী নই ; আমি পাষাণী। আমি পাষাণী। পাষাণের মত নিঃসঙ্গ, নির্জ্জন, নির্জ্জীব, নিস্তব্ধ ; বাসনার অতীত, সুখ-দুঃখের উর্দ্ধে ; আমার প্রাণ নাই, কাজেই মৃত্যুও নাই ; আমি ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ কিছু নই ; আমার ন্যায় নাই, অন্যায় নাই ; সত্য নাই, মিথ্যা নাই ; আমি মানুষ নই, কাজেই মানুষের মাপকাঠি আমার কাজে পরাঙ্মুখ ; আমি অলৌকিক, আমি পাষাণী !

স্থির সংযত কণ্ঠে এই কথাগুলি বলিতে বলিতে ইন্দ্রাণী অন্ধকারের মধ্যে প্রস্থান করিল।

মূঢ় পরন্তপ একাকী দাঁড়াইয়া রহিল !

২৮

বার্ড সাহেব চৌধুরীদের সহজে ছাড়িলেন না ; যদিও পরন্তপ রায়কে বে-আইনীভাবে বন্দী করিয়া রাখিবার অভিযোগ প্রমাণিত হইল না, তবু তারা নিস্তার পাইল না। বে-আইনী দাঙ্গা এবং সাহেবকে দেউড়ির

সম্মুখে অপমানিত করিবার জন্য দর্পনারায়ণ, রঘুনাথ, বিশ্বনাথ ও আলিবর্দ্দিকে সদরে চালান দেওয়া হইল। বিচারে তাদের সাত বৎসর করিয়া জেল হইল। তারা রাজসাহী ফাটকে আবদ্ধ হইল।

আইনের ক্রোধ এইখানেই থামা উচিত, কিন্তু বোনাপার্ট বিজয়ী সাহেবের ক্রোধ থামিল না। সে উপরে লিখিয়া দর্পনারায়ণ ও উদয় নারায়ণের যাবতীয় জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিল, সে-কালে কোম্পানীর আইন ন্যায় অন্যায়ের সূক্ষ্ম ভেদ মানিয়া তারের উপর দিয়া বিচরণ করিত না ঘটোৎকচের মত দোষী-নির্দ্দোষ সকলের ঘাড়ের উপর চাপিয়া পড়িত। সাহেবের রোষে চৌধুরীদের মধ্যম তরফ সর্ব্বস্বান্ত হইল।

সাহেবের ক্রোধ হইতে সামান্যই রক্ষা পাইল; বাড়ীখানা ও কায়ক্লেশে গ্রাসাচ্ছাদন চালাইবার মত কিছু ব্রহ্মোত্তর জমি মাত্র বাঁচিল।

উদয়নারায়ণ

১

বহুদিন আমরা উদয়নারায়ণের সাক্ষাৎ পাই নাই ; এতবড় একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল তার মধ্যে উদয়নারায়ণকে দেখা গেল না। এই ঘটনা ত্রিশ বছর আগে ঘটিলে তাকে সর্ব্বাগ্রে দেখা যাইত এবং খুব সম্ভবতঃ দর্পনারায়ণের পরিণাম তার ঘটিত না।

কিন্তু আসন্ন-নবতিবর্ষ বৃদ্ধ আজ যে শুধু জরাজীর্ণ তা নয়—প্রকৃতি তার প্রতি অভাবিত করুণা করিয়াছেন। যে-ইন্দ্রিয়গ্রামের মাধ্যমে সংসারের সুখ-দুঃখ মানুষ ভোগ কবিয়া থাকে, তার সেই ইন্দ্রিয়গ্রাম আজ বিকল, নবতিবর্ষ বয়সে সুখবোধের সম্ভাবনা আর কোথায়—মানুষের অদৃষ্টে তখন অবিমিশ্র দুঃখ ; কিন্তু সে যদি অন্ধ হয়, বধির হয়, সেই পরিমাণে তার সৌভাগ্য ; দৃষ্টি ও শ্রুতির কটু অভিজ্ঞতা হইতে তার রক্ষা। উদয়নারায়ণ আজ অন্ধ, বধির, চলৎশক্তিহীন।

অনেকদিন তার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু পৌত্রের বিবাহের জন্য বিজয়ী জরার নিকটে সে পরাজয় স্বীকার করে নাই, বহু-বাঞ্ছিত বিবাহে বাধা পড়িল, ক্ষীয়মান শক্তিকে শেষবারের জন্য সঞ্চয় করিয়া সে পৌত্র ও পৌত্রবধূর সন্ধানে বাহির হইল ; অনেক অন্বেষণ করিয়া তাদের বাড়িতে ফিরাইয়া লইয়া আসিল এবং দর্পনারায়ণকে জমিদারীর ভার অর্পণ করিয়া বৃদ্ধ সংসারের নিকট বিদায় লইয়া তেতালার ঘরে আশ্রয় লইল। সেখানেই তার আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম ; নীচে নামিত না ; কদাচিৎ বাহিরের লোকের সঙ্গে দেখা করিত ; এখন আর চৌধুরীবাড়ী কম্পিত করিয়া তার অট্টহাস্য ও তীব্র ভৎর্সনা ধ্বনিত হয় না ; জীবনের হাসি ও অশ্রু উভয়ের কাছ হইতে সে ছুটি পাইয়াছে।

কাজেই উদয়নারায়ণ রক্তদহের সঙ্গে দাঙ্গার কথা জানিতে পারিল না; জানাইবার আবশ্যকও কেহ বোধ করিল না; দর্পনারায়ণের কয়েদ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবার কথাও সে জানিতে পারিল না; জানাইতে কেহ সাহসও করিল না; অন্ধত্ব ও বধিরত্বের অজ্ঞতার আবরণে পূর্ব্ববৎ সে সুখে জীবনযাপন করিতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বে দেওয়ান রামজয় লাহিড়ী বনমালার সঙ্গে কথা বলিত না, কিন্তু এখন বিপদের চাপে তাদের মধ্যে সঙ্কোচের ভেদ ঘুচিয়া গেল, সব রকম সাংসারিক ব্যবস্থায় রামজয় বনমালাকে সঙ্গী করিয়া লইল।

সঞ্চিত অর্থ যা ছিল, বেশির ভাগই রক্তদহের সঙ্গে দাঙ্গায় ও মামলায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। অবশিষ্ট দিয়া লোকের দেনা-পাওনা মিটানো হইল; অধিকাংশ দাসদাসী, আমলা, কর্ম্মচারী ও বরকন্দাজদের মাহিনা শোধ করিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হইল।

বাড়ীর মধ্যে দুজন চাকর ও দাসী, যাদের তিন কূলে কেহ ছিল না, এবং যাদের জীবনের তিন ভাগ এই বাড়ীতে কাটিয়াছে, কেবল তারা থাকিল; আর থাকিল দেউড়িতে বৃদ্ধ কর্ত্তার সিং; বলা বাহুল্য রামজয় লাহিড়ী থাকিল; সে কখনও নিজেকে চৌধুরী-বাড়ীর ভৃত্য মনে করে নাই, কাজেই তার চাকুরী ছাড়িয়া দিবার কোন কথাই উঠিল না। কয়েকটি প্রাণী লইয়া বাড়ীর কাজকর্ম্ম নীরবে চলিতে লাগিল, কর্ত্তা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কেবল সন্ধ্যাবেলায় দেউড়িতে ডঙ্কা বাজাইবার সময় সকলে শঙ্কিত হইয়া থাকিত; স্মরণাতীত কাল হইতে দেউড়িতে সায়ংপ্রহরে ডঙ্কা বাজে, ইহার অন্যথা কখনও হয় নাই; সবাই জানিত কর্ত্তা এই সঙ্কেতের জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকেন, পাছে তিনি ডঙ্কার শব্দ না শুনিতে পান; ভীত আত্মজন বধিরের কর্ণকেও বিশ্বাস করিতে পারিত না, কর্ত্তার সিং সন্ধ্যাবেলা ডঙ্কায় কাঠি দিত; যে দিন সে অলঙ্ঘ্য কারণে অনুপস্থিত থাকিত, রামজয় লাহিড়ী চুপি চুপি গিয়া ডঙ্কা পিটিয়া আসিত, সে না পারিলে, বুড়ী দাসী গিয়া ডঙ্কায় ঘা দিত।

রামজয় লাহিড়ী মাঝে মাঝে কর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইত, বৃদ্ধ কানে সাধারণতঃ শুনিতে পাইত না বটে, কিন্তু কেহ পরিচিত কণ্ঠে উগ্রস্বরে কথা বলিলে কিছু বুঝিতে পারিতেন ; সেই জন্য তার সঙ্গে খুব জোরে কথা বলিতে হইত, সকলের কণ্ঠ তাঁর শ্রুতিগোচর হইত না। বৃদ্ধ বলিত, রামজয় কান দুটো একেবারে গিয়েছে, এত বড় বাড়ীতে এত লোকজন একটু গোলমালও কানে পৌঁছায় না। শঙ্কিত লাহিড়ী মনে মনে ইষ্টনাম স্মরণ করিত।

কর্ত্তা মহালের খবর লইতেন, আদায়-পত্রের সংবাদ জানিতে চাহিতেন, লাহিড়ী দশ বৎসর আগে যেমন বলিত, তেমনই বলিয়া যাইত। তিনি লাটের খাজনার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিতেন, দেওয়ানজী তাঁকে নিরুদ্বেগ করিত। আর দর্পনারায়ণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, কখনও বলিত, সে মহালে গিয়াছে ; কখনও বলিত, জরুরী কাজে তাকে সদরে যাইতে হইয়াছে, কখনও বলিত, সে নীচেই আছে। কর্ত্তা হাসিয়া বলিতেন, আজকাল ওর খুব খাটুনি পড়েছে, কি বল ?

তারপরে নিজের মনেই বলিতেন, বুঝুক একবার জমিদারী দেখা কি যে-সে কাজ ! বুঝুক এখন বুড়ো ঠাকুরদাদাকে কি পরিশ্রমই না করতে হয়েছে !

মাঝে মাঝে পুরাতন কর্ম্মচারি, চাকর, প্রজাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন ; দেওয়ানজী বলিত, তারা সকলেই ভাল আছে ; কখনও বলিত, অমুক প্রধান কাল দেখা করতে এসেছিল।

২

কিন্তু একটা বিপদের জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না, না বনমালা, না দেওয়ানজী। আশ্বিন মাসের কাছাকাছি একদিন উদয়নারায়ণ দেওয়ানজীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, রামজয় এবার পূজোর কি করছ ?

রামজয় ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না, চমকিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, আজ্ঞে যথারীতি হবে।

কর্ত্তা বুঝিয়া বলিলেন, যথারীতি নয়, এবার একটু ধুমধাম বেশী করতে হবে।

তারপর যেন নিজের মনেই বলিয়া চলিলেন, আর বেশী দিন বাঁচব না, এবার পূজো যদি পাড়ি দিতে পারি, তবেই যথেষ্ট, বেশী বাঁচলেই নানা দুঃখ দেখে যেতে হয়, এবার একটু আয়োজন ভাল ক'রে কর।

তারপর রামজয়কে বলিলেন, বস আমার যা ইচ্ছে বলে যাই; একখানা কাগজে টুকে নাও।

এই বলিয়া দুর্গাপূজার রাজসূয় ধরণের এক তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিলেন; চৌধুরীদের পূজায় খুব ধুম হয়, কিন্তু এবার আয়োজন তাকেও ছাড়াইয়া গেল; রামজয় মাথায় হাত দিয়া নামিয়া আসিল।

রামজয় ও বনমালা পরামর্শ আরম্ভ করিল; বহু দিন বহু বার তর্ক ও পরামর্শের পর স্থির হইল, কর্ত্তার তালিকা মত সামান্য ভাবেও পূজা করা অসম্ভব, অতএব বৃদ্ধকে, অন্ধ, বধির, চলৎশক্তিহীন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে বঞ্চনা করিতে হইবে।

রামজয় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সম্পত্তি নেই পূজো করা সম্ভব নয়, এ কথা বলে কর্ত্তার মনে আঘাত দিতে পারব না; তাতে ব্রহ্মহত্যা ঘটবে; তার চেয়ে তাঁকে বঞ্চনা করব, এর যা পাপ তার দায়ী আমি।

বনমালা শুধু বলিল, অর্দ্ধেক দায়িত্ব আমার।

৩

সপ্তমীর দিন প্রভাতে তিনজন লোকের সাহায্যে উদয়নারায়ণ পূজা-মণ্ডপের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন, তারপরে প্রতিমা-বিহীন বেদী-মূলে প্রণাম করিয়া বলিলেন, মা জীবনে অনেক অপরাধ করেছিলাম, নইলে বেঁচে থেকেও তোমাকে দেখতে পাব না কেন? চোখে দেখতে পাই, আর না পাই

তুমি আছই ; এ পোড়া মনে ভক্তি আছে কি না জানি না, সে কথা তুমিই ভাল জান !

তারপরে নিজের মনেই যেন বলিলেন, তবে এই সৌভাগ্য যে তুমি নিজের বাড়ীতে এসেছ, অবস্থা যেমনই থাকুক, বৎসরান্তে একবার নিজের বাড়ীতে আসতে ভুলনা।

মণ্ডপের মধ্যে গৃহ-দেবতার পূজাস্থান হইতে ধূপ ও শেফালি ফুলের গন্ধ আসিতেছিল, বৃদ্ধ তা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, রামজয় ঢাকের বাজনাই বল আর ঘণ্টার শব্দই বল, ধূপের গন্ধ আর শিউলি ফুলের সুবাসের কাছে কিছুই নয়। এ দুটো থেকেই বোঝা যায় মা ঘরে এসেছেন।

তারপরে একটু থামিয়া, হাসিয়া বলিলেন, মার দয়া আছে ; আমার চোখ কাণ নিয়েছেন বটে, দেখতেও পাইনে, শুনতেও পাইনে, কিন্তু তবু বুঝতে পারি শরৎ কাল এসেছে, আর তার সঙ্গে এসেছে উমা! বুঝলে রামজয়, আমরা যখন খুব ছোট ছিলাম, পূজার আগে ভোর বেলা উঠে শিউলি কুড়োতে যেতাম, ফুলবাগানের উত্তর কোণে একটা শিউলি গাছ ছিল, তোমরা সেটা দেখনি, অনেক দিন হল মরে গেছে ; সেই সময় ভোর বেলা এক বৈরাগী এসে গান ধরত—

কাল রাতে স্বপন দেখেছি গিরিরাজ।

বৃদ্ধ গুণগুণ স্বরে গানের ছত্রটি আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, বেশ পরিষ্কার মনে আছে, ওখানে ও কে ?

উচ্চকণ্ঠে বলিল, আজ্ঞে প্রাতঃ প্রণাম হই কর্ত্তা আমি বাণীবিজয়!

—ব'স, ব'স, এবার বুঝি তুমিই পূজা করছ ?

—আজ্ঞে হাঁ।

রামজয় এই বঞ্চনার মধ্যে ভট্টাচার্য্যকে টানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ভট্টাচার্য্য সমস্ত ব্যাপারটাকে অনুমোদন করিলেও নিজে ইহাতে যোগ দেন নাই, তিনি বাণীবিজয়কে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

বাণী বিনয়ে দেওয়ানজীকে বলিল, দেওয়ানজী, জীবনে অনৃত বাক্য উচ্চারণ করি নাই, কিন্তু এবার করব, যত আদেশ করেন, এ মিথ্যা সত্যের চেয়েও মহৎ।

কর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বাণী, এবার পূজার আয়োজন কি রকম দেখছ?

বাণী ঈষৎ-হাস্য করিয়া তারপরে বলিল, চৌধুরী-বাড়ীর পূজার আয়োজন আবার দেখব কি? তার মধ্যে এবারে আবার সবই বেশী দেখছি। সেই জন্যেইতো আমার শাস্ত্র-পিতা পূজা করতে সম্মত হলেন না, বললেন বুড়ো বয়সে এত পেরে উঠব না, বাণী তুমিই যাও।

বৃদ্ধ খুসী হইয়া বলিলেন, তা তুমি এসেছ বেশ করেছ! তুমি ও বে লায়েক হ'য়ে উঠেছ!

কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, বাণী কানে কিছু শুনতে পাই না; চার চারখা ঢাক আর কাঁশির শব্দ একটু শুনতে পাচ্ছিনা!

বাণী হাসিয়া বলিল, ওদের কিন্তু দোষ নেই কর্তা, সকাল থেকে বাজাে বাজাতে ওদের হাত ব্যথা হয়ে গেল।

তারপরে শূন্য আঙিনার দিকে তাকাইয়া বলিল, ওরে, রামা মদন, বাজ বাজা, জোরে বাজা, কর্ত্তা বলছেন তোরা বসে আছিস!

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, না, না, ওরা একটু জিরোক, বুঝলে বাণী, আমা মনে হচ্ছে, বাড়ী একেবারে খাঁ খাঁ করছে, লোকজন কেউ নেই।

বাণী হাসিয়া বলিল, কি যে বলছেন কর্ত্তা, উঠানে তিল-ধারণের স্থান নাই, অন্য বারের চেয়ে এবার ভিড় বেশি দেখছি; সব খবর পেয়েছে কিনা, যে চৌধুরী বাড়ীতে এবার ধুম কিছু বেশী।

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, হাঃ হাঃ ধুম তো বেশী হবেই।

চৌধুরী বাড়ীতে পূজার মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত হইতে বেলা তিন প্রহর